বাংলাবুক.অর্গ

THE INTERNATIONAL BESTSELLER

এক লূপ দিয়েই জাপান
কল্পকাহিনী বিশ্ব জয় করে ফেলেছে।
ধরেছেন কি মজেছেন-
শিনান জিতুচি
সাহিত্য-সমালোচক

লূপ

কোজি সুজুকি

রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম

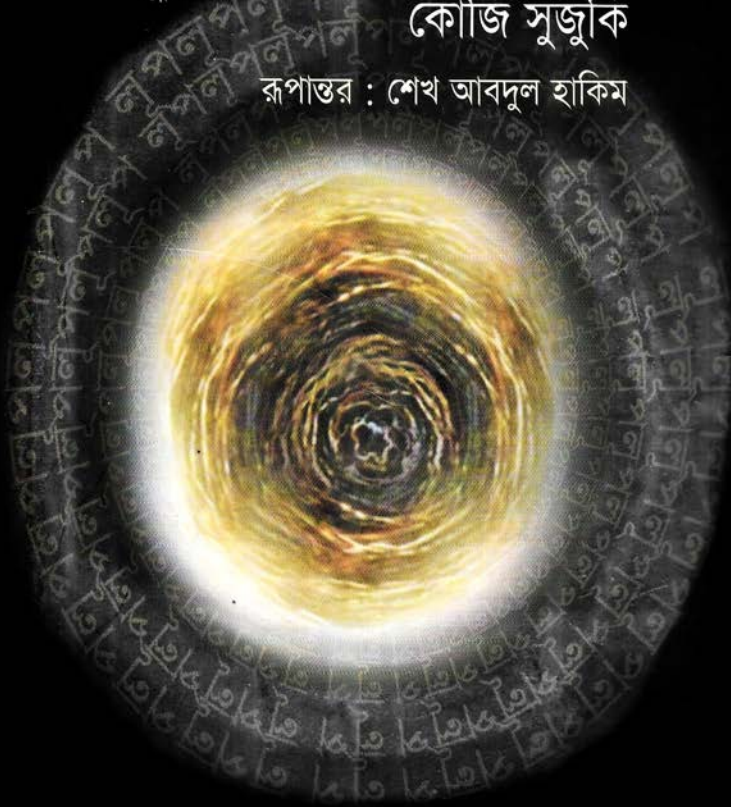

লূপ এমন একটি বই যা রিং এবং স্পাইরালের ভক্ত পাঠকেরা দারুণ উপভোগ করেছে।
লেখকের ট্রিলজির শেষ পর্যায় এতটাই আবেগপ্রবন যা পাঠকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যেতে পেরেছে।

'লূপ [সায়েন্স ফিকশন] উপন্যাসটি কোজি সুজুকির একটা মাস্টারপিস, আপনার হাড়-মাংস-মজ্জা একেবারে কাঁপিয়ে দেবে, আপনি পছন্দ করুন বা না করুন।' -*বুক ম্যাগাজিন* [জাপান]

'[সুজুকি] কখনো হতাশ করেন না...আগের বা পরেরটার চেয়ে লূপ অনেক বেশি সন্তুষ্ট করবে, বিশেষ করে আপনি যখন সত্যিকার জবাব পেতে চাইবেন।' -*বুক স্লাট. কম*

'উঁচুমানের কল্পকাহিনিতে বাস্তবতার নতুন সংজ্ঞা...[সুজুকি] আপনার শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করতে আগ্রহী, যতটা না শারীরিক তারচেয়ে বেশি দার্শনিক অর্থে।' -*দি অ্যাগানি কলাম*

যতই ভাববেন এই গল্প কোনদিকে মোড় নেবে আপনি জানেন, ততই বোকা হতে হবে আপনাকে। এইডস্ আর ক্যানসার, লূপে ভয়াবহ নতুন ছদ্মবেশ নিয়ে দুটোকেই ভেংচি কাটছে খুনি। কাউরু ফুতামি নামে এক কিশোর, বয়সের চেয়ে বিশেষ কারণে বেশি বুদ্ধিমান, আশায় বুক বেঁধেছে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমি আর লূপ প্রজেক্টে উত্তর পাওয়া যাবে–লূপ, বিখ্যাত সব বিজ্ঞানীদের তৈরি একটা ভার্চুয়াল ম্যাট্রিক্স। শুধু প্রেমিকা রাইকো কিংবা বাবা হাইডিউকির নিয়তিই নয়, দুটো পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ আর বংশগতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে তার সাফল্যের ওপর। কাহিনী সম্পর্কে কাহিনী খুব কমই এরকম হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লূপ

মূল : কোজি সুজুকি

জাপানি ভাষা থেকে অনুবাদ
গ্লেন ওয়ালি

রূপান্তর
শেখ আবদুল হাকিম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আকাশ

প্রকাশকাল
প্রথম বাংলা প্রকাশ একুশে বইমেলা, ২০১২
প্রথম ইংরেজি প্রকাশ ভারটিক্যাল, আইএনসি, নিউইয়র্ক ২০০৬
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক
ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক
আলমগীর সিকদার লোটন
সুর জাহান পুনম
গ্রন্থস্বত্ব
শেখ আবদুল হাকিম
প্রচ্ছদ
শিশির আলম

আকাশ

সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর
একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৫৬০০, ০১৭১১৫২৬৯৭০
অক্ষর বিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ৩৭৫ টাকা

the good neighbor.

প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।

The Ahsania Misson Cancer Hospital will get a donation of Tk. 5 (Five) from the sale proceeds of each copy of this book.

LOOP
by Koji Suzuki
First English Translated by Glynne Walley
First Bengali Translated by Sheikh Abdul Hakim
Published by Alamgir Sikder Loton and Sur Jahan Punom
Akash (A House of Literary Publication)
First English Published Vertical. Inc., New York 2006
First Bangali Edition Ekushe BookFair 2012
Phone : (880-2) 7165600, 01711526970
e-mail : akash_publications@yahoo.com
USA Distributor Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor Sangeeta Ltd. 22 Bricklane, London
Price Taka 375 US$ 15 only
ISBN 984-70390-0076-2

উৎসর্গ

প্রিয় কবি সাজ্জাদ শরীফকে

কোজি সুজুকি লেখকের পরবর্তী বই

রিং, স্পাইরাল এবং বার্থডে বের হচ্ছে

আমাদের সাথে থাকুন

প্রথম পরিচ্ছেদ

শেষরাতে

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

কাঁচের টানা দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল সাগরের গন্ধ। হাওয়া আছে কি নেই, খাঁড়ির কালো পানি থেকে সোজা উঠে আসা রাতের সজল বায়ু কাউরুর সদ্যস্নাত সতেজ শরীরটাকে মুড়ে ফেলল। সাগরের সঙ্গে সরাসরি এই সম্পর্কটা ভালো লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে দিলো মনে।

ডিনারের পর ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে নক্ষত্রের মিটমিট, মেঘের ওড়াওড়ি আর চাঁদের ছোট-বড় হওয়া দেখতেই হবে ওকে। সূক্ষ্ম হলেও, চাঁদের আকৃতি বিরতিহীন বদলাচ্ছে, ওটার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় ওর মনে আশ্চর্য রহস্যময় একটা অনুভূতি জাগে। সেটা প্রায়ই ওকে বিচিত্র সব আইডিয়ার যোগান দেয়।

আকাশ দেখা ওর দৈনন্দিন রুটিনের একটা অংশ। টান দিয়ে দরজা খুলবে, নীচের দিকে অন্ধকারে পা ঘোরাবে যতক্ষণ না স্যান্ডেল জোড়া খুঁজে পায়। আকাশে উঠে পড়া অ্যাপার্টমেন্ট টাওয়ারের ঊনত্রিশ তলার এই ঝুল-বারান্দা ভারি পছন্দ ওর, এটাকে যেন ঠেলে গাঢ় অন্ধকারে তুলে দেয়া হয়েছে। এখানেই সবচেয়ে স্বস্তি আর প্রশান্তি বোধ করে ও, আপন একটা ঠাঁই।

সেপ্টেম্বর বেশিরভাগই পার হয়ে গেছে, তবে গ্রীষ্মের গরম এখনও কাটেনি। গরমের দিনগুলো কবে থেকে বড় হতে শুরু করল তা ওর জানা নেই। ও শুধু জানে রোজ ঝুল-বারান্দাতে বের হলেও এখন আর আবহাওয়াটা ওকে ঠাণ্ডা করতে পারছে না। এখানে বের হওয়া মানে গরমের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া।

তবে তারাগুলো একেবারে ওর কাছাকাছি নেমে আসে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, আর তখন গরমের কথা ওর মনে থাকে না।

ওডাইবার আবাসিক অংশ, অসংখ্য কন্ডোমিনিয়াম টাওয়ারের সমষ্টি, টোকিও বে-র দিকে মুখ করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বাসিন্দার সংখ্যা খুব বেশি নয়। সারির পর সারি জানালা, অথচ অল্প কিছু আলোকিত, ফলে তারার মেলা দেখার জন্য অবাধ দৃষ্টিপথ পেতে ওর কোনো অসুবিধে হয় না।

মাঝে মধ্যে একটু তাজা হাওয়া এসে স্থির বাতাস থেকে সাগরকে খানিকটা ভাগিয়ে দিচ্ছে, এখনও ঘাড়ে লেপ্টে থাকা ওর সদ্য ধোয়া চুল তাতে শুকিয়ে যাচ্ছে।

'কাউরু, দরজা বন্ধ করো! তোমার ঠাণ্ডা লাগবে!' ওর মার গলা, ভেসে আসছে

BanglaBook.org

কিচেন কাউন্টারের পেছন থেকে। নিশ্চয় বাতাসের নড়াচড়া তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে দরজাটা খোলা। নিজের জায়গা থেকে তিনি ঝুল-বারান্দা দেখতে পাচ্ছেন না, কাজেই কাউরুর সন্দেহ আছে ওর বাইরে থাকার ব্যাপারটা মা জানেন কিনা

এত গরমে কীভাবে কাউকে ঠাণ্ডা লাগবে, ভাবল কাউরু, ওকে আগলে রাখার মার এই মাত্রা ছাড়ানো ব্যাকুলতায় বিরক্ত বোধ করল। আজই প্রথম বা নতুন কিছু নয় এটা। ওর কোনো সন্দেহ নেই ছেলে ঝুল-বারান্দায় আছে জানলে সত্যি সত্যি ওকে টেনে-হিঁচড়ে ভেতরে নিয়ে যেতেন তিনি। দরজাটা বন্ধ করে দিল কাউরু, আর যাতে কিছু শুনতে না পায়।

এখন, জমিন থেকে একশ গজ উঁচুতে, আকাশে ঝুলে থাকা এক কণা বিস্তৃতির একচ্ছত্র মালিক সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁচ লাগানো দরজা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে তাকাল কাউরু। এখান থেকে সরাসরি ওর মাকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কিচেন থেকে আসা দুধালো ফ্লুরোসেন্ট আলোর যে প্রসারিত বাহু লিভিং রুমের সোফায় পড়েছে তাতে মার উপস্থিতি পড়তে পারছে সে ডিনার শেষে সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে নোংরা বাসন-পেয়ালা পরিষ্কার করার সময় তাঁর নড়াচড়া ম্লান করে তুলছে ছড়ানো আলোকে।

ঘুরে আবার অন্ধকারের মুখোমুখি হলো কাউরু, রোজ যা ভাবে আজও তাই ভাবছে। প্রিয় স্বপ্নটা হলো, ওর চারদিকে এবং ওর ভেতরে দুনিয়ার যে কাজকর্ম চলছে কোনোভাবে তার একটা সহজ ব্যাখ্যা বের করা।

ব্যাপারটা এমন নয় যে তার আশা বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে নতুন কিছু উদ্ভাবন বা প্রবর্তনের মাধ্যমে এক কি দুটো রহস্যের মীমাংসা করে ফেলবে। ওর আকাঙ্ক্ষা, এমন একটা অভিন্ন থিয়রি আবিষ্কার, যার দ্বারা প্রাকৃতিক দুনিয়ার সমস্ত বিস্ময়, বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

ওর বাবারও, তথ্য-প্রযুক্তির একজন একনিষ্ঠ গবেষক, এই একই স্বপ্ন! দুজনের যখন এক হওয়ার সুযোগ হয়, বাপ-বেটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করে না।

না, এটাকে আলোচনা বলা ঠিক নয়। কাউরু আসলে, ওর বয়স মাত্র দশ, বাবার উদ্দেশে একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, তিনি ধৈর্য ধরে ছেলের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন।

কাউরুর বাবা, হাইডিউকি, তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন একটা কৃত্রিম প্রাণ প্রকল্প টিমের সদস্য হিসেবে। তারপর তাঁকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গবেষণা করার জন্যে নির্বাচিত করা হয়, এবং পরে তিনি প্রফেসর হন।

কাউরুর কোনো প্রশ্ন কখনও এড়িয়ে যান না হাইডিউকি। আসলে ছেলের সাহসী চিন্তা-ভাবনা, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান যেগুলোকে লাগাম পরাতে পারে না, মাঝে-মধ্যে বরং তাঁকে এমন কিছু ইঙ্গিত দেয় যেগুলো তিনি তাঁর গবেষণায় কাজে

BanglaBook.org

লাগাতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব তাই সব সময় ভাব-গম্ভীর পরিবেশেই শুরু হয়।

যখনই রোববার বিকেলে ছুটির ব্যবস্থা করতে পারেন হাইডিউকি, সময়টা কাউরুর সঙ্গে উত্তপ্ত আলোচনায় কাটান তিনি–চেহারায় পরম সন্তুষ্টির ছাপ নিয়ে ওদের কার কি ভূমিকা আর আচরণ লক্ষ্য করেন ম্যাচিকো, হাইডিউকির স্ত্রী, অর্থাৎ কাউরুর মা।

তাঁর স্বামীর একটা প্রবণতা হলো যে বিষয়ে কথা বলছেন তার ভেতর এমনভাবে ডুবে যান, চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে এতটুকু খেয়াল থাকে না; অপরদিকে, তাঁর ছেলে কাউরুর কখনও খেয়াল রাখতে ভুল হয় না যে মা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে না পারায় নিজেকে হয়তো অপাংক্তেয় বা পরিত্যক্ত ভাবছেন।

ভাষা বদলে ফেলে কাউরু, সহজে কামড় বসানো যায় এমন আকার দেয় বাক্যগুলোকে, মা যাতে অনায়াসে বুঝতে পারেন এবং ইচ্ছে হলে দু'একটা মন্তব্যও করতে পারেন। এ এমন এক ধরনের বিবেচনা, হাইডিউকি কখনোই অনুকরণ করতে পারবেন না।

ছেলের দিকে যখনই তাকান ম্যাচিকো, মুখে সেই একই সন্তুষ্টির হাসিটি দেখা যায়, ওর স্বতস্ফূর্ত সহৃদয়তার জন্যে তাতে মিশে থাকে কৃতজ্ঞতার ছাপ, থাকে গর্বও–মাত্র দশ বছর বয়সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে এমন পর্যায়ের আলোচনা করছে যা কিনা তাঁরও বোধগম্যের বাইরে।

বহু নীচে, রেইনবো ব্রিজে, হেডলাইটের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মনে আশা নিয়ে কাউরু ভাবল, আলোর ওই প্রবাহের ভেতর ওর বাবার মোটরসাইকেলটাও আছে কিনা। বরাবরের মতো বাবা কখন বাড়ি ফিরবে ভেবে উতলা হয়ে পড়েছে সে।

আজ দশ বছর হলো কৃত্রিম প্রাণ প্রকল্প টিমের সাধারণ একজন সদস্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হয়েছেন হাইডিউকি; দশ বছর আগে টোকিও শহরতলি থেকে ওডাইবার এই কন্ডোতে উঠে এসেছেন তাঁরা। বসবাসের জন্যে এখানকার পরিবেশ–পানির কিনারায় উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং–তাঁর পরিবারের রুচির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে।

আকাশের এত ওপর থেকে নীচের দিকে তাকাতে কাউরু কখনও ক্লান্ত বোধ করে না, এবং যখন রাত নামে, সমস্ত নক্ষত্রকে কাছাকাছি নামিয়ে আনে সে, দুনিয়াকে ঘিরে নিজের যত কল্পনা তাতে সমর্থন ও শক্তি যোগাতে সাহায্য নেয় ওগুলোর, যেটার মতিগতি এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি সে।

মাটি থেকে অনেক ওপরে একটা বাসস্থান: পাখির চোখ দিয়ে দেখার একটা সুযোগ। কাউরু চিন্তায় ডুবে যায়। বিবর্তনের মাধ্যমে সরীসৃপ থেকে যদি পাখি হয়ে থাকে, এর মানে হলো বসবাসের স্থান ক্রমশ আকাশমুখী হয়েছিল। মানুষের

BanglaBook.org

ক্রমবিবর্তনে তাহলে কী প্রভাব পড়েছিল তার? কাউরু উপলব্ধি করল মাটিতে তার পা পড়েছে এক মাস আগে।

ঝুল-বারান্দার রেলিংয়ে হাত রাখল কাউরু, প্রায় ওর সমান উঁচু, হাত দুটো দুদিকে বাড়িয়ে দিল, এবং ব্যাপারটা অনুভব করল। না, এবারই প্রথম নয়। অনেক আগে থেকে, যতদিন পর্যন্ত মনে করতে পারা যায়, মাঝে-মধ্যেই এটা অনুভব করে সে। তবে কখনোই, অদ্ভুত বটে, পরিবারের কারও সঙ্গে থাকলে এই অনুভূতিটা তার হয় না।

এতদিনে এটার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কাউরু। কাজেই ঘাড় ফিরিয়ে পেছনদিকে তাকাল না, যদিও অনুভব করছে পেছন থেকে ওর দিকে তাকানো হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে সে এখন যদি পেছন দিকে তাকায় তাহলে কি দেখতে পাবে জানে কাউরু–সেই একই লিভিং রুম, ওটার পেছনে ডাইনিং রুম, তারপর কিচেন, সব সেই আগের মতো, অপরিবর্তিত। আর কিচেনে, ওর মা ম্যাচিকো, রোজকার মতো বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছেন।

ওর ওপর চোখ রাখা হচ্ছে, এই অনুভূতি ঝেড়ে ফেলার জন্যে মাথাটা ঝাঁকাল কাউরু। বোধটা এক কদম পিছু হটল বলে মনে হলো, অন্ধকারে মিশে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

যখন নিশ্চিত হলো, অনুভূতিটা এখন আর নেই, ঘুরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের গায়ে পিঠ ঠেকাল কাউরু।

সবই আগে যেমন ছিল তেমনি আছে। কিচেনের দোরগোড়ায় পড়ে থাকা আলোর ফালিতে ওর মার ছায়া নড়াচড়া করছে। কোথায় গেল ওগুলো, অসংখ্য যে-সব চোখ পেছন থেকে ওর ওপর নজর রাখছিল? কাউরু তাদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেছে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ভুল নেই। গুণে শেষ করা যায় না এত দৃষ্টি, ওর ওপর নিবদ্ধ।

সে যখন অন্ধকারকে পেছনে রেখে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন ওই কালো দৃষ্টি অনুভব করা গেলে ভালো হত। কিন্তু চোখগুলো এখন চলে গেছে, মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

আচ্ছা, কী ওগুলো, কী হতে পারে, ওর ওপর নজর রাখছে? প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই বাবাকে জিজ্ঞেস করেনি কাউরু। ওর সন্দেহ, এমনকি বাবারও এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই।

এত গরম সত্ত্বেও এখন ওর ঠাণ্ডা লাগছে। ঝুল-বারান্দায় থাকতে ভালো লাগছে না ওর।

লিভিং রুমে ঢুকে কিচেনে উঁকি দিয়ে মাকে দেখল কাউরু। বাসন-পেয়ালা ধোয়া শেষ করেছেন তিনি, একটা ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে সিঙ্কের কিনারা পরিষ্কার করছেন। ওর দিকে পেছন ফিরে রয়েছেন তিনি, গুণ গুণ করে কিছু একটা

BanglaBook.org

গাইছেন। মার সুগঠিত কাঁধের দিকে তাকিয়ে মনে মনে চাইল সে, মা, তুমি আমার দিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও। কিন্তু তিনি আগের মতোই গুণ গুণ করছেন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছেন না।

মার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল কাউরু।

'ও মা, বাবা কখন বাড়ি ফিরবে?'

মাকে চমকে দেয়া কাউরুর উদ্দেশ্য ছিল না, তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে তার হেঁটে আসাটা প্রায় নিঃশব্দ ছিল, আর কথাটা বলেছে প্রয়োজনের চেয়ে একটু হলেও জোরে।

ম্যাচিকো লাফ দিয়ে উঠলেন, তাঁর হাত ঝাঁকি খেলো, এবং সিঙ্কের কিনারায় বসিয়ে রাখা একটা ডিশ ওই হাতের ধাক্কা খেয়ে নীচের মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

'এই, এভাবে আমাকে ভয় দেখিও না!'

দম আটকালেন তিনি, ঘুরলেন, হাত দুটো স্তনের ওপর।

'দুঃখিত,' বলল কাউরু। নিজের অজান্তে প্রায়ই সে এভাবে মাকে চমকে দেয়।

'কতক্ষণ হলো এখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, কাউরু?'

'এই কয়েক সেকেন্ড।'

'তুমি জানো মা ভয় পায়। আমাকে তোমার এভাবে চমকে দেয়া উচিত নয়,' ছেলেকে তিরস্কার করলেন তিনি।

'দুঃখিত। আমি তোমাকে চমকে দিতে চাইনি।'

'সত্যি? কিন্তু এই কাণ্ড তো তুমি সবসময় করছ।'

'তুমি লক্ষ করোনি? আমি তোমার পিঠের দিকে তাকিয়েছিলাম, মাত্র ক'সেকেন্ডের জন্যে।'

'আমাকে তুমি বলো, কেন আমি লক্ষ করব? তুমি জানো আমার মাথার পেছনে চোখ নেই।'

'তা জানি, কিন্তু, আমি...' চুপ করে গেল কাউরু। সে আসলে বলতে চাইছিল: *মানুষ তো ঘাড় ফিরিয়ে না তাকিয়েও অনুভব করতে পারে কেউ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।* তবে সে জানে, এটা শুনে আরও বেশি ভয় পাবে মা।

কাজেই আগের প্রশ্নে ফিরে গেল কাউরু। 'বাবা কখন ফিরছে?' যদিও জানে যে জিজ্ঞেস করার কোনো অর্থ হয় না, কারণ মার কখনই জানা থাকে না বাবা কখন বাড়ি ফিরছেন।

'তার বোধহয় আজও ফিরতে দেরি হবে,' অস্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল, তবে চোখ তুলে লিভিং রুমের দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন ম্যাচিকো।

'আজও আবার দেরি হবে?'

হতাশ শোনাল কাউরুর গলা। ম্যাচিকো বললেন, 'তুমি জানো ইদানিং তোমার বাবা কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। মনে নেই, নতুন একটা প্রজেক্ট মাত্র শুরু

BanglaBook.org

করেছে?' স্বামীর পক্ষ নিতে চেষ্টা করছেন তিনি। প্রতিরাতেই দেরি করে বাড়ি ফেরেন হাইডিউকি, তবে সেজন্যে ভুলেও কখনও বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন না ম্যাচিকো।

'দেখি কত রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।'

ডিশের ভাঙা টুকরো সরিয়ে হাতের কাজ শেষ করলেন ম্যাচিকো, ছেলের সামনে এসে শুকনো কাপড় দিয়ে হাত মুছছেন।

'জিজ্ঞেস করার মতো আবার কোনো প্রশ্ন পেয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'বাবার কাজ সম্পর্কে?'

'হুঁ।'

'তোমার হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?'

'হাহ্?' হাসিটা চেপে রাখতে পারল না কাউরু।

'হাসি থামাও! খুব ভালো করেই জানো, যতটা বোকা মনে করো ততটা বোকা আমি নই। আমি গ্র্যাড স্কুলে গেছি, তা জানো?'

'সে আমি জানি। কিন্তু...তুমি ইংরেজি সাহিত্য পড়েছ, ঠিক?'

ম্যাচিকো আসলেও ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, তবে তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষবস্তু ইংরেজি সাহিত্য ছিল না, ছিল আমেরিকান সংস্কৃতি। বিশেষ করে নেটিভ আমেরিকান ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন তিনি, এমনকি এখনও আগ্রহ হারাননি, অবসর সময়ে বই নিয়ে বসে যান।

'ওসব থাক, তোমার প্রশ্নটা কী বলো আমাকে।'

হাতে এখনও শুকনো একপ্রস্থ কাপড়, ছেলেকে খেদিয়ে লিভিং রুমে নিয়ে গেলেন ম্যাচিকো। কাউরুর একটু অদ্ভুত লাগছে। এত থাকতে আজ রাতেই হঠাৎ কী কারণে মা এত আগ্রহ দেখাবেন? মা আজ অন্যরকম আচরণ করছেন কেন?

'এক মিনিট অপেক্ষা করো তাহলে।'

নিজের কামরায় চলে গেল কাউরু, ফিরে এল দুটো কাগজ নিয়ে। সোফায় মার পাশে বসল।

কাউরুর হাতে ধরা কাগজের দিকে তাকালেন ম্যাচিকো, বললেন, 'কী ওগুলো? আবার একগাদা কঠিন সংখ্যা নয়তো?' তিনি জানেন, প্রশ্নটা গাণিতিক হলে পরাজয় মেনে নেয়াটাই তাঁর জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

'এবারের ব্যাপারটা অত কঠিন নয়

কাগজ দুটো মার হাতে ধরিয়ে দিল কাউরু। ম্যাচিকো দেখছেন ওগুলো। দুটো কাগজেই পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা।

'হ্যাঁ, এটা অন্যরকম। তুমি তাহলে এখন ভূগোল পড়ছ?'

ভূগোল তাঁরও খুব প্রিয় বিষয়, বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার। তাঁর বিশ্বাস,

BanglaBook.org

অন্তত এই সাবজেক্টে কাউরুর চেয়ে অনেক বেশি জানেন তিনি।

'উঁহুঁ। গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি। সহজ করে বললেঃ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যতিক্রম বা অসঙ্গতি।'

'কী?' দেখা যাচ্ছে এবারও তাঁকে আলোচনা থেকে দূরে সরে থাকতে হবে তাঁর চোখে ক্ষীণ হলেও হতাশার ছায়া পড়ল।

সামনের দিকে ঝুঁকে কাউরু বলতে শুরু করল এই ম্যাপ দুটোয় কীভাবে পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'ঠিক আছে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সমীকরণের মাধ্যমে পাওয়া ভ্যালু এবং পৃথিবীর সারফেস-এর মহাকর্ষীয় গতিবৃদ্ধির নিখুঁত হিসেব করার মাধ্যমে পাওয়া ভ্যালুর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। এখানে, এই ম্যাপ দুটোয়, পার্থক্যগুলো লেখা হয়েছে পজিটিভ আর নেগেটিভ সংখ্যা হিসেবে।'

পাতা দুটোয় ১ ও ২ নম্বর দেয়া। প্রথম মানচিত্রে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির প্রতিনিধিত্ব করছে সারি সারি এমন সব সমুন্নতি রেখা টানা হয়েছে, প্রতিটি রেখার সঙ্গে একটা করে আলাদা লেবেলে সংখ্যা লেখা আছে, যোগ কিংবা বিয়োগ চিহ্নসহ।

সাধারণ অ্যাটলাসে যেমনটি দেখা যায়, সমুন্নতি রেখাগুলো সেরকমই দেখতে, যেখানে যোগ চিহ্ন সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরের উচ্চতা নির্দেশ করে, বিয়োগ চিহ্ন সি লেবেলের নীচের গভীরতা নির্দেশ করে।

তবে কাউরুর মানচিত্রে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যতিক্রম বা অসঙ্গতি [গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি] কোথায় কতটুকু কম বা বেশি তা ওই রেখাগুলোর সাহায্যে বোঝানো হয়েছে।

এই মানচিত্রে পজিটিভ সংখ্যা যত বড়, গ্র্যাভিটেশনাল শক্তি তত বেশি; আর নেগেটিভ সংখ্যা যত বেশি, গ্র্যাভিটেশনাল শক্তি ওই নির্দিষ্ট লোকেশনে তত দুর্বল। এর ইউনিট মিলিগাল [mgal]। ম্যাপটায় ছায়াও আছেঃ সাদা অংশ পজিটিভ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির প্রতিনিধিত্ব করছে, গাঢ় অংশটুকু প্রতিনিধিত্ব করছে নেগেটিভ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির। ম্যাপটা এমনভাবে সাজানো যাতে একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায় ব্যাপারটা কি নিয়ে।

গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির বিতরণী ছকটা অনেকক্ষণ ধরে কঠিন দৃষ্টিতে দেখলেন ম্যাচিকো, তারপর মুখ তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি হার মানছি। গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি কী জিনিস?' অনেক আগেই ছেলের সামনে নকল পণ্ডিত সাজার চেষ্টা বাদ দিয়েছেন তিনি।

'মা, তুমি নিশ্চয়ই ভাবো না যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবখানে একরকম?'

'সত্যিকথা বলতে কি, জন্মের পর থেকে এ বিষয়টা নিয়ে একবারও আমি কিছু ভাবিনি।'

BanglaBook.org

'শোনো, তা কিন্তু নয়, মানে সবখানে সমান না।'

'মানে একেক জায়গায় একেক রকম?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে তুমি এই ম্যাপে বলতে চাইছ, পজিটিভ সংখ্যা যত বড়, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তত বেশি; আর একইভাবে নেগেটিভ সংখ্যা যত বেশি মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তত কম, ঠিক?'

'হুঁ, একদম ঠিক। শোনো, যে বস্তু দিয়ে পৃথিবীর ভেতরটা তৈরি সেটার ভর সব জায়গায় এক নয়। এভাবে চিন্তা করো: কোনো একটা জায়গার যদি নেগেটিভ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি থাকে, এর মানে হলো ওটার নীচে ভূ-স্তরের ভর কম। সোজা করে বললে, ল্যাটিচিউড যত উঁচু হবে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তেজও তত বেশি হবে।'

'আর এই দ্বিতীয় কাগজটা?'

ইঙ্গিতে ২ সংখ্যা লেখা কাগজটা দেখালেন ম্যাচিকো। এটাও পৃথিবীর একটা মানচিত্র, তবে জটিল সমুন্নতি রেখাবিহীন, তার বদলে এটার গায়ে কয়েক ডজন কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে।

'কী এসব?' জানতে চাইলেন ম্যাচিকো।

'এগুলো লঞ্জেভেটি জোনস।'

'লঞ্জেভেটি জোনস? মানে? তুমি বলতে চাইছ যে-সব জায়গায় মানুষ বেশিদিন বাঁচে?'

প্রথমে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি, এখন আবার লঞ্জেভেটি জোনস নিয়ে আরেকটা ম্যাপ–প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছেন ম্যাচিকো।

'ঠিক ধরেছ। অন্যান্য জায়গায় যে-সব মানুষ যতদিন বাঁচে, এটা পরিষ্কার যে এই জায়গাগুলোয় বসবাসরত মানুষ তাদের চেয়ে বেশিদিন বাঁচে। এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে পৃথিবীতে সেরকম স্পট মোট কতগুলো আছে,' বলল কাউরু, মানচিত্রের দিকে আঙুল তুলে কালো বিন্দুগুলো দেখাল।

বিন্দুগুলোর মধ্যে চারটে আবার জোড়া বৃত্ত এঁকে আলাদা করা।

কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী ককেসাস অঞ্চল।
জাপানের সামেইজিমা দ্বীপপুঞ্জ।
কারাকোরাম পাহাড়ের নীচে কাশ্মীরের খানিকটা অংশ।
ইকুয়াডরের দক্ষিণাঞ্চল।

BanglaBook.org

এসব এলাকার বিশেষ খ্যাতি আছে, এবং খ্যাতির কারণ, ওখানে যারা বসবাস করে তারা অন্য এলাকার মানুষের চেয়ে অনেক বেশিদিন বাঁচে।

কাউরু যেন ভাবছে, দ্বিতীয় মানচিত্র সম্পর্কে আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার দরকার নেই।

ম্যাচিকো অবশ্য প্রথমবারের মতো দেখছেন ওটা। জানতে চাইলেন, 'তো?' এবার আসল প্রশ্ন হলো, জানা কথা, পরস্পরের সঙ্গে দুটো মানচিত্রের সম্পর্ক কী? মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর আয়ুর মধ্যে?

'একটার ওপর আরেকটা রাখো।'

রাখলেন ম্যাচিকো। দুটোর আকার একই, ফলে সহজেই তা রাখা গেল।

'এবার ওগুলোকে আলোর সামনে ধরো,' বলল কাউরু, হাত তুলে লিভিং রুমের ঝাড়বাতিটা দেখাল।

কাগজ দুটো উঁচু করার সময় প্রান্তগুলো এক করছেন ম্যাচিকো। এখন দ্বিতীয় মানচিত্রের কালো বিন্দু প্রথম মানচিত্রের সমুন্নতি রেখাগুলোর মাঝখানে দেখা যাচ্ছে।

'দেখতে পাচ্ছ?'

ম্যাচিকো জানেন না কী দেখতে পাওয়া উচিত।

'বাজে বকো না। কী দেখতে পাব সেটা আগে জানাও।'

'বেশ, দেখো–লঞ্জেভেটি জোনস আর লো গ্র্যাভিটি এরিয়া খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে কিনা। যাচ্ছে?'

ম্যাচিকো দাঁড়ালেন, আলোর আরও কাছাকাছি তুলে ধরলেন জোড়া লাগানো কাগজ দুটো। কথাটা সত্যি: লঞ্জেভেটি জোনসের প্রতিনিধিত্বকারী কালো বিন্দুগুলো প্রথম মানচিত্রের শুধুমাত্র লো-গ্র্যাভিটি চিহ্নিত করা এলাকার ওপর প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

অতি মাত্রায় লো-গ্র্যাভিটি।

'তোমার কথাই ঠিক,' বললেন ম্যাচিকো, বিস্ময় গোপন করার ঝামেলায় যাচ্ছেন না। তবে তারপরও মাথাটা একদিকে কাত করে রেখেছেন, যেন এখনও তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ব্যাপারটা বুঝতে এখনও যেন অসুবিধে হচ্ছে তাঁর।

'মানে, এখানে বলার চেষ্টা হয়েছে, মহাকর্ষ আর মানুষের আয়ুর মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে

'আর এটাই তুমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করবে?'

'ইয়ে, হ্যাঁ। আচ্ছা, ভালো কথা, মা, তোমার কী মনে হয়? পৃথিবীর বুকে প্রাণের সূচনা কি এমনি এমনি হয়েছিল?'

ম্যাচিকো পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'লটারি জেতার মতো?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল কাউরু। 'কী বলছ! এত ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ একটা ব্যাপার। দুটোর মধ্যে তো কোনো তুলনাই হয় না। আমরা একটা মিরাকল নিয়ে

BanglaBook.org

আলাপ করছি।'

'কিন্তু কেউ না কেউ সব সময় লটারি জিতছে।'

'তুমি যে লটারির কথা বলছ, ধরো, তাতে একশ টিকিট থাকে, তা কিনতে হয় একশ জনকে, আর বিজয়ী হয় একজন। আমি একটা লুডুর ঘুঁটি চালার কথা বলছি, একশবার চাললে প্রতিবারই ছক্কা পড়বে। তা যদি ঘটে, সেটাকে তুমি কী বলবে?'

'বলব অবশ্যই কারিগরি ফলানো হয়েছে।'

'মানে?'

'মানে এর মধ্যে কারচুপি আছে।'

'কারচুপি?'

'অবশ্যই। কেউ ঘুঁটি গড়ালেই যদি ছক্কা পড়ে, তার মানে হবে ছক্কায় কিছু ভরে রাখা হয়েছে, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না?' কথা বলার সময় কাউরুর কপালে সস্নেহে আঙুলের খোঁচা মারলেন তিনি, যেন বলতে চাইছেন—হাঁদারাম!

'কিছু ভরা হয়েছে, না?'

কি যেন ভাবছে কাউরু, খোলা মুখ ঝুলে আছে।

'কী ব্যাপার? কী হলো তোমার?'

'ঠিকই তো। ভরাট ঘুঁটি,' বলল কাউরু। 'কারিগরি ফলানো হতে হবে। তা না হলে মেলানো যাবে না।'

'তাই না?'

'মানবজাতি স্রেফ লক্ষ করেনি যে এটা কারিগরি ফলানো। কিন্তু, মা—ঘুঁটিটা কারিগরি ফলানো না হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রতিবার একই সংখ্যা ওঠে, তাহলে?'

'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে আমরা সৃষ্টিকর্তা নিয়ে কথা বলছি, ঠিক? একমাত্র সে-ই এরকম কিছু করতে পারে।'

কাউরু জানে না ওর মা সত্যি সত্যি কথাটা বিশ্বাস করেন কিনা।

আলাপটা চালিয়ে যেতে চাইছে সে। 'ভালো কথা, গতকাল টিভিতে কি দেখাল মনে আছে তোমার?' নিজের প্রিয় সোপ অপেরার কথা বলছে কাউরু। সেটা ওর এতই পছন্দ যে মাঝে-মধ্যে মাকে দিয়ে এপিসোডগুলো টেপ করিয়ে রাখে।

'আমি দেখিনি, ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা তো তোমার মনে আছে, সাইউরি আর ডাইজো আবার কীভাবে মিলিত হলো কেইপে?'

কালকের এপিসোডের গল্পটা কীভাবে বোনা হয়েছে, মুগ্ধ হয়ে এমনভাবে তার বর্ণনা দিতে শুরু করল কাউরু, প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে তার যেন ব্যক্তিগত পরিচয় আছে।

সাইউরি আর ডাইজো নতুন বিয়ে করা একজোড়া তরুণ-তরুণী, বিয়ের প্রথম বছর পার করছে, বেশ কিছু ভুল বোঝাবুঝি ওদেরকে বিবাহ-বিচ্ছেদের দোরগোড়ায়

BanglaBook.org

নিয়ে এসে ফেলল। পরস্পরকে এখনও ওরা ভালোবাসে, কিন্তু একের পর এক কাকতালীয় ঘটনা ওদেরকে হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাওয়াতে থাকল, এবং শেষ পর্যন্ত আর কোনো উপায় না দেখে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা।

এবং তারপর একদিন একেবারে হঠাৎ কাকতালীয়ভাবে জাপানের সাগরসৈকতে দেখা হয়ে গেল ওদের। ওই জায়গার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এখানেই ওরা প্রথমে মিলিত হয়েছিল।

তারপর একসঙ্গে কাটানো মধুর আর মজার সব সময় এবং ঘটনার কথা যখন স্মরণ করছে ওরা, পরস্পরের প্রতি পুরোনো অনুভূতি নতুন করে জেগে উঠল দুজনের অন্তরে। এক এক করে ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারগুলো দূর করল ওরা, যতক্ষণ না পরস্পরের ভালোবাসা সম্পর্কে নতুন করে আবার নিশ্চিত হওয়া গেল।

অবশ্য ওদের এই গতানুগতিক কাহিনির পেছনে হৃদয়কে উষ্ণ করার মতো একটা ছোট্ট চমক আছে। ভাবাবেগজনিত ওই বিশেষ স্থানটিতে ওদের দেখা হয়ে যাওয়াটা নিখাদ কাকতালীয় ঘটনা বলে মনে করে ওরা। তা আসলে সত্যি নয়।

কিছু বন্ধু ওদের মিলন ঘটানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। একসঙ্গে বসে তারা একটা প্ল্যান করল, নিজেদের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে ব্যবস্থা করল বিশেষ একটা মুহূর্তে যেন ওই জায়গায় দুজনেই পৌঁছোয়।

'ধরতে পারছ, মা? বিচ্ছিন্ন একটা দম্পতির পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু–একইদিন, একই জায়গায়, একই সময়ে? পুরোপুরি শূন্য নয়। কাকতালীয় সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে, যখন কিছু ঘটার সম্ভাবনা সত্যি সত্যি খুব কম, তারপরও ঘটে যায়, তখন তুমি ধরে নাও আড়াল থেকে কেউ কলকাঠি নেড়েছে। এক্ষেত্রে সাইউরি আর ডাইজোর আড়িপাতা বন্ধুরা।'

'মনে হয় বুঝতে পারছি এটা নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ। তুমি বলতে চেষ্টা করছ যে ঘটার সম্ভাবনা এমনকি শূন্য হওয়া সত্ত্বেও প্রাণের সূচনা ঠিকই ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত তো দেখাই যাচ্ছে যে আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে। কাজেই কিছু একটা কোথাও থেকে সুতো টানছে; ঠিক?'

কাউরু সব সময় এটা অনুভব করে। মাঝে মধ্যে একটা সময় আসে, যখন দৃশ্যত কোনো কারণ ছাড়াই মাথায় আইডিয়াটা ঢুকে পড়ে যে ওর ওপর নজর রাখছে কেউ, ওকে নিয়ে খেলছে। এটা একা ওর অভিজ্ঞতা, নাকি দুনিয়ার সবারই এরকম অনুভূতি হয়, এখনও খবর নেয়া হয়নি তার।

হঠাৎ করে ঠাণ্ডায় শিরশির করে উঠল গা। ঘুরে দরজার দিকে তাকাতে দেখল সামান্য একটা ফাঁক হয়ে আছে। সোফায় বসেই শরীরটাকে মুচড়ে টান টান করল, যতক্ষণ না বন্ধ করতে পারল ফাঁকটা।

BanglaBook.org

দুই

কাউরুর ঘুম আসছে না। বাবা বাড়ি ফিরতে দেরি করছে দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে ফেলা তোশকে এসে শুয়েছে সে, তাও আধঘণ্টা হয়ে গেছে।

ফুতামিদের পারিবারিক নিয়ম পুত্রসন্তান মা-বাবা দুজনের সঙ্গেই ঘুমোবে জাপানি ঐতিহ্যে সাজানো একই বেডরুমে। তিনটে পশ্চিমা ধাঁচের, একটা জাপানি ধাঁচের কামরা, সঙ্গে ডাইনিং রুম আর কিচেন, সব মিলিয়ে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট তিনজনের জন্যে যথেষ্ট বড়ই বলতে হবে।

প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কামরা আছে। কিন্তু কোনো কারণে, ঘুমোবার বেলায়, জাপানি ঐতিহ্যে সাজানো কামরায় ঢুকে একসঙ্গে শোয় তারা। খানিকটা করে ফাঁক রেখে যে যার তোশক ফেলে, মাঝখানে শোন ম্যাচিকো, দু'পাশে কাউরু আর হাইডিউকি। এই নিয়ম চলে আসছে সেই কাউরুর জন্মের পর থেকে।

সিলিংয়ের দিকে চোখ, বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পাশে শুয়ে থাকা মাকে মৃদুস্বরে ডাকল কাউরু।

'মা?'

সাড়া নেই। এতক্ষণে কাউরুর মনে পড়ল মার অভ্যাস হলো বালিশে মাথা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া।

কাউরুকে ঠিক অস্থির বলা যাবে না, তবে তার বুকে ক্ষীণ একটু উত্তেজনা জমেছে। ওর কোনো সন্দেহ নেই লঞ্জেভেটি জোনস আর গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালিজ-এর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা আবিষ্কার করেছে সে।

ব্যাপারটা শুধুই একটা কোইন্সিডেন্স হতে পারে না। সরল অনুবাদ বা ব্যাখ্যা হলো, মানুষের আয়ুর সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কিছু একটা সম্পর্ক আছে–হয়তো এমনকি প্রাণের গোপন রহস্যের সঙ্গেও সম্পর্কিত।

পারস্পরিক এই সম্পর্কটা নিখাদ ভাগ্যগুণে আবিষ্কার করেছে কাউরু। টিভিতে একটা ডকুমেন্টারি দেখাচ্ছিল, কিছু গ্রামের লোক তুলনায় অনেক বেশি দিনে বাঁচে, আর কাকতালীয়ভাবে ঠিক ওই মুহূর্তে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তারতম্য দেখিয়ে তৈরি পৃথিবীর একটা মানচিত্র ফুটে উঠল তার কমপিউটারের স্ক্রিনে।

পরে কমপিউটারে এটা-সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তারতম্য সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জানতে পারে কাউরু, ব্যস, সেই থেকে মহাকর্ষ সম্পর্কে ওর ভেতর প্রবল একটা আগ্রহ জন্মে গেল।

টিভি স্ক্রিন আর কমপিউটার স্ক্রিনের মধ্যে কিছু একটা তার ষষ্ঠইন্দ্রিয়কে উসকে দেয়, আর তাই দুটো মানচিত্রকে এক করে সে। এধরনের অনুপ্রেরণা শুধুমাত্র মানবজাতিকেই দেয়া হয়েছে।

তথ্য প্রক্রিয়ায় যতই অবিশ্বাস্য সক্ষমতা থাকুক ওটার, অঙ্ক কষার গতি যতই

BanglaBook.org

ক্ষিপ্র হোক, অনুপ্রাণিত হওয়ার কোনো ব্যবস্থা একটা কমপিউটারের নেই, চিন্তা করল কাউরু।

দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়কে একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা কোনো মেশিনের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। এধরনের সক্ষমতা যদি কখনো অর্জিত হয়, হার্ডঅয়ারে কোনোভাবে মানুষের ব্রেইন সেল সংযুক্ত করার কারণেই তা অর্জিত হবে।

মানুষ-কমপিউটার সহবাস।

এই ব্যাপারটা বেশ জটিল মনে হয় কাউরুর। বোঝার কোনো উপায় নেই তা থেকে ঠিক কী আকার-আকৃতি নিয়ে অনুভবক্ষম নতুন প্রাণের আবির্ভাব ঘটবে পৃথিবীর বুকে। অনন্ত কৌতূহল জাগানোর মতো একটা বিষয়।

দুনিয়াটা কীভাবে কাজ করে তা বোঝার কাউরুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে আলাদা আলাদা অসংখ্য প্রশ্নের মাধ্যমে, তবে সবগুলোর গোড়ায় রয়েছে মূল অজানা একটি বিষয়: প্রাণের উৎস।

প্রাণের সূচনা হলো কীভাবে!

কিংবা, বিকল্প প্রশ্ন:

আমি এখানে কেন?

বিবর্তনবাদ আর প্রজনন-শাস্ত্র, দুটোই কাউরুর কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, তবে ওর জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত অনুসন্ধান সব সময় ওই একটা প্রসঙ্গকে ঘিরেই।

সরাসরি কোয়্যাসাভেইট থিয়রিতে বিশ্বাসী নয় কাউরু, যাতে বলা হয়েছে ক্রমশ একটা অজৈব দুনিয়া গড়ে উঠেছিল, আরএনএ এবং ডিএনএ আসার আগে পর্যন্ত। সে দেখল প্রাণ নিয়ে যত বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ততই বড় একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেলফ- রেপ্লিকেইশন–প্রাণ বা প্রাণের কিছু উপাদান সব সময় নিজেকে কপি করছে।

কাজটা নিয়ন্ত্রণ করে ডিএনএ, প্রজননশাস্ত্র সম্পর্কে যে তথ্য বহন করে তার নির্দেশনায় তৈরি হয় প্রোটিন, প্রাণের উপাদান। শত শত অ্যামিনো অ্যাসিডের সমর্থন নিয়ে বিশ রকম প্রোটিন অস্তিত্ব পায়। ডিএনএ-র ভেতরে তালা দিয়ে রাখা কোডই আসলে সেই ভাষা, ব্যাখ্যা করবে অ্যাসিডগুলো কীভাবে সারি বাঁধবে বা সাজবে।

অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো পূর্ব-নির্ধারিত একটা ছকে সারি না বাঁধলে, প্রাণের জন্যে অর্থপূর্ণ একটা প্রোটিন গঠিত হবে না। প্রায়ই আদ্যিকালের সাগরকে ঘন সুপ ধরে নিয়ে সেটাকে প্রাণের পূর্বশর্ত বলে ভাবতে পছন্দ করা হয়। তারপর ওই ঘন সুপকে কোনো শক্তি আলোড়িত করতে থাকে, যতক্ষণ না সবকিছু অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

কিন্তু এর সম্ভাবনা কতটুকু?

ব্যাপারটা সহজে বোঝার জন্যে কাউরু সিদ্ধান্ত নিল আরও অনেক ছোট আর পরিচ্ছন্ন সংখ্যার সাহায্য নিয়ে চিন্তা করবে।

এক লাইনে রাখা হলো কুড়ি পদের একশ অ্যামিনো অ্যাসিড, ওগুলোর মধ্যে মাত্র একটা প্রোটিনে পরিণত হচ্ছে, প্রাণের উপাদানে তখন সম্ভাব্যতা দাঁড়াবে একশ শতাংশ শক্তির বিশ ভাগ। একশ শতাংশ শক্তির বিশ ভাগ এমন একটা সংখ্যা, মহাবিশ্বে যত হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে, তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি। হিসাব করতে গেলে, এ যেন একসঙ্গে কয়েকবার লটারি খেলা, সৌভাগ্যের প্রতীক টিকিট হলো বিশ্বভর্তি হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি, এবং প্রতিবার বিজয়ী হওয়া।

সংক্ষেপে, এর সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। আসলে অসম্ভব। অথচ, তা সত্ত্বেও, প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে। কাজেই খেলাটা হতে হবে কারিগরি ফলানো। কাউরু জানতে চায় ঠিক কীভাবে অসম্ভাব্যতার পাঁচিল টপকানো সম্ভব হলো। ওর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ঘুঁটিতে কিছু ভরার প্রকৃতিটা বুঝতে পারা–ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার আশ্রয় না নিয়েই।

আবার আরেকদিকে, মাঝে-মধ্যে এই সন্দেহও মাথাচাড়া দেয় সবকিছুই আসলে ভ্রম বা মায়া।

সত্যিকার অর্থে নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় নেই তার শরীর একটা শরীর হিসেবে অস্তিত্ব নিয়ে আছে। ওর জ্ঞানশক্তি ওকে হয়তো বিশ্বাস করায় আছে, তবে এ সম্ভাবনা সব সময় রয়েছে যে বাস্তবতা কিছু না–শূন্য।

প্রায় অন্ধকার কামরায় তোশকের ওপর শুয়ে আছে কাউরু, শুধু রাতের নিঃসঙ্গ আলোটি জ্বলছে, নীরবতা এত গভীর যে সে তার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কাজেই এখন, ঠিক এই মুহূর্তে, এ-কথা ভাবার মধ্যে কোনো ভুল নেই যে সে বেঁচে আছে। কাউরু ওর হৃৎপিণ্ডের ওই আওয়াজটা বিশ্বাস করতে চায়।

কাউরু মোটরসাইকেল ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল ওর অন্তরের কান দিয়ে। এই আওয়াজ ওর শুনতে পাওয়ার কথা নয়। এই শব্দ, বাস্তবতার নিরিখে, ওর চামড়ার কানে এসে পৌঁছুবে না!

'বাবা ফিরেছে।'

মনের চোখ দিয়ে কাউরু দেখতে পাচ্ছে ওর বাবার পুরানো বাইকটা রাস্তা ছেড়ে একশ গজ নীচের আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে ঢুকছে বাইকটা তিনি দু'মাসও হয়নি কিনেছেন। সিট থেকে নেমে ওর বাবা এখনও ওটার দিকে সন্তুষ্টিভরা চোখে তাকিয়ে।

কাজের জায়গায় আসা-যাওয়া করতে ব্যবহার করছেন তিনি ওটা, এর কারণ সম্ভবত তা না হলে ওটায় চড়ার সময় বের করতে পারবেন না। এখন ওর বাবা

BanglaBook.org

বাড়ি ফিরে এসেছেন। সংকেতগুলো নিজে থেকে প্রবল শক্তিতে কাউরুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। এ-ব্যাপারে ভুল বোঝাঝুঝির কোনো অবকাশ নেই। ওগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, কাউরুর ষষ্ঠইন্দ্রিয় আজ রাতে বাবার গতিবিধি অনুসরণের সুযোগ করে দিল।

বাবার সামান্য নড়াচড়াও কল্পনা করছে কাউরু, নিজের মনের পরদায় এঁকে নিচ্ছে প্রতিটি। ওর বাবা এখন ইগনিশনে ঢোকানো চাবি ঘোরাচ্ছেন, এখন তিনি হলের মেঝেতে এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে, বগলের নীচে হেলমেটটা আটকানো, এখন তিনি চোখ তুলে এলিভেটরের মাথায় বসানো ইন্ডিকেটর লাইটের দিকে তাকাচ্ছেন।

ঊনত্রিশ তলায় পৌঁছুতে বাবার কত সময় লাগে গুণল কাউরু এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, কার্পেটমোড়া করিডরে ধরে দ্রুত পা চালিয়ে হেঁটে আসছেন ওর বাবা, ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছেন না।

২৯১৬ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামলেন তিনি। পকেট থেকে কার্ড-কি বের করে সাবধানে ফাটলে ঢোকালেন।

কল্পিত নড়াচড়া আর আওয়াজের সঙ্গে এবার জায়গায় বদল করল সত্যিকার নড়াচড়া আর আওয়াজ, শুরু হলো সামনের দরজা ক্লিক করে খোলার মধ্যে দিয়ে। এই সময় সন্দেহটা জাগল ওর মনে।

অনিশ্চয়তায় ঠাসা একটা মুহূর্ত পার করছে কাউরু, অনুভব করল সেটা প্রায় স্পর্শযোগ্য। কল্পনা আর বাস্তবতার মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে সে, এবং তার বুকের ভেতর একটা চিৎকার মাথাচাড়া দিচ্ছে।

এ তাহলে বাবাই!

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করল কাউরুর, বাবাকে স্বাগত জানাবে, তবে একচুল নড়ল না, নিজেকে জোর করে বিছানায় ধরে রাখল। এখন চেষ্টা করে দেখতে হবে এরপর ওর বাবা কি করেন তা আগেই বলে দেয়া যায় কিনা।

অ্যাপার্টমেন্টের হলরুম ধরে এমন ভঙ্গিতে হাঁটছেন হাইডিউকি, কারও ঘুম ভেঙে গেলে তাঁর যেন কিছু আসে যায় না। বগলের তলায় চেপে ধরা হেলমেটটা খুব জোরে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেলো। তার গুণ গুণ করে গান গাওয়া মোটেও স্বরযন্ত্রের স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। মন ভালো থাকলে হাইডিউকি নড়াচড়ার সময় একটু বেশি আওয়াজ করেন। এর কারণ সম্ভবত অন্যান্য সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর শক্তি অনেক বেশি।

হঠাৎ কি হলো, কাউরু দেখল ওর বাবা এরপর কি করবেন তা আর পড়তে পারছে না। সমস্ত শব্দ থেমে গেছে, ওর কোনো ধারণা নেই বাবা এই মুহূর্তে ঠিক কোথায়। মাথাটা খালি হয়ে গেল ওর।

তবে হঠাৎ কামরার টানা দরজাটা খুব জোর লাগিয়ে খোলা হলো। কিছু বুঝতে

BanglaBook.org

না দিয়ে প্রবল বন্যার মতো প্রচুর আলো ঢুকে পড়ল কামরার ভেতর। খুব যে একটা উজ্জ্বল আলো তা নয়, তারপরও চোখ দুটোকে সরু করতে হলো কাউরুকে।

এটা সে আগেভাগে দেখতে পায়নি।

ঘরে ঢুকে নিজ তোশকের ওপর উঠে পড়লেন হাইডিউকি, তারপর একেবারে কাউরুর তোশকের কিনারায় এসে দাঁড়ালেন। হাঁটু গাড়লেন, মুখ নামালেন ছেলের কানের কাছে।

'হেই, কচি, উঠে পড়ো।'

কাউরু এমন ভাব দেখাল যেন এইমাত্র ওর ঘুম ভেঙেছে, বলল, 'ওহ্, তুমি, বাবা। কটা বাজে?'

'ভোর একটা

'হাহ্।'

'এসো, ওঠো তুমি।'

কাউরুর কপালে এটা প্রায়ই ঘটে, রাত দুপুরে বিছানা থেকে টেনে তোলা হবে ওকে, বিয়ার খাওয়ার সময় বাবাকে যাতে সঙ্গ দিতে পারে, সেই সঙ্গে ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে।

এরকম ঘটলে পরদিন আর স্কুলে যাওয়া হয় না কাউরুর, পুরোটা সকাল ঘুমিয়ে কাটাতে হয়।

গত সপ্তায় বাবার কারণে দুদিন স্কুল কামাই হয়েছে। ছেলে প্রাথমিক স্কুলে কি পড়ছে না পড়ছে তা নিয়ে মাথা ঘামান না হাইডিউকি। বাবার কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে প্রায়ই খুব হতাশায় ভোগে কাউরুঃ একটি শিশুর কাছে স্কুল শুধুমাত্র লেখাপড়া করার জায়গা নয়। ওটা খেলাধুলো করার জায়গাও বটে। ওর বাবা সেটা বোঝেন বলে মনে হয় না।

'কাল আমি স্কুলে যেতে চাই।'

ফিসফিস করল কাউরু, পাশে শুয়ে থাকা মার যাতে ঘুম না ভাঙে। কথা বলার জন্যে বিছানা ছাড়তে আপত্তি নেই ওর–সত্যিকথা বলতে কি, এটা সে খুব চাইছেও–তবে পরিষ্কার করে রাখল বেশিক্ষণ জেগে থাকা যাবে না।

'বাচ্চা হিসেবে দায়িত্ব বোধ তোমার একটু বেশি দেখছি কার হাত-পা পেয়েছ তুমি, শুনি?' গলা চড়িয়ে বললেন হাইডিউকি, শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখার কাউরুর চেষ্টাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে।

বিরক্তি চেপে রেখে লাফ দিয়ে তোশক থেকে নেমে গেল কাউরু, এখন যদি কামরা থেকে বাবাকে সে বের করে নিয়ে না যায় নির্ঘাত মার ঘুম ভাঙাবেন তিনি। তবে বাবার প্রশ্নটা ভাবিয়ে তুলেছে ওকে।

সত্যিই তো, কার মতো হয়েছে সে?

চেহারার কথা যদি বলা হয়, ওর বাবার সঙ্গে কাউরুর খুব একটা মিল খুঁজে

BanglaBook.org

পাওয়া যাবে না। স্বভাব বা ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও, ওর মেজাজি আর খেয়ালি বাবার তুলনায় কাউরু অনেক বেশি অনুভূতি প্রবণ–অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। হ্যাঁ, অবশ্যই এখনও ছেলেমানুষ সে, কিন্তু তারপরও বাবার সঙ্গে ভেতরে এবং বাইরে নিজের এত কম মিল লক্ষ করে মাঝেমধ্যে ধাঁধায় পড়ে যায় কাউরু।

বাবার পিঠে হাত রেখে চাপ দিচ্ছে, বেডরুম থেকে হলরুমে বের করে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। ওখানে পৌঁছেও থামল না, ঠেলে নিয়ে গেল লিভিং রুমে, লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, 'বাপরে বাপ, তুমি কম ভারি না।'

ছেলে যখনই এভাবে তাঁকে ঠেলে নেয়, খেলাচ্ছলে পেছন দিকে হেলান দেয়ার ভঙ্গি করেন হাইডিউকি, ঠেলতে যাতে কষ্ট হয় কাউরুর, তখন ওর সঙ্গে এমন একটা অসভ্যতা করেন যে ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়, সেই সঙ্গে তাঁর একটা অশ্লীল হাসিও শুনতে হয় কাউরুকে। তখন বাবার পিঠ থেকে একটা হাত সরিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরতে বাধ্য হয় সে।

এতক্ষণে হাইডিউকি খেয়াল করলেন ছোট্ট কাউরু তাকে ঠেলতে ঠেলতে কিচেন কাউন্টারের কাছে নিয়ে চলে এসেছে। ভাব দেখে মনে হলো হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেছে তাঁর।

রেফ্রিজারেটারের দিকে এগোলেন তিনি। খুললেন ওটা। একটা বিয়ার নিয়ে হড়হড় করে গ্লাসে ঢাললেন। তারপর, কাউরু এখনও হাঁপাচ্ছে দেখে, ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন গ্লাসটা। হাসছেন তিনি।

'তোমারও খানিকটা দরকার নাকি?'

বাড়ি ফেরার পথে গলা ভেজাবার জন্যে কোথাও থামেননি হাইডিউকি। নিজের ওপর শতকরা একশ ভাগ নিয়ন্ত্রণ আছে তাঁর, অর্থাৎ একদম অমাতাল তিনি। আজ এটাই তাঁর প্রথম অ্যালকোহল।

'না, ধন্যবাদ। মা আবার তোমার ওপর খেপে যাবে।'

'এত দায়িত্ববান হওয়াটা বন্ধ করো।'

আয়েশি, লোক-দেখানো ভঙ্গিতে ঢকঢক করে বিয়ার খেলেন ইউডিউকি, মুখ মুছলেন। 'আমার ধারণা, কোনো ছেলে আমার মতো বাপ পেলে তার ফুটো আরও বেশি আঁটো হওয়া উচিত।'

নানা রকম শব্দ সহযোগে বিয়ারভর্তি দ্বিতীয় গ্লাসটাও দ্রুত খালি করলেন তিনি, বোতলটা শেষ হতে প্রায় কোনো সময়ই লাগল না।

'যদি জিজ্ঞেস করো, বুঝলে কচি, এই জিনিসটা খেতে সবচেয়ে বেশি মজা পাই আমি যখন তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি।'

নিজের কথা জানে কাউরু, বাবা যখন ড্রিঙ্ক করেন, তাঁকে সঙ্গ দিতে তখন ওর মোটেও খারাপ লাগে না। অ্যালকোহল নিতে বাবা প্রকাশ্যেই এত বেশি আনন্দ পান, দেখতে খুব মজা লাগে ওর।

BanglaBook.org

সারাদিন কাজ করার ক্লান্তি যখন বাবাকে ছেড়ে যায়, কাউরুর মেজাজও বেশ হালকা হয়ে ওঠে।

ফ্রিজের কাছে গিয়ে এবার নিজেই একটা বোতল নিয়ে এসে বাবার গ্লাসটা ভরে দিল কাউরু।

তবে 'ধন্যবাদ' বলার বদলে ছেলেকে একটা হুকুম করলেন বাবা।

'ওহে, কচি, যাও মাচিকে ডেকে তোলো।'

হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, কাউরুর মার কথাই বলছেন হাইডিউকি।

'সম্ভব নয় মা ঘুমোচ্ছে। সারাদিন কাজ করে খুব ক্লান্ত।'

'সে তো আমিও, কিন্তু তুমি কি আমাকে ঘুমোতে দেখছ?'

'কিন্তু তুমি জেগে আছ, জেগে থাকতে চাইছ বলে।'

'এত কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, যাও, তার ঘুম ভাঙাও।'

'কোনো কাজে মাকে তোমার দরকার?'

'হ্যাঁ। ওকে আমার বিয়ার খাওয়ানোর জন্যে দরকার।'

'মা হয়তো ড্রিঙ্ক করতে চাইবে না।'

'ঠিক আছে, সেটা দেখা যাবে,' বললেন হাইডিউকি। 'তুমি শুধু ওকে গিয়ে বলো আমি ডাকছি। ও চলে আসবে।'

'এখানে মাকে আমাদের দরকার নেই,' শান্তসুরে, বোঝানোর সুরে বলল কাউরু। 'আমরা তো বেশ আছি, শুধু আমরা দুজন, তাই না? তাছাড়া, তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন করার আছে।'

'কথা শোনো, বাপ। এখানে আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। মাচি নিজেকে পরিত্যক্ত ভাবুক, এটা আমরা চাই না। তুমিই বলো, চাই?'

'তুমি সব সময় এরকম করো...'

বেডরুমের দিকে রওনা হয়ে গেছে কাউরু, একটু পা টেনে টেনে হাঁটছে। কী কারণে যেন মার ঘুম ভাঙাবার কাজটা সব সময় ওর ঘাড়ে চাপে। এর কারণ সম্ভবত এই যে বছর কয়েক আগে ওর বাবা একদিন মার ঘুম ভাঙাতে গিয়ে খুব তিক্ত একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাই আজও তিনি এই কাজটায় সাহস পান না।

ফুতামি পরিবারে শেষ পর্যন্ত বাবার ইচ্ছেই খাটে। এর কারণ এটা নয় যে হাইডিউকি পরিবারপ্রধান হিসেবে পাওয়া কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কঠোরভাবে প্রয়োগ করেন, বরং কারণ হলো ওদের তিনজনের মধ্যে তাঁর ভেতরই তারুণ্য সবচেয়ে বেশি, সেই হারে ছেলেমানুষিও।

একজন বিজ্ঞানী হিসেবে বাবাকে শ্রদ্ধা করে কাউরু। কিন্তু এটা সে লক্ষ না করে পারে না যে বয়স্ক একজন মানুষের লক্ষণ তাঁর মধ্যে চোখে পড়ার মতোই কম। কাউরু বুঝতে পারে না ঠিক কোন জিনিসটা বাবার মধ্যে নেই।

BanglaBook.org

তবে ওর শিশুমন হিসেব কষেছে, যদি এক এক করে ছেলেমানুষি বাদ দিয়ে তার জায়গায় পরিণত মানুষের প্রজ্ঞা অর্জন বড় হওয়ার একটা প্রক্রিয়া হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই এই জিনিসটাই ওর বাবার বেলায় ঘটেনি।

তিন

আরামের ঘুম থেকে মাকে ডেকে তুলতে খুব খারাপ লাগছে কাউরুর। বেডরুমের সামনে পৌঁছে ইতস্তত ভঙ্গিতে দরজাটা খুলল সে। দেখল ম্যাচিকো আগেই নিজের তোশকে উঠে বসেছেন, আঙুল চালাচ্ছেন মাথার চুলে। কাউরুর আর তাঁর ঘুম ভাঙানোর দরকার হলো না—ওর বাবার সশব্দে বাড়ি ফেরাই কাজটা করে রেখেছে।

'ওহ্, মা, দুঃখিত,' বাবার হয়ে ক্ষমা চাইল কাউরু।

'থাক, ও কিছু না।' মার চোখের দৃষ্টি বরাবরের মতোই কোমল।

বলতে গেলে প্রায় কখনোই ছেলেকে তিরস্কার করেন না ম্যাচিকো। কারণটা সম্ভবত এই যে ভুলেও কোনোদিন অযৌক্তিক কিছু চায় না কাউরু, ওর যা দরকার চাইলে ঠিকই কিনে দেন তিনি।

যদিও এখনও মাত্র শিশু, তারপরও মার কথা আর আচরণ থেকে কাউরু বুঝতে পারে কতটা গভীরভাবে তার ওপর নির্ভর করেন ওর মা। এটা ওকে আনন্দ দেয়, তবে সেই সঙ্গে একটা গুরুদায়িত্বও অনুভব করে।

তিনমুখী অচলাবস্থার নাম ফুতামি পরিবার, নিজের ও মা-বাবার সম্পর্কটা এভাবে চিন্তা করে কাউরু। পাথর-কাঁচি-কাগজ নিয়ে একটা খেলার মতো ব্যাপারটা—প্রত্যেকের সঙ্গে এমন একজন আছে, তারা সব সময় হারাতে পারে, এবং এমন একজন, সব সময় হারতে পারে।

মার বেলায় কাউরু খুব শক্তিশালী, কিন্তু বাবার বেলায় দুর্বল। কাজেই শেষ পর্যন্ত প্রতিবার বাবার অযৌক্তিক কাজকর্মে সায় দিয়ে চলতে হয় ওকে, বাবা যা করতে বলে তাই করে।

ছেলের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হাইডিউকি, তাই তার ওপর যখন-তখন যে- কোনো হুকুম চালাতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন না, কিন্তু কি কারণে যেন এই একই রকম দৃঢ়তা তিনি তাঁর স্ত্রীর সামনে দেখাতে সক্ষম নন। স্ত্রীর মেজাজ খারাপ দেখলে সিঁটকে যান তিনি, চেহারা ম্লান হয়ে যায়।

কাজেই স্ত্রীর ঘুম ভাঙানোর ঝুঁকিবহুল কাজটা চালাকি করে তিনি ছেলের ওপর চাপিয়ে আসছেন ওদিকে কাউরুর মা ম্যাচিকো, ছেলের দাবির ব্যাপারে খুব সদয়

BanglaBook.org

হলেও, স্বামীর অসম্ভব আচরণে মাঝে মধ্যে খেপে গিয়ে খুব করে বকাঝকা করেন, হাইডিউকি যেন একটা শিশু।

ওর বাবা মাঝে-মধ্যে গর্ব করে বলেন পরস্পরের এই চমৎকার সম্পর্কই তাদের সংসারে এত সুখ-শান্তি ঢেলে দিয়েছে। বিচিত্র এই সম্পর্ক কারও একার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি–তিন পক্ষের মহা তর্ক-বিতর্ক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর মিথস্ক্রিয়ার ফল।

'কী করছে হাইডি?' ঘাড় চুলকাচ্ছেন ম্যাচিকো , চুলের ভেতর হাতের আঙুল চালাচ্ছেন।

'বিয়ার খাচ্ছে।'

'এত রাত করে? ওকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

'বাবা জানতে চাইছে তুমিও তার সঙ্গে বসবে কিনা।'

দাঁড়ালেন ম্যাচিকো , নাক দিয়ে হাসলেন।

'ভাবছি, ওর খিদে পায়নি?'

'বলতে পারব না। হতে পারে এমনি তোমাকে দেখতে চাইছে

কাউরুর ভাব নির্লিপ্ত নিরীহ হলেও, হেসে উঠলেন ম্যাচিকো যেন বলতে চাইলেন, কী বিষয়ে কথা বলছ তোমার ধারণা নেই।

তবে কাউরু তার জনক-জননীর গোপন দিকটা সম্পর্কে এরইমধ্যে সচেতন। জাপানি প্রায় সব ছেলেমেয়ের মতোই।

তিনমাস আগে একরাতে–তখন বর্ষা, মাঝ জুনের শুকনো একটা রাত ছিল সেটা–কিচেনে বাবাকে অপ্রত্যাশিত এক অবস্থায় দেখে ফেলেছিল কাউরু।

সে রাতে নিজের বন্ধ কামরায় কমপিউটার নিয়ে বসেছিল কাউরু। একসময় গলাটা এত শুকনো লাগল যে অগ্রাহ্য করা গেল না। দরজা খুলে কিচেনে ঢুকল মিনারেল ওয়াটার নেয়ার জন্য।

ওর যতদূর জানা আছে, নিজেদের বন্ধ কামরায় আছেন মা-বাবা–কিছু একটা কাজের কথা বলছিলেন তাঁরা। গোটা অ্যাপার্টমেন্ট একদম নীরব। ওর মা-বাবা প্রায়ই কাজের কথা বলে নিজেদের আলাদা কামরায় ঢোকেন. মাঝে-মধ্যে ঘুমিয়েও পড়েন ওখানে। সে রাতেও এরকম কিছু হয়েছে বলে ধারণা করল কাউরু।

কিচেনে ঢুকে আলো জ্বালল না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গ্লাসে খানিকটা মিনারেল ওয়াটার ঢালল, তারপর একটুকরো বরফ পুরল মুখে। বোতলটা রাখার জন্যে ফ্রিজটা আবার খুলল, এই সময় হঠাৎ...

সম্পূর্ণ নগ্ন বাবাকে দেখতে পেল কাউরু, কিচেনে ঢুকছেন, ফ্রিজের আলো পড়েছে তাঁর প্রকাণ্ড শরীরে।

লাফ দিলেন হাইডিউকি, বিব্রত হয়ে নয়, বিস্ময়ে।

BanglaBook.org

'আমি জানতাম না তুমি এখানে,' বললেন তিনি, নগ্ন হওয়ায় এতটুকু প্রতিক্রিয়া নেই, ছেলের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে ঠাণ্ডা পানিটুকু খেয়ে ফেললেন।

'কী দেখছ?' ছেলে তাঁর উরুসন্ধির দিকে তাকিয়ে দৃঢ় উত্থান লক্ষ করছে দেখে হেসে উঠে বললেন হাইডিউকি। 'ঈর্ষা হচ্ছে?'

নগ্ন অবস্থায় বাবাকে প্রায়ই দেখতে পায় কাউরু, বিশেষ করে বাথরুমে দুজন একসঙ্গে গোসল করার সময়। কিন্তু পার্থক্যটা ওকে হকচকিয়ে দিয়েছে।

'অচেনা লাগছে,' দ্বিধায় না ভুগে জবাব দিল কাউরু।

'দেখো, কচি, এখানে বংশধররা ভিড় করে আছে,' বলে বাথরুমের দিকে ঘুরে যাচ্ছেন হাইডিউকি, আর ঠিক তখন মোজাইক করা মেঝেতে এক ফোঁটা বীর্য পড়ল।

সেটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কাউরু।

একটু পরই বাথরুমের খোলা দরজার ভেতর থেকে অনিয়মিত বিস্ফোরণে প্রস্রাব করার জোরাল আওয়াজ ভেসে এল।

মাঝে-মধ্যে কাউরুর মাথায় ঢোকে না ওর বাবা বোকা নাকি বুদ্ধিমান। সন্দেহ নেই তিনি একজন দক্ষ কমপিউটার বিজ্ঞানী, কিন্তু মাঝে-মধ্যে এমন সব কাণ্ড করেন যা ছেলেমানুষিকেও হার মানায়। এটা ঠিক যে বাবাকে কাউরু ভালোবাসে, তবে প্রায়ই সে খুব নার্ভাস বোধ করে।

মার কষ্ট আর ভোগান্তি ভালোই বুঝতে পারে কাউরু।

চিন্তাটা কাউরুকে ছাড়ছে না: বাবা এক ফোঁটা তরল পদার্থকে বংশধর বললেন।

মোজাইক মেঝে উষ্ণতা কেড়ে নিচ্ছে, এক ফোঁটা তরলে কিলবিল করে সাঁতারে ব্যস্ত শুক্রগুলো ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে। খালি চোখে, জানা কথা, ওগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, তবে কাউরু গোটা পালের তৎপরতা সম্পর্কে ভালোই সচেতন–মারা যাওয়ার সময় প্রতিটির চেহারা খুব সহজেই কল্পনা করতে পারছে সে, লাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্তূপ তৈরিতে অবদান রাখছে।

এই শুক্র ওর বাবার ভেতর মাইয়োসিস থেকে তৈরি। ওর শরীরে যত সেল আছে, প্রতিটির অর্ধেক ক্রোমজোম এসেছে ওই শুক্র থেকে, বাকি অর্ধেক এসেছে মার ডিম থেকে। দুটিতে মিলে একটি নিষিক্ত ডিম তৈরি করে, শুধু তারপরই সরবরাহ করা সম্ভব হয় একটা সেল তৈরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্রোমজোম।

তবে তারমানে এই নয় যে একটা শুক্র স্রেফ অর্ধেক মানুষ। নির্ভর করে কীভাবে আপনি জিনিসটাকে দেখছেন, শুক্র আর ডিম শরীরের মৌল কাঠামোগত ইউনিট। শুধুমাত্র রিপ্রোডাকটিভ সেলগুলোই বলা যায় জীবনের শুরুতে বিনা বাধায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে– এ-কথা বলা বোধহয় বাড়াবাড়ি হবে না যে

BanglaBook.org

ওগুলোর এক ধরনের অমরত্ব আছে।

এসব বাদ; সে তার বাবার বীর্য এরকম সময় নিয়ে দেখার সুযোগ পাবে এমনটি স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি কাউরু। এখানে, একেবারে ঠিক ওর চোখের সামনে প্রাণরূপের উৎস দেখতে পাচ্ছে, যেটাকে নিজের বলে চেনে সে।

আমি কি সত্যি এত ছোট কিছু থেকে জন্মেছি?

বিহ্বল আর বোবা হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল কাউরু ওর বাবার শরীরে না জন্মানো পর্যন্ত এই বীর্যের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শূন্যতা থেকে সেই রহস্যময় শক্তির দ্বারা সৃষ্ট, যা শুধুমাত্র প্রাণই ধারণ করে।

তিনমাস আগের সেই ঘটনা এত স্পষ্ট মনে আছে কাউরুর, যেন মাত্র গতরাতে ঘটেছে।

ম্যাচিকো অবশ্য মোটেও জানেননি যে কিচেনে পানি আনতে গিয়ে ছেলের সঙ্গে কী কাণ্ড করে বসেছেন তাঁর স্বামী। তা জানলে, তাঁর বিব্রত হওয়ার মাত্রা এত বেশি হত যে কোনো সন্দেহ নেই বাড়িতে রীতিমতো একটা আগুন জ্বলে উঠত, এবং তারপর স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন তিনি কথা বলতেন না। সেই রাগে আজ রাতেও সম্ভবত তিনি বিছানা ছেড়ে স্বামীর জন্যে খাবার ব্যবস্থা করতে যেতেন না।

'ওকে নিয়ে কি যে করব আমি,' একই কথা বিড়বিড় করে বারবার বলছেন ম্যাচিকো । একটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে মাথার চুল আটকালেন তিনি, পাজামার বোতাম লাগাতে গিয়ে ঘর ভুল করে ফেলছেন। দৃশ্যটা খুব ভালো লাগছে কাউরুর–এরমধ্যে ভালোবাসা আছে, আছে ক্ষমা, ত্যাগ আর দায়িত্ব বোধ।

চার

পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে লিভিং রুমের দিকে পা বাড়ালেন কাউরুর মা, ছেলে তাঁর পিছু নিল।

'বিছানা থেকে তুলে আনায় দুঃখিত,' বললেন হাইডিউকি।

'ও কিছু না। আমি জানি তোমার খিদে পেয়েছে। ঠিক কিনা?'

'তা একটু পেয়েছে।'

'একটু বসো, এখনই ব্যবস্থা করছি।'

ম্যাচিকো কিচেনের দিকে রওনা হয়ে গেছেন, তাঁকে বাধা দিলেন হাইডিউকি, স্ত্রীর দিকে বিয়ারভর্তি একটা গ্লাস বাড়িয়ে ধরলেন।

'প্রথমে একটা ড্রিঙ্ক নাও।'

ঘুরে গ্লাসটা নিলেন ম্যাচিকো , কয়েকটা চুমুকও দিলেন। বিয়ার বিশেষ পছন্দ

BanglaBook.org

করেন না তিনি, তাই এক চুমুকে শেষ করে ফেলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এর মানে এটা নয় যে তিনি ড্রিঙ্কার নন, আর সব জাপানি গৃহবধূর চেয়ে গড়ে তাঁর অ্যালকোহল গ্রহণের মাত্রা বরং একটু বেশিই।

যখন দেখলেন হাতে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে তাঁর স্ত্রী কাছাকাছি একটা সোফায় বসেছেন, এতক্ষণে হাইডিউকি নেক টাইয়ের গিঁটটা ঢিলে করলেন একটু। একজন গবেষক হিসেবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে কাজের সময় টাই তাঁকে পরতেই হবে, তা সত্ত্বেও প্রতিদিন ল্যাবরেটরিতে যাওয়ার জন্যে মোটরসাইকেলে গিয়ে বসার আগে ঝকঝকে একটা সুট পরবেন তিনি, শার্টের ওপরের বোতামটা লাগাবেন।

সন্দেহ নেই পুরোনো ঝক্কড়মার্কা মোটরসাইকেলে সুট-টাই পরা লোককে বসা দেখে বিস্মিত হয় লোকজন, তবে তাতে মোটেও কিছু মনে করেন না হাইডিউকি।

গ্যাসের চুলোয় ফ্রাইংপ্যান চাপিয়ে রান্না করা মাংস গরম করছেন ম্যাচিকো , আর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সারাদিন ল্যাবে কি ঘটল তার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিচ্ছেন হাইডিউকি। ম্যাচিকো কিছু জানতে না চাইলেও, প্রবল উৎসাহের সঙ্গে এসব রিপোর্ট করাটা তাঁর একটা পুরোনো অভ্যাস। সহকারী-সহকর্মীদের নাম নিচ্ছেন তিনি, মাঝে-মধ্যে ওগুলোর সঙ্গে বিরূপ কিংবা সরস মন্তব্য জুড়ে দিচ্ছেন।

মা-বাবা নিজেদের জগতে ঢুকে যাওয়ায় একঘেয়ে বোধ করছে কাউরু, নিজেদের পাশে ওর অস্তিত্বের কথা যেন ভুলেই গেছেন তাঁরা।

তারপর ম্যাচিকো র চোখ পড়ল ওর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বিবেচনা বোধ খাটিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে দিলেন।

'ভালো কথা, কাউরু, তুমি আমাকে যেটা দেখালে সেটা তোমার বাবাকেও না দেখানোর কথা?'

'অ্যা? কী?' হকচকিয়ে গেল কাউরু।

'ওই যে, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি।'

'ও, ওগুলো।' ডিশ কাবার্ড থেকে নিজের কাগজ দুটো বের করল কাউরু, বাবাকে দেখানোর জন্যে রেখেছিল ওখানে।

'ও যে কি আবিষ্কার করেছে, দেখলে তুমি চমকে উঠবে,' ওর মা বললেন, তবে কাউরু ব্যাপারটাকে অত বড় করে দেখছে না।

'কী এটা?' বললেন হাইডিউকি, প্রিন্টআউট দুটো মুখের সামনে তুললেন। প্রথমে এক নম্বর পাতাটা দেখছেন, যেটায় সারি সারি সমুন্নতি রেখার সঙ্গে পজিটিভ ও নেগেটিভ সংখ্যা লেখা আছে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জিনিসটার তাৎপর্য ধরে ফেললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকালেন হাইডিউকি। 'বুঝেছি, এটাতে পৃথিবীর মহাকর্ষের কোথায় কি তারতম্য তা দেখানো হয়েছে।'

BanglaBook.org

এখন দ্বিতীয় কাগজটার ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। এবার কিন্তু সহজে বুঝতে পারলেন না জিনিসটা কী ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তাঁর মস্তিষ্কে আগে থেকেই পৃথিবীর একটা জিওলজিকাল ম্যাপ ছিল, কিন্তু চেষ্টা করার পরও তাঁর মাথায় ঢুকল না কালো বিন্দুগুলোর কী মানে। গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে এমন কিছু অনুমানে ধরতে চাইছেন, যেমন–মাটির নীচের জমে থাকা খনিজ পদার্থ। কিন্তু তাও মেলাতে পারলেন না। অবশেষে হার মেনে নিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন।

'ঠিক আছে, আমি পারলাম না। জিনিসটা কী?'

'পৃথিবীর লঞ্জেভেটি জোনস্।'

'লঞ্জেভেটি জোনস্!' কথাটা শোনামাত্র কাগজ দুটো এক করে ধরলেন হাইডিউকি, ওগুলোকে এখন নতুন দৃষ্টিতে দেখছেন।

'আরে, দেখো। গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি যেখানে খুব বেশি নেগেটিভ, শুধুমাত্র সেখানেই দেখা যাচ্ছে লঞ্জেভেটি জোনস্।'

বরাবরের মতো মুগ্ধ হলো কাউরু। আলোচনা উপভোগ্য লাগার অন্যতম কারণ হলো বাবা চট করে সব বুঝে নিতে পারেন। 'ঠিক তাই!' বলল সে, উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না।

'ভাবছি, এরকম কেন,' নিজেকেই প্রশ্ন করলেন হাইডিউকি, মানচিত্র থেকে চোখ তুললেন।

'এটা কি...মানে জানতে চাইছি...এটা কি একটা সাধারণ জ্ঞান?' কাউরুর ভয়, মানুষ হয়তো এই মিলটা আগেই লক্ষ করেছে, সে-ই হয়তো এতদিন ব্যাপারটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল।

'আমি আমার কথা বলতে পারি। আগে কখনও শুনিনি।'

'সত্যি?'

'তাহলে, কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা? এর মানে কি মহাকর্ষের সঙ্গে মানুষের আয়ুর কোনো সম্পর্ক আছে? ডেইটা এত পরিষ্কার আর বিশদ, স্রেফ কাকতালীয় বলে মনে করা কঠিন।'

অপেক্ষা করছে কাউরু।

'ও, আচ্ছা, ভালো কথা। কচি, লঞ্জেভেটি জোনস্‌কে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?' জানতে চাইলেন হাইডিউকি।

খুব স্বাভাবিক যে এটারই ব্যাখ্যা জানতে চাইছেন হাইডিউকি। এই একই অনুভূতি কাউরুরও। একটা লঞ্জেভেটি জোনের কী বর্ণনা দেবে সে? এমন একটা এলাকা, যেখানকার মানুষের গড়পরতা আয়ু অন্য এলাকার মানুষের গড়পরতা আয়ুর চেয়ে বেশি? তা যদি সে বোঝাতে চেয়ে থাকে, তাহলে গোটা জাপানাকে বিশাল একটা লঞ্জেভেটি জোন হিসেবে দেখতে তার কোনো বাধা নেই।

BanglaBook.org

আরও সীমিত সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে ওকে, আরও সম্পূর্ণ ও নিখুঁত, যাতে একটা নকশার ভেতর দেখানো সম্ভব হয় চারপাশের এলাকা থেকে লঞ্চেভেটি জোন আলাদা, যেখানে শতকরা প্রচুর মানুষ একশ বছর বা তারও বেশিদিন ধরে বেঁচে আছে।

কিন্তু বাস্তবে, অঙ্ক কষে মিলিয়ে দেয়া যায় এরকম কোনো সংজ্ঞার অস্তিত্ব নেই। টিভিতে যে-সব গ্রাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে, স্রেফ জনশ্রুতি এবং আয়ুষ্কাল তুলনার মাধ্যমে ওগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে, জানা গেছে প্রাচীন মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে গ্রামগুলোর সুনাম আছে।

'গাণিতিক সংজ্ঞা আছে কিনা আমি জানি না।'

'বেশ অস্পষ্ট। তারপরও অবাক লাগছে, এটা এরকম একটা চেহারা পেল কীভাবে?' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করছেন হাইডিউকি, যেন অস্বস্তি বোধ করছেন। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন।

'এই সম্পর্কটার কথা আগে কখনও শুনেছ তুমি, বাবা—মাধ্যাকর্ষণ আর প্রাণের মধ্যে?' জানতে চাইল কাউরু।

'উম্, ওরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিল, জিরো-গ্র্যাভিটিতে একটা মুরগিকে ডিম পাড়িয়ে। ডিমগুলো নিষিক্ত ছিল না।'

'ওটা আমি শুনেছি। অনেক বছর আগের কথা।'

মনের এক কোনে কোথাও ছিল, তিনমাস আগের ঘটনা, কাউরুর স্মরণ হচ্ছে—বাবার বীর্য দেখার সেই ব্যাপারটা। মুরগি সম্পর্কে পড়া একটা লেখার কথাও মনে পড়ছে, সহবাস করার পরও অনিষিক্ত ডিম পেড়েছে। ওই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে কি প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল সেটা এখন আর সঠিক মনে নেই ওর। বাজারে খুব চালু এমন একটা সাপ্তাহিকে লেখাটা পড়েছিল কাউরু, আসলে আধুনিক যৌনতা সম্পর্কে কিছু একটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনে পুরোনো ওই এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কাউরুর কল্পনা ডানা মেলতে শুরু করল।

ধরা যাক একটা ডিম নিষিক্ত হওয়া ছাড়াই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল, জন্মগ্রহণের মাধ্যমে পরিণত বয়স্ক হলো—ফলাফল হিসেবে কী ধরনের মানুষ পাওয়া যাবে? এক মহিলার মসৃণ, ডিম্বাকৃতি মুখ কল্পনা করল কাউরু। শিউরে উঠল সে। চেষ্টা করল ছবিটা মুছে ফেলতে, কিন্তু মহিলার পিচ্ছিল মুখ ওকে ছেড়ে যেতে রাজি হচ্ছে না।

'না, আমার মনে হয় না এখন পর্যন্ত যৌক্তিক কোনো সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে কেউ। তবে, সে যাই হোক, তুমি কেন গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির সঙ্গে লঞ্চেভেটি জোন তুলনা করতে গেলে?'

'হাহ্?' মাঝে-মধ্যে মাথার ভেতর আকৃতি পেতে শুরু করা ছবি কাউরুর

BanglaBook.org

চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে দেয়, তখন তাকে লক্ষ্য করে কে কি বলছে শুনতে পায় না সে।

'এক কথা আমাকে দিয়ে দুবার বলিয়ো না।' হাইডিউকি এমনিতেই অসহিষ্ণু মানুষ, আর এটা তাঁর খুবই অপছন্দ।

'দুঃখিত।'

'অন্য ভাষায়, আইডিয়াটা কোত্থেকে পেলে তুমি?'

কাউরু ব্যাখ্যা করল: কমপিউটারে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির ম্যাপ দেখছিল সে, ওই একই সময় টিভিতে কিছু গ্রাম দেখানো হচ্ছিল যেখানকার লোকজন অনেকেই একশ বছর বা তারও বেশিদিন বেঁচে আছে। এই দুটো তাকে অনুপ্রাণিত করে।

'আমার ধারণা এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার,' ব্যাখ্যা শেষে বলল কাউরু, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

'অর্থহীন কাকতালীয় ব্যাপার ভালো কিছু প্রসব করে না। উদাহরণ হিসেবে জিঙ্কসের কথাই ধরো।'

'জিঙ্কস?'

কাউরু কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে ঠিক এই সময় বাবা কেন অবৈজ্ঞানিক একটা প্রসঙ্গ তুলছেন। তিনি সম্ভবত ওর মাকে আলোচনায় যোগ দেয়ার একটা সুযোগ করে দিতে চাইছেন।

বিয়ারের সঙ্গে খাওয়ার মতো মাংস ইত্যাদি টেবিলে দেয়ার পর একটা চেয়ারে বসে চুপচাপ ওদের কথা শুনছেন ম্যাচিকো । তাঁকে দেখে ঠিক একঘেয়েমির শিকার বলে মনে না হলেও, স্বামীর মুখে জিঙ্কস শব্দটা শুনে সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন তিনি।

স্ত্রীর এই প্রতিক্রিয়া হাইডিউকির দৃষ্টি এড়ায়নি।

'হেই, ম্যাচি, ইন্টারেস্টিং কোনো জিঙ্কসের কথা জানা আছে?'

'আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'এসব তুমি পছন্দ করো, তাই। ভবিষ্যত বলা, জাদু-টোনা, দোয়া-তাবিজ ইত্যাদি। ভেবো না প্রতি সপ্তায় তোমার রাশিফল পড়া আমার চোখে পড়েনি। তাছাড়া, দুনিয়ার বহু দেশের লোককাহিনি তোমার একেবারে মুখস্থ।'

'ঠিক আছে, আচ্ছা। জিঙ্কস। যেটা মন্দ বা অশুভ কিছু বয়ে নিয়ে আসে, সেটাই জিঙ্কস।'

'আমরা তো অর্থ জানতে চাইনি। দু'একটা গল্প শোনাও না।'

'বেশ, শোনো। কেউ যদি তার প্রেমিককে রুমাল উপহার দেয়, সম্পর্কটা ভেঙে যাবে।'

'ধ্যাত, এটা একদম বাসি, সবাই জানে। আরও বিদঘুটে, উদ্ভট কিছু তুমি

BanglaBook.org

জানো না? চিন্তা করো!'

কাউরুর ধারণা সে বুঝতে পারছে ওর বাবা ঠিক কি ধরনের গল্প খুঁজছেন। সেটাকে এমন একটা উদাহরণ হতে হবে, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির ঘটনাকে সংযুক্ত করতে সক্ষম

'উদ্ভট কিছু? ঠিক আছে, তাহলে এটা শোনো? তুমি যদি নদীতে একটা কালো বিড়ালকে সাঁতার কাটতে দেখো, তোমার ঘনিষ্ঠ কেউ মারা যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট চুষল কাউরু। 'সত্যি?'

'সবাই বলে আর কি। এই, তুমিও তো শুনেছ, তাই না, হাইডি?' সমর্থন চেয়ে হাইডিউকির দিকে তাকালেন ম্যাচিকো । কিন্তু হাইডিউকি শুধু হাসলেন, কান পাতার ভঙ্গিতে কাত করলেন মাথাটা।

'আরও শোনাও!'

'এটা কেমন লাগে বলো। তুমি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছ, তখন যদি একটা চেয়ারের পিঠ জানালার দিকে থাকে, তুমি তোমার মানিব্যাগ ফেলে দেবে।'

হাততালি দিলেন হাইডিউকি।

'ঠিক আছে, এটা দিয়েই কাজ চালাব আমরা। এখন, এটা সত্যিও হতে পারে আবার মিথ্যেও হতে পারে, তবে এসো আমরা ধরে নিই এ-ধরনের একটা কুসংস্কারের অস্তিত্ব আছে।'

'ধরে নিই আবার কি! এটা আছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' বললেন হাইডিউকি, এক করলেন দুই তালু। 'এখন দুটো ঘটনাকে আমরা এক করি এসো। তুমি যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছ তখন জানালার দিকে পেছন করা একটা চেয়ার, এটা একটা ঘটনা; আরেকটা ঘটনা তুমি তোমার মানিব্যাগ কোথাও ফেলে এসেছ। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরস্পরের সঙ্গে এই দুটো ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। দুনিয়া জুড়ে প্রচুর কুসংস্কার আছে, সন্দেহ নেই বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার বিভিন্ন কারণে তৈরি হয়েছে। তবে আমাকে যেটা বিস্মিত করে সেটা হলো, হুবহু একই কুসংস্কারের অস্তিত্ব যখন তুমি দুটো অনেক দূরের সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় পাও—পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মাচি যে উদ্ভট কুসংস্কারের কথা এইমাত্র শোনাল আমাদের, সেটার অস্তিত্ব যদি ভূ-গোলকের অন্য কোনো প্রান্তেও থাকে, ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর হবে, তাই না?'

'সে-ধরনের কুসংস্কার কি আছে? দুনিয়ার অন্য সব জায়গাতেও শুনতে পাওয়া যায়?' পালা করে মা ও বাবাকে দেখছে কাউরু।

স্ত্রীকে উৎসাহ দিলেন হাইডিউকি। 'তুমি কি বলো, মাচি?'

'হ্যাঁ, আছে বইকি। যে জিঙ্কস একটু আগে তোমাদের শোনালাম, সেটা একটা। এটা ইউরোপ আর আমেরিকাতেও পাবে তোমরা।'

চোখে সংশয় নিয়ে বাপ-বেটা দৃষ্টি বিনিময় করল।

BanglaBook.org

'ভালো কথা, মাচি, তুমি কখনও ভেবেছ, কুসংস্কার কেন তৈরি হয়?' জানতে চাইলেন হাইডিউকি।

'না,' বললেন মাচি, গলায় সামান্য ঝাঁঝ।

'তুমি, কচি?'

'এটার সঙ্গে সম্ভবত হিউম্যান সাইকোলজির কিছু একটা সম্পর্ক আছে। আমি আসলে ঠিক জানি না।'

আলোচনার এই পর্যায়ে হাইডিউকির সামনে পাঁচটা বিয়ারের খালি বোতল দেখা যাচ্ছে। তাঁর কথা বলার ইঞ্জিন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

'নিজেকে জিজ্ঞেস করো, কুসংস্কার কী? এটা একটা মৌখিক ঐতিহ্য–লোকমুখে রটে যায়–তুমি যদি কিছু দেখো বা কোনো অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাও তাহলে নির্দিষ্ট কিছু একটা ঘটবে। জিঙ্কসের বেলায় সেটা মন্দ, তবে কুসংস্কার থেকে ভালো কিছুও ঘটতে পারে, কিংবা এমন কিছু ঘটতে পারে যেটাকে ভালো বা মন্দের সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। সংক্ষেপে, একটা কুসংস্কার বিস্ময়কর বা অস্বাভাবিক দুটো ঘটনাকে এক করে। সব সময় না হলেও, বিজ্ঞানীরা মাঝে-মধ্যে যোগাযোগটা ব্যাখ্যা করতে পারেন।

'উদাহরণ হিসেবে, যে কুসংস্কারে বলা হয়েছে মেঘ যখন পুব থেকে পশ্চিমে যাবে তখন বৃষ্টি হবে, সেটা আধুনিক আবহবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আরও কিছু আছে, যেগুলো তুমি জন্মগত সহজজ্ঞানেই বুঝে নিতে পার, যেমন যেটিতে বলা হয়েছে ফটো তোলা হলে তোমার জীবনের মেয়াদ কমে যাবে। কিংবা যেগুলোতে স্যান্ডেল ছিঁড়ে যাওয়া বা চপস্টিক ভেঙে যাবার কথা বলা হয়েছে, বা কালো বিড়াল অথবা সাপ দেখার কথা বলা হয়েছে–এগুলো ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন কিছু নয়। এগুলোয় কীভাবে যেন একটু গা শিরশির করা ভাব আছে। কালো বিড়াল আর সাপ দুনিয়ার সব মানুষকেই অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়।

'সমস্যা হলো সেই সব কুসংস্কার নিয়ে যেগুলোর মধ্যে যুক্তি নেই, শোনামাত্র তুমি অবাক হয়ে বলে উঠবে, *"এসব মানুষ বিশ্বাস করে কেন?"* যে জিঙ্কস মাচি আমাদের শোনাল, ওটা এর একটা ভালো উদাহরণ। তুমি বাড়ি ছেড়ে বেরোবার সময় জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসানো একটা চেয়ারের সঙ্গে তোমার মানিব্যাগ ফেলে দেয়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে?'

থামলেন হাইডিউকি, তাকালেন কাউরুর চোখে।

'হতে পারে ওটার মূলে অভিজ্ঞতা আছে।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ হয়তো অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জেনেছে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা চেয়ার জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসানো থাকলে মানিব্যাগ ফেলে দেয়ার হার বা ঝুঁকি বাড়ে।'

'কিন্তু পরিসংখ্যান কোনো রকম নিশ্চয়তা দেবে না যে এরকমটি ঘটবেই।'

BanglaBook.org

'কতটুকু সঠিক, আমরা এখানে তা নিয়ে কড়াকড়ি করছি না। এসো ধরি, তুমি যখন মানিব্যাগটা ফেলে দিলে তখন একটা চেয়ার সত্যি সত্যি জানালার দিকে পেছন করে বসানো ছিল। আরও ধরি, পরের বার যখন তুমি মানিব্যাগটা ফেলে দিলে তখনও চেয়ারটা ওভাবে বসানো ছিল। কাজেই তুমি কাউকে কথাটা জানালে, বললে দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোথাও একটা সম্পর্ক আছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যাকে তুমি জানালে তারও এরকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা হয়ে থাকলে মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলবে, "হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ।" তবে তৃতীয়পক্ষ যদি গ্রহণযোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেয় তাহলে বেশিরভাগ সম্ভাবনা আইডিয়াটা আর ছড়াবে না।

'কিন্তু একবার জিঙ্কস হিসেবে চালু হয়ে গেলে, ওটাকে নিয়ে স্রেফ মানুষের সচেতনতার কারণে, তাদের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে, আর তাতে ওটার টিকে যাবার ভালো সম্ভাবনা আছে। দুটো জিনিসের মধ্যে একবার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেলে, ওই সম্পর্ক নিয়ে মানুষের সচেতনতা বন্ধনটাকে আরও দৃঢ় করে, দেখছ। বাস্তবতা আর কল্পনা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।'

'তারমানে বলতে চাইছ কামরা ছেড়ে তোমার বেরোবার সময় জানালার দিকে পেছন করা চেয়ার এবং তোমার মানিব্যাগ ফেলে দেয়ার ঘটনা দুটো পরস্পরের ওপর হুবহু একই ধরনের অদৃশ্য কোনো প্রভাব ফেলছে?'

'এটা তুমি বাতিল করে দিতে পার না যে কোনো একটা স্তরে, গভীরে কোথাও, ওগুলোর সম্পর্ক আছে।'

কুসংস্কারকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে, ওর বাবা আসলে ঠিক কি বলতে চাইছেন? কাউরু অনুভব করল, 'কুসংস্কার'-এর পরিবর্তে 'প্রাণ' ব্যবহার করতে পারে সে। আলোচনাটা তাহলে এখনও চালানো যায়।

'প্রাণ,' বিড়বিড় করল কাউরু। ওই শব্দ যেন একটা খেই, ওরা তিনজন দৃষ্টি বিনিময় করছেন।

'আমাকে লুপের কথা মনে করিয়ে দিল।'

প্রসঙ্গটা ম্যাচিকো তুললেন। তিনি যেন উপলব্ধি করেছেন 'প্রাণ' শব্দটির স্বাভাবিক প্রগতি ওটা।

ডাক্তারি কোর্সে ভর্তি হয়ে কলেজের লেখাপড়া শুরু করেছিলেন হাইডিউকি। বিষয় বদলে যুক্তিবিদ্যা নেন। গ্রাজুয়েট স্কুলে মেটামেথামেটিকস পড়েছেন।

কিন্তু একটা থেকে আরেকটা হয়ে পুরোনো পরিত্যক্ত বিষয়টা আবার গ্রহণ করেন তিনি, যেটায় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল–প্রাণ।

তিনি সিদ্ধান্ত নেন, গণিতের ভাষা প্রাণকে ব্যাখ্যা করতে পারে কিনা দেখা দরকার। বায়োলজি সম্পর্কে তার পুরোনো উৎসাহ আবার ফিরে আসে।

BanglaBook.org

ডক্টরেট করার পর একটা জাপানি-আমেরিকান যৌথ রিসার্চ প্রজেক্টে কৃত্রিম প্রাণ-এর ওপর গবেষণা করার প্রস্তাব পান হাইডিউকি। এতটুকু ইতস্তত না করে প্রস্তাবটা গ্রহণ করেন। কমপিউটারের ভেতর প্রাণ সৃষ্টি? এরচেয়ে বেশি আর কিছু চাওয়ার কথা ভাবতে পারেন না হাইডিউকি।

তখনও তিনি তরুণ, ত্রিশ পেরোননি, বিয়ে হলেও সন্তান হয়নি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পাঁচ বছর পর আগে থেকে আন্দাজ করতে না পারা একটা কারণে থেমে গেল ওই প্রজেক্ট। ওটা ব্যর্থতা ছিল না, নির্দিষ্ট ধরনের কিছু সফলতা অর্জন করার পর। কিন্তু হাইডিউকির কাছে সেটা সাফল্য বলে মনে হলো না, কারণ যেভাবে ওটা শেষ হলো, তিনি অনুভব করলেন গোটা ব্যাপারটা তাঁর গলায় আটকে গেছে।

যে প্রজেক্টে তিনি তাঁর তারুণ্যের সমস্ত আবেগ আর মেধা ঢেলে দিয়েছিলেন, পরিণতিতে দেখলেন সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে, তার নাম ছিল লূপ।

পাঁচ

কাউরুকে নতুন একটা প্রশ্ন করলেন হাইডিউকি। এটা তাঁর একটা কৌশল, লূপ নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন না।

'তাহলে বলো, তুমি কি মনে করো প্রাণের সূচনা ঘটেছে এমনি এমনি, নাকি প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বাঁধা প্রয়োজন থেকে? কোনদিকে তুমি?'

'এর একটা উত্তরই আছে আমার কাছে, "আমি জানি না।" '

এটুকুই বলতে পারে কাউরু। শুধু তার নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে বলে নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সবকিছু ঘটছে এরকম একটা আইডিয়াকে সমর্থন করতে পারে না সে। অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তার প্রমাণ না পাওয়ায়, পৃথিবীর বুকে প্রাণের উদ্ভব স্রেফ আন্দাজে নিক্ষিপ্ত একটা উপহার, গোটা বিশ্বের আর কোথাও কোনো নমুনা নেই–অনন্য।

'আমি জানতে চাইছি তুমি কি ভাবো।'

'কিন্তু বাবা, তুমিই না সব সময় বলো, আধুনিক বিজ্ঞান যেটা জানে না সেটাকে স্বীকৃতি দেয়াটা গুরুত্বপূর্ণ? "আমি জানি না" বলার প্রবণতা থাকতে হবে?'

প্রশ্ন শুনে একটু হাসলেন হাইডিউকি। তাঁর মুখের চেহারাই বলে দিচ্ছে অ্যালকোহল প্রভাব ফেলছে। খালির সংখ্যা এখন ছয়

BanglaBook.org

'আমাকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। যদি চাও এটাকে একটা খেলা হিসেবে গ্রহণ করো। আমরা একটা খেলার জগতে আছি। আমি জানতে চাই তোমার মন কী বলে, তার বেশি কিছু না।'

নুডলস তৈরি করতে কিচেনে ঢুকেছেন ম্যাচিকো । হাতের কাজ থামিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন, চোখে একটা আলোর ঝিলিক।

নিজের কথা ভাবছে কাউরু। মাথা ঘামাতে শুরু করলে, প্রাণের আবির্ভাব বা মহাবিশ্বের মতো বিষয়গুলো সে তার কল্পনা দিয়ে নাগাল পায় না। কাজেই কোনো একজনের আবির্ভাবকে উদাহরণ হিসেবে ধরাই ভালো, তারপর ওখান থেকে এগোনো যাবে

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার নিজের জীবন কীভাবে শুরু হলো? সেটা কখন? যখন মার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এল সে, সংযোজক নাড়ি কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলো দুজনকে? নাকি যখন ডিম আর বীর্যের মিলন ঘটল? গর্ভাশয়ের নিরাপদ দেয়ালে আশ্রয় পাবার পর?

শুরুর কথা বলতে চাইলে, সে ঠিক করল, তার প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত বীজরোপণ। বীর্যই এখানে বীজ। বীজরোপণের কমবেশি তিন সপ্তা পর তার নার্ভাস সিস্টেম আকৃতি পেয়েছে।

এবার, কাউরু ভাবছে, স্রেফ ধারণা করো যে ওই বয়সের একটা ভ্রূণের সচেতনতা আছে, আছে চিন্তা করার ক্ষমতা। ওই ভ্রূণের কাছে মার গর্ভ হবে তার গোটা বিশ্ব। *আমি এখানে কেন,* প্রশ্ন করছে ভ্রূণ। অ্যামনিওটিক ফ্লুয়িডে নিমজ্জিত অবস্থায় সে ভাবতে শুরু করবে গর্ভসঞ্চারের প্রক্রিয়াটি কী। কিন্তু গর্ভ ছাড়া বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে যেহেতু কোনো ধারণা নেই, সে এমনকি এ-ও কল্পনা করতে পারে না যে তার নিজের আবির্ভাব পুনর্জনন প্রক্রিয়ার একটা অংশ। গর্ভাশয়ের ভেতর যেটুকু নমুনা পায় তার ওপর ভিত্তি করে একটা কিছু অনুমান করতে পারে।

একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তা করার সিদ্ধান্ত নিল কাউরু। যদি ধরে নেয়া হয় এটার সঙ্গেই আসলে আমাদের অস্তিত্ব জড়িয়েছে, তাহলে এ-কথা বলা যৌক্তিক যে জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যা কিছু দরকার সবই এই বিশ্বে মজুদ আছে। সেক্ষেত্রে, প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে প্রকৃতির নিয়ম পালনের অপরিহার্যতা থেকে, ঠিক?

কিন্তু, না, গর্ভের কথা চিন্তা করো: ওটা হয়তো একটা ভ্রূণের জীবনকে টিকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু সাধারণত ওটা ভ্রূণশূন্যই থাকে। তাহলে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে এমনি এমনি, কাকতালীয়ভাবে, কোনো বিধি-বিধান ছাড়াই? বিশ্বে ধারাবাহিকতা ধরে রেখে প্রাণের অস্তিত্ব থাকে না–সত্যি কথা বলতে কি, প্রাণের

BanglaBook.org

উদ্ভব হয়নি এমন একটা বিশ্বই বরং আরও বেশি স্বাভাবিক হত।

শেষ পর্যন্ত কাউরু কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

কিন্তু ওখানে হাইডিউকি বসে রয়েছেন, ছোট ছোট চুমুক দিয়ে বিয়ার খাচ্ছেন, আশা করছেন তাঁর প্রশ্নের একটা উত্তর পাবেন।

'শেষ পর্যন্ত হয়তো আমরাই বিশ্বে একমাত্র প্রাণ,' বলল কাউরু।

'তোমার অন্তর এটাই বলে?'

ছেলের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন হাইডিউকি, তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। ম্যাচিকো টেবিলে ফেলা হাতকে বালিশ বানিয়ে শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন।

'ওহে, যাও তো, মাচির জন্যে একটা গরম চাদর নিয়ে এস।'

'যাচ্ছি,' বলে উঠল কাউরু, বেডরুম থেকে একট চাদর এনে বাবার হাতে দিল। হাইডিউকি যত্ন করে স্ত্রীর কাঁধে মেলে দিলেন সেটা, তাঁর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু, তারপর ছেলের দিকে ফিরলেন।

ওদের অজান্তেই আকাশের পুবদিক সাদা হতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে নেমে গেছে কামরার তাপমাত্রা। ফুতামি পরিবারের রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে, এতক্ষণে ওদের ঘুমের সময় শুরু হবে।

বিয়ারের শেষ গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন হাইডিউকি, তাঁর টকটকে লাল চোখ দুটো কোটরের ভেতরে ঢুকে গেছে।

বিয়ারটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কাউরু, তারপর বলল, 'ও, বাবা। তোমার একটু সাহায্য পেতে পারি?'

'কী সাহায্য?'

গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি চিহ্নিত মানচিত্রটা আবার বাবার সামনে রাখল কাউরু। 'এটা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?'

কড়ে আঙুল তাক করে মানচিত্রের নির্দিষ্ট একটা বিন্দু দেখাচ্ছে কাউরু, ফোর কর্নার নামে পরিচিত একটা মরু এলাকা, উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমদিকে–যেখানে আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো, উটাহ আর কলোরাডো মিলিত হয়েছে।

'কী দেখতে বলছ?' মুখটা ম্যাপের দিকে নামিয়ে আনলেন হাইডিউকি, চোখ মিটমিট করছেন।

'ভালো করে দেখো,' বলল কাউরু। 'এবার আরেকবার দেখো এই এলাকার গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির সংখ্যাগুলো।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে বারবার চোখ ঘষছেন হাইডিউকি, তিনি তাঁর ক্লান্ত চোখের সামনে সংখ্যাগুলোকে ভেসে বেড়াতে দেখছেন।

'হুমম।'

BanglaBook.org

'লক্ষ করছ, যতই এই পয়েন্টের কাছাকাছি আসছে, সমুন্নতি রেখাগুলোর মাঝখানের বিস্তৃতি ক্রমশ ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে।'

'এর মানে হলো, একটা চরম গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি

'আই সি। নেগেটিভ ভ্যালু এখানে খুব বড় দেখছি।'

'জিওলজিকাল দৃষ্টিতে দেখলে, আমি বলব ওখানে কিছু একটা আছে।'

'যেমন?' বাবার প্রশ্ন।

'যেন মনে হচ্ছে পৃথিবীর ওই জায়গার সারফেসের নীচে, চরম কম ভর নিয়ে কিছু একটা আছে।'

ভরটা এতই কম, যেন ওখানে কিছু নেই।

বলপয়েন্ট কলম দিয়ে একটা কাটা চিহ্ন আঁকল কাউরু, ঠিক যেখানে চারটে রাজ্য মিলিত হয়েছে। ঠিক ওই জায়গার জন্যে ওর কাছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সংখ্যা না থাকলেও, ওটাকে ঘিরে সমুন্নতি রেখাগুলো নিঃসন্দেহে একটা স্পট নির্দেশ করছে যেটার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুব কম।

কিছু সময় কাউরু আর হাইডিউকি ম্যাপটার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ম্যাচিকো মাথাটা সামান্য একটু তুলে, ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, 'আমি নিশ্চিত, সোনা, ওখানে কিছু নেই।'

বোঝা গেল পুরোটা সময় ওদের কথাবার্তা চুপচাপ শুনে গেছেন ম্যাচিকো, হাতে মাথা রেখে ঘুমোনোটা স্রেফ তাঁর ভান ছিল।

'আমি বুঝতে পারিনি তুমি জেগে আছ।'

মার কথার মধ্যে একটা খোঁচা আছে। মরুভূমির অনেক নীচে কল্পনার সাহায্যে একটা শূন্যতা দেখতে চেষ্টা করছে কাউরু। মাটি যদি বিশাল একটা গহ্বর লুকিয়ে রেখে থাকে, তাহলে চরম মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অসঙ্গতি খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

আর চুনাপাথরের সেই গভীর গহ্বরে বসবাস করছে সুপ্রাচীন কোনো এক জনগোষ্ঠী...কাউরু এখন খুব কাছ থেকে একটা এক্সট্রিম লো-গ্রেভিটি জোন দেখতে পাচ্ছে। কোনো সংশয় আছে কী?

কোথায় ফাঁক? কী সন্দেহ?

আগের চেয়েও প্রবল তাগিদ অনুভব করছে কাউরু, যেভাবেই হোক ওখানে ওকে পৌঁছুতে হবে।

হাই তুললেন ম্যাচিকো বিড়বিড় করে বললেন, 'তবে শুনতে সত্যি খুব আশ্চর্যই লাগছে বটে...ভাবছি, ওটা যদি কিছু নাই হবে, ওখানে তাহলে জিনিসটা আছে কীভাবে?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি।

BanglaBook.org

'দেখছ, মা, জায়গাটা সম্পর্কে তুমিও আগ্রহী হয়ে উঠছ। যদি কম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর দীর্ঘজীবন কোনোভাবে সংযুক্ত হয়, তাহলে ওখানে হয়তো প্রাচীন মানুষদের একটা শহর আছে, সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন। কী মনে হয়, বলো। এটা অন্তত সম্ভব, ঠিক?'

উত্তর আমেরিকার লোককাহিনি, বিশেষ করে নেটিভ আমেরিকান মিথের ওপর মার আগ্রহের কথা মনে রেখে কাউরু আসলে অনুকূল সাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে। ওর হিসেব হলো, নিজে কিছু না বলে মাকে দিয়ে বলাতে পারলে তার স্বপ্নটা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়বে। বাবাকে রাজি করানোর ক্ষমতা ওর চেয়ে মার অনেক বেশি।

যেমনটি কাউরু আশা করেছে, হঠাৎ করে ম্যাচিকো র আগ্রহ বেড়ে গেল। 'আচ্ছা, জায়গাটা ন্যাভাহো রিজার্ভেশনের কাছে না?'

'দেখছ?'

কাউরু জানে–মা ওকে বলেছে–এমন আদিবাসী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে যারা অতি দুর্গম মরুভূমি আর শুকনো নদী-নালাতে ঘর-বাড়ি তৈরি করে, এবং তাদের জীবনযাপন প্রাচীন মানুষের জীবনযাপনের চেয়ে খুব একটা আলাদা নয়। কাউরু তাদের দীর্ঘায়ু সম্পর্কে কিছু শোনেনি বটে, তবে সে জানে একটু কৌশল করলে মার আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব।

'এই, কচি, তুমি আসলে ঠিক কি বলতে চাইছ শুনি?'

কাউরুর মনের কথা হাইডিউকি ঠিকই ধরে ফেলেছেন।

মার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল কাউরু।

'ওখানে গিয়ে একবার দেখে আসলে হয়,' বললেন ম্যাচিকো ।

যেন তাঁর নিজের তেমন আগ্রহ নেই, কাউরুর পক্ষ নিতে হওয়াতেই কথাটা বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, চলো, যাওয়া যাক তাহলে,' আশায় আশায় বলল কাউরু।

'ফোর কর্নার, কেমন? দেখলে, একেই বলে কোইন্সিডেন্স।'

'মানে?' বাবার দিকে তাকাল কাউরু

'না, মানে, কিছুদিন পর–হয়তো আগামী গ্রীষ্মে, কিংবা পরের গ্রীষ্মে–আমার কাজই ওখানে আমাকে নিয়ে যাবে বলে ধারণা করছি।'

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল কাউরু। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। নিউ মেক্সিকোর কিছু ল্যাবে কাজ করতে হবে আমাকে, লস অ্যালামস আর সান্তা ফে-তে।'

কাউরু ওর তালু দুটো পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে ঘষছে, যেন প্রার্থনা করছে। 'আমাকেও সঙ্গে নেবে তুমি! প্লিজ!'

BanglaBook.org

'তুমিও যেতে চাও নাকি, মাচি?'

'চাই না আবার!'

'তাহলে সে কথাই রইল, আমরা সবাই যাব।'

'এটা তোমার একটা প্রতিশ্রুতি, ঠিক আছে?' বাবার দিকে একটা কাগজ আর কলম বাড়িয়ে ধরল কাউরু। 'যাতে ভুলে না যাও। কথা দিয়েছি সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাব, এটা লিখে সই করো।'

লিখিত চুক্তি থাকলে পরে হাইডিউকি ভুলে যাওয়ার ভান করে বলতে পারবেন না যে এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি। এটা ছোট একটা বিমা। অভিজ্ঞতা থেকে জানে কাউরু, লিখিত না থাকলে বাবাকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি পালন করানো খুব কঠিন।

আঁকাবাঁকা হরফে কথাটা লিখে সই করলেন হাইডিউকি। কাগজটা কাউরুর মুখের সামনে নেড়ে বললেন, 'এই যে, দেখছ? কথা দিলাম।'

কাগজটা নিয়ে পরীক্ষা করল কাউরু। সন্তুষ্ট বোধ করছে। এখন মন ভরা আনন্দ নিয়ে ঘুমোতে যেতে পারবে সে।

সকাল হচ্ছে, সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরও কাউরু লক্ষ করেছে আকাশে উঠে আসার সময় মধ্যগ্রীষ্মের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখায় সূর্যকে।

এই মুহূর্তে পশ্চিম আকাশে এখনও দু'একটা তারা মিটমিট করছে, দেখা যায় কি যায় না, যে-কোনো মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে। আলো আর অন্ধকারকে আলাদা করে কোনো রেখা টানা নেই, কাউরু বলতে পারছে না ঠিক কোথায় রাত শেষ হয়ে গিয়ে সকাল শুরু হলো। সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে এই মুহূর্তটিকে ভালোবাসে, সময়ের প্রবাহ যখন নিজের এই রঙ বদল করে।

মা-বাবা বেডরুমে চলে যাওয়ার পরও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউরু। গোটা বাড়ি নীরব হয়ে গেছে।

নীচে ঘুম ভাঙছে শহরের। ওর চোখের সামনে টোকিও বে-র ওপর একঝাঁক পাখি চক্কর মেরে উড়ছে। ওগুলোর ডাকাডাকি সদ্যপ্রসূত শিশুর কান্নার মতো লাগল ওর কানে, নিভু নিভু নক্ষত্রের নীচে নিজেদের শক্তি আর সাহসের পরিচয় দিচ্ছে।

এরকম সময়ে, সাগরের কালো চেহারা আর বদলাতে থাকা আকাশের রঙের দিকে তাকিয়ে, দুনিয়াটা কীভাবে চলে তা বোঝার আকাঙ্ক্ষা আরও শুধু বাড়তেই তাকে কাউরুর এত ওপর থেকে দৃশ্যগুলো দেখার কারণে প্ররোচিত কল্পনাশক্তি চারদিকে ডানা মেলে।

সূর্য এখন পুব দিগন্তে উঠে আসছে, রাতকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। বেডরুমে

BanglaBook.org

ফিরে নিজের তোশকের ওপর শুয়ে পড়ল কাউরু।

ওর মা-বাবা যে যার আলাদা বিছানায় ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়ছেন। হাইডিউকি একদিকে কাত হয়ে শুয়ে আছেন, হাত আর পা ভাঁজ করা, গায়ে চাদর নেই; ম্যাচিকো গরম চাদরটা আঁকড়ে ধরে বড় একটা ফুটবলের আকৃতি নিয়েছেন।

ওদের পাশে শুলো কাউরু, জড়িয়ে ধরল কোলবালিশ, মুঠোয় ধরে আছে মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়ার চুক্তিপত্র। খানিক পর ওর শোয়ার ভঙ্গিটা ঠিক ভ্রূণের মতো দেখতে হলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্যানসার ওয়ার্ড

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এক

বয়স মাত্র কুড়ি হলেও, ইদানিং কাউরুর বয়স আরও বেশি মনে হয়। তার কাঠামো চোখে পড়ার মতো লম্বা-চওড়া, তবে সে কারণে যে তার মুখের বয়স বেশি দেখায়, ব্যাপারটা সেরকম নয়। যৌবনপ্রাপ্ত কাউরু উল্লাস অনুভব করে। যাদের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়, তাদের মধ্যে অনেকেই মন্তব্য করে, বয়সের তুলনায় বেশি পরিণত দেখায় ওকে।

এটাকে স্বাভাবিক বলে মনে করে কাউরু, কারণ বিবেচনায় রাখতে হয় তেরো বছর বয়সে বাধ্য হয়ে পারিবারিক শক্তির স্তম্ভ হতে হয়েছে ওকে। দশ বছর আগে, প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সময়, ও ছিল হাড্ডিসার আর খাটো, আসল বয়সের চেয়ে ছোট দেখাত। মোটামুটি সবজান্তা বলে ধরে নেয়া হত ওকে, যেহেতু বাপের কাছ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর মার কাছ থেকে ভাষার ওপর শিক্ষা পেয়েছে।

তুচ্ছ সাধারণ সব কাজে সময় না দিয়ে ওর প্রধান লক্ষ্য ছিল লাগাম ছিঁড়ে কল্পনাকে যেখানে খুশি যেতে পারার সুযোগ করে দেয়া, যাতে বিশ্বের আকার-প্রকৃতি আর কাজকর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পায় সে।

দশ বছর আগে–এখন সেটাকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা জগৎ বলে মনে হয়। তখন কমপিউটারের সঙ্গে খেলত, রাত জেগে মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করত, ওদের সামনে রাস্তাটা ছিল পরিষ্কার, সেখানে এতটুকু কালো ছায়া ছিল না।

ওর মনে আছে ম্যাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর দীর্ঘায়ু নিয়ে কীভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল, তারপর কীভাবে পুরো পরিবার নিয়ে উত্তর আমেরিকার ফোর কর্নার নামে মরুভূমিতে বেড়ানোর একটা প্ল্যান করা হয়। এ-ব্যাপারে বাবাকে দিয়ে সে এমনকি একটা চুক্তিপত্রে সইও করিয়ে নিয়েছিল।

চুক্তিপত্রের সেই কাগজটা এখনও নিজের ডেস্কের দেরাজে রেখে দিয়েছে কাউরু। না, ওখানে আর বেড়াতে যাওয়া হয়নি। হাইডিভিকি এখনও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু মেডিকেলের ছাত্র হিসেবে কাউরুর চেয়ে ভালো কেউ জানে না সেটা কতটুকু অসম্ভব।

কাউরুর এতটা দক্ষতা নেই যে বুঝতে পারবে ওর বাবার শরীরে মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস কেন বা কোন পথে ঢুকেছে। সন্দেহ নেই ওই ভাইরাস তাঁর শরীরের একটা বডি সেলকে ক্যানসারে পরিণত করার বেশ

BanglaBook.org

কয়েক বছর পর পেটের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ জানাতে শুরু করেন হাইডিউকি।

তারপর ওই সদ্যোজাত ক্যানসার সেল তার প্রথম কোষীয় বিভাজন শুরু করে, মরুভূমিতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার খুব একটা পরে নয়। ওই ক্যানসার সেলগুলো নীরবে, একটা নির্দিষ্ট গতিতে, নিজেদের কপি করতে থাকে। এভাবে একসময় ওদের পারিবারিক ভ্রমণ অপূরণীয় একটা স্বপ্নে পরিণত হয়।

নিউ মেক্সিকোর ল্যাবে কাজ করতে যাওয়ার হাইডিউকির প্ল্যানটা এমনিতেই পিছিয়ে গিয়েছিল। ছেলেকে প্রতিশ্রুতি দেয়ার তিন বছর পর কাজের তালিকায় ওই ট্যুরকে ঢোকাতে পারেন তিনি।

সান্তা ফে আর লস অ্যালামাস রিসার্চ সেন্টারে তিনমাস থাকার ব্যবস্থা করলেন হাইডিউকি। সিদ্ধান্ত নিলেন শেডিউলের দু'সপ্তা আগে নিউ মেক্সিকোর উদ্দেশে প্লেনে চড়বেন, কাউরু আর ম্যাচিকোকে নিয়ে যাতে জায়গাটা দেখতে যেতে পারেন, কাউরুর মানচিত্রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেখানে অসম্ভব কম বলা হয়েছে।

তারপর, গ্রীষ্মের শুরুর দিকে, আর দু'মাস পর ওরা বেড়াতে বেরোবে, ইতিমধ্যে প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, এবার যাওয়া হবে ভেবে সবাই যখন খুব রোমাঞ্চিত, হঠাৎ করে হাইডিউকি জানালেন তাঁর পেটে ব্যথা হচ্ছে।

'তুমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ না কেন?' বারবার তাগাদা দিলেন ম্যাচিকো, কিন্তু স্ত্রীর কথা কানে তুললেন না হাইডিউকি। তিনি বলতে চাইলেন, সাধারণ একটা গ্যাস্ট্রাইটিস সমস্যা নিয়ে এত অস্থির হওয়া চলে না। তিনি তাঁর জীবনযাপনের ধারা বজায় রাখলেন।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ব্যথাটা তত বাড়ছে। তারপর, ওদের রওনা হবার তিন সপ্তা আগে, হাইডিউকি বমি করলেন। তারপরও বলতে লাগলেন, গুরুতর কিছু হয়নি তাঁর। ডাক্তার দেখাবেন না, কোনো রকম টেস্ট করতে রাজি নন, বাতিল করবেন না বেড়ানোর প্ল্যানটাও –সবাই যেহেতু এটা নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত ছিল।

তবে, একসময় লক্ষণগুলো অসহনীয় হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত ভার্সিটির হাসপাতালে গিয়ে একজন ডাক্তার দেখাতে রাজি হলেন হাইডিউকি। ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁর বন্ধু মানুষ। স্বভাবতই এটা-সেটা টেস্ট করতে দিলেন তিনি। টেস্টে ধরা পড়ল তার পাইলরাস-এ পলিপ হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করা হলো তাঁকে।

স্বভাবতই ট্যুরটা বাতিল হয়ে গেছে; না কাউরু না ম্যাচিকো দুজনের কারুরই বেড়াতে যাওয়ার মন নেই আর।

তারপর একদিন পরিচিত ডাক্তার ওদেরকে ডেকে পাঠিয়ে খবর দিলেন, হাইডিউকির ওই পলিপ ম্যালিগন্যান্ট।

কাজেই কাউরুর তেরোতম জন্মদিন স্বর্গের বদলে পরিণত হলো নরকে: বেড়াতে যাওয়া তো শিকেয় উঠলই, ওকে আর মাকে গরমে ঘামতে ঘামতে বার বার হাসপাতালে ছুটতে হলো।

BanglaBook.org

চিন্তা করো না, আগামী বছর সুস্থ হয়ে উঠব, তারপর তোমাদের নিয়ে মরুভূমিতে যাব, যেমন কথা দিয়েছি–একটু শুধু ধৈর্য ধরো,' হাসতে হাসতে ধোঁকা দিলেন কাউরুর বাবা।

তবে ওদের একটা স্বস্তি হলো হাইডিউকির ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

ম্যাচিকো স্বামীর কথায় বিশ্বাস রাখেন, আবার, একই সঙ্গে, নিজেকে যখনই চিন্তা করার অনুমতি দেন সম্ভাব্য আর কি ঘটতে পারে, অমনি তার মন ভেঙে যায়।

দিনে দিনে তাঁর শরীর ও মন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

আর সেজন্যেই বয়সে এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও নিজ পরিবারে বড় একটা ভূমিকা নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিল কাউরুর। কিচেনে কাউরু ছাড়া কে পাহারায় থাকবে মা তাঁর প্রয়োজন মতো খাবার খাচ্ছেন কিনা দেখার জন্যে? প্রায় বিদ্যুৎগতিতে যথেষ্ট ডাক্তারি জ্ঞান হজম করল কাউরু, যাতে সে তার মার মাথায় ইতিবাচক একটা ভবিষ্যতের চিন্তা-ভাবনা রোপণ করতে পারে।

হাইডিউকির অপারেশন করা হলো।

পেটের তিনভাগের দু'ভাগই কেটে বাদ দিলেন সার্জেনরা। ডাক্তাররা বললেন, তাঁরা সফল। ক্যান্সার এখন শরীরের অন্য কোনো জায়গায় না ছড়ালেই হয়, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন তাঁদের রোগী, আবার ল্যাবে বসে নিজের কাজে ডুবে যেতেও কেউ তাঁকে মানা করবে না।

এই সময় থেকেই কাউরুর প্রতি হাইডিউকির আচরণে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। একদিকে, তিনি যখন হাসপাতালে আছেন, ছেলে দৃঢ় একটা ভূমিকা নিয়ে সবাইকে তার ওপর নির্ভর করতে বলল–মুখে নয়, আচরণের মাধ্যমে; আরেকদিকে, এটা লক্ষ করেই কিনা কে জানে, ছেলেকে আরও দৃঢ় ও কঠিন হওয়ার শিক্ষা দিতে চাইলেন হাইডিউকি, কাউরু যাতে শক্তিশালী একজন মানুষ হতে পারে।

কাউরুকে কচি বলা বন্ধ করলেন হাইডিউকি। উৎসাহ দিলেন কাউরু যাতে কমপিউটারে কম সময় দেয় আর বেশি সময় দেয় শরীরচর্চায়। ছেলেকে তিনি বোঝালেন, প্রথমে তাগড়া ঘোড়া হও।

কাউরু না বলল না। বাবার ইচ্ছে মেনে নিয়ে সবই করছে সে। তার দৃষ্টি এড়ায়নি, বাবার মধ্যে কী একটা বিষয়ে যেন মরিয়া ভাব চলে এসেছে, তিনি যেন তাঁর শরীর থেকে কিছু একটা ওর শরীরে স্থানান্তর করতে চাইছেন, ওটা বিলীন হয়ে যাওয়ার আগেই।

কাউরু জানে বাবা ওকে ভালোবাসেন, অনুভব করে সে বিশেষ একজন, যেন উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি পেয়েছে, সে তার শিরায় শিরায় গর্ব অনুভব করে।

দু'বছর কোনো ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল। কাউরু পনের বছরে পা দিতে

BanglaBook.org

যাচ্ছে। তবে ওর বাবার শরীরের ভেতর পরিস্থিতি একই রকম থাকছে না। তার আভাস পাওয়া গেল পায়খানার সঙ্গে রক্ত বেরোতে শুরু করায়।

ওটা ছিল লাল আলো, ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার সংকেত। এবার আর কোনো রকম ইতস্তত নয়, ডাক্তারের কাছে গেলেন হাইডিউকি। ডাক্তার বেরিয়াম এনেমা দিলেন তাঁকে, এক্স-রে করলেন তাঁর।

এক্স-রেতে একটা ছায়া দেখা গেল সিগময়েড কোলনে, আকারে একটা মুঠোর অর্ধেক। ডাক্তারদের কোনো সন্দেহ থাকল না যে সম্ভাব্য করণীয় একটাই, অপারেশন করে ওটাকে কেটে ফেলে দিতে হবে।

তবে সার্জারি নিয়ে দু'রকম কথা বলা হলো। একটা, পায়ু রেখে অপারেশন করা; দ্বিতীয়টা, আরও বেশি টিস্যু সরিয়ে ফেলাই উচিত; সেক্ষেত্রে কৃত্রিম একটা পায়ু বসানোর দরকার হবে।

প্রথমটায় ভয় হলো, হামলাকারী কিছু ক্যানসার সেল রেখে আসতে পারেন সার্জেনরা, তাতে রোগটা আবার দেখা দেয়ার আশঙ্কা থাকবে। দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করলে পুরো সিগময়েড কোলন ফেলে দিতে হবে, তাতে আরও বেশি সার্জারির প্রয়োজন হবে।

ডাক্তাররা নিজেদের মত দিয়ে বললেন, তাঁরা কৃত্রিম পায়ুর পক্ষে, তবে শারীরিক যে-সব অসুবিধে দেখা দেবে, এবং জীবনযাপনের ধারায় যে পরিবর্তন আসবে সে-সব কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তাঁরা রোগীর ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন।

কৃত্রিম পায়ুর পক্ষে মত দেয়ার সময় হাইডিউকি সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিক থাকলেন, তাঁর চোখের পাতা একটু কাঁপল না পর্যন্ত।

আপনারা যদি আমাকে কাটেন, এবং পুরোপুরি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে না পারেন যে ক্যানসার অতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে কিনা, তাহলে আমি চাই আপনারা বিনা দ্বিধায় সবটুকু কেটে ফেলবেন।

কথাগুলো নিজে থেকেই বললেন হাইডিউকি। বেঁচে থাকার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখার জন্যে যে-কোনো বাজি খেলতে রাজি তিনি, বেঁচে থাকার জন্যে জীবনের বহুকিছু হারাতে তাঁর আপত্তি নেই।

সার্জারির জন্যে সেই গ্রীষ্মে আবার হাইডিউকিকে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। অপারেশন শুরু হওয়ার পর ডাক্তাররা দেখলেন তাঁরা যতটা ভয় পেয়েছিলেন তাঁর ক্যানসার ততদূর হামলা চালায়নি।

এরকম পরিস্থিতিতে, সাধারণত, পায়ু অক্ষত রেখে অপারেশন করলে সফলতার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্জেন সিদ্ধান্ত নিলেন, রোগীর ব্যক্ত ইচ্ছের কথা মনে রেখে, গোটা সিগময়েড কোলন ফেলে দেবেন তাঁরা।

হেমন্তে আবার চেক করার জন্যে হাসপাতালে যেতে হলো হাইডিউকিকে।

BanglaBook.org

একটা কোলসটমির সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে সংগ্রাম করতে করতেই পরবর্তী দু'বছর কাটল তাঁর, সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকলেন আবার না লক্ষণগুলো ফিরে আসে।

ঠিক দু'বছর পর আরেকটা লক্ষণ দেখা দিল। এটা লাল নয়, হলুদ আলো। হাইডিউকির জ্বর জ্বর লাগছে, গায়ের ত্বকে হলদেটে ভাব, দুটোই দিনে দিনে বাড়তির দিকে। বাড়ির সবার মন খারাপ।

ডাক্তাররা তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলেন, ক্যানসার এবার হাইডিউকির লিভারে হামলা চালিয়েছে।

মাথা নিচু করে বসে থাকলেন তাঁরা। প্রথম দুটো অপারেশনের পর তাঁদের বিশ্বাস ছিল, তাঁরা যা করেছেন তারপর আর হাইডিউকির ক্যানসার লিভার কিংবা লিম্ফ নোড পর্যন্ত ছড়াবে না।

এই সময়ের দিকেই কাউরুর প্রথম সন্দেহ হয় যে তারা আসলে অজানা প্রকৃতির একটা রোগের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছে, যেটা সত্যি সত্যি একধরনের ক্যানসারই, তবে এর আগে পর্যন্ত যে-সব ক্যানসারের কথা মানুষ জানত সেগুলোর চেয়ে আলাদা।

বেসিক মেডিসিন সম্পর্কে ওর আগ্রহ আরও গভীর হলো। সতের বছর চলছে ওর, তখন গ্রীষ্ম, একবছর আগে হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে, একটা ভার্সিটির প্রি-মেড প্রোগ্রামে ভর্তি হলো, যে ভার্সিটিতে ওর বাবাও এই একই কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন।

তৃতীয়বার অপারেটিং টেবিলে শুয়ে হাইডিউকি তাঁর অর্ধেক লিভার হারালেন। পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও, কাউরু বা ওর মা ম্যাচিকো দুজনের কেউই বিশ্বাস করলেন না ক্যানসারের সঙ্গে ওদের যুদ্ধটা থেমে গেছে।

সন্দেহ আর উদ্বেগ নিয়ে, প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শত্রুর ওপর নজর রাখছে ফুতামি পরিবার, ভাবছে না জানি আবার কোথায় হামলা চালায় ক্যানসার। শান্তিময়, আনন্দমুখর ঘরোয়া জীবনে ফেরাটা আসলে কেউই আশা করেনি।

ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ তুলে না নেয়া পর্যন্ত থামবে না ওই ক্যানসার, এই ধারণা থেকে একচুল নড়তে রাজি নন ম্যাচিকো। কাউরুর চিকিৎসা জ্ঞান সম্পর্কেও তিনি কিছু শুনতে রাজি নন।

নতুন একটা ভ্যাকসিন সম্পর্কে যদি কিছু শোনেন ম্যাচিকো, পড়িমরি করে ছুটে যাচ্ছেন সেখানে, চূড়ান্তভাবে পরীক্ষিত হওয়ার আগেই সেটা হাতে পেতে চাইবেন। যখন শুনলেন ভিটামিন থেরাপিতে কাজ হয়, চেষ্টা করে দেখলেন ওটা। ডাক্তারদের ধরে বসলেন, লিফোসাইট ট্রিটমেন্ট চালিয়ে দেখুন। এমনকি বিশেষ একটা ধর্মীয় বিশ্বাসের কাছে ধরনা দিতেও দ্বিধা করলেন না, সেই ধর্মের গুরুরা

BanglaBook.org

যাতে জাদুবিদ্যার সাহায্যে হাইডিউকির ক্যানসার ভালো করে দেন।

সবকিছু করতে রাজি ম্যাচিকো । বললে শয়তানের কাছে নিজের আত্মা পর্যন্ত বেঁচে দেন, বিনিময়ে যদি আবার সুস্থ করে তুলতে পারেন স্বামীকে। ভূতে পাওয়া একজন মানুষের মতো মাকে চারদিকে ছুটোছুটি করতে দেখে মন খারাপ হয় কাউরুর। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে ওর বাবার মৃত্যুর আরও একটা অর্থ মা পাগল হয়ে যাবেন।

এরপর হাইডিউকি তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছেন হাসপাতালের বিছানায় বয়স এখন মাত্র উনপঞ্চাশ, কিন্তু দেখে মনে হয় আশি বছরের বৃদ্ধ। ক্যান্সারবিরোধী ওষুধের কারণে মাথার সব চুল পড়ে গেছে। হাড্ডিসার একটা কাঠামো, শরীরে মাংস আছে কিনা বোঝা যায় না। লাবণ্য হারিয়ে ত্বক শুকিয়ে গেছে। সারাক্ষণ সারা শরীরে আঙুল চালিয়ে উহ্ বড্ড চুলকাচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন।

কিন্তু এতকিছুর পরও, জীবনের সঙ্গে নিজের সংযোগটা তিনি হারাননি। স্ত্রী ও সন্তান বিছানার পাশে এসে যখন বসে, ওদের হাত ধরে বলেন, 'আমার কথা শোনো তোমরা, আগামী বছর উত্তর আমেরিকার ওই মরুতে অবশ্যই আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।' কথাটা বলে জোর করে একটু হাসবেন।

ব্যাপারটা ঠিক মিথ্যে আশ্বাস নয়–বোঝাই যায় এই অসুস্থতার বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তিতে লড়তে চান তিনি, লড়ে জিততে চান, যাতে স্ত্রী-সন্তানকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন। দৃশ্যটা একদিকে যেমন খানিকটা আশ্বস্ত করে, আবার অত্যন্ত বেদনাদায়কও বটে।

জীবনের প্রতি বাবা যতদিন এরকম ইতিবাচক একটা দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখতে পারছেন, কাউরুও নিজেকে হাল ছাড়ার অনুমতি দিচ্ছে না। ক্যানসার যতই খারাপ দিকে মোড় নিক, কাউরুর বিশ্বাস ওর বাবা শেষ পর্যন্ত এই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠবেন।

এরকম সময়ে হাইডিউকির মতো ওই একই রকম লক্ষণ আর ধারা নিয়ে নতুন ধরনের একটা ক্যানসারকে সনাক্ত করা সম্ভব হলো, প্রথমে জাপানে, তারপর সারা দুনিয়ায়। প্রথমে নতুন এই ধরনটার সত্যিকার কারণ আবিষ্কার করা গেল না, সেটা যেন একটা আবরণে মুড়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অল্প কিছু পেশাদার চিকিৎসক একটা আইডিয়াকে সমর্থন করলেন–এটা নতুন জাতের ভাইরাস, যেটা সেলগুলোকে ক্যানসারে আক্রান্ত করছে।

কিন্তু তাঁরা এটা ব্যাখ্যা করতে পারলেন না যে এই ক্যানসার ভাইরাসটা অন্যান্য ভাইরাসের চেয়ে কীভাবে আলাদা; আর তাছাড়া, এরকম ভাইরাস সফলতার সঙ্গে আলাদা করা সম্ভব হওয়ার কোনো রিপোর্টও কোথাও নেই। যাই হোক, ধোঁয়াটে হলেও, আইডিয়া বা সন্দেহটা ছড়াল।

BanglaBook.org

নতুন একটা রোগ কোথাও দেখা দিলে সেটার জন্যে দায়ী ভাইরাসকে চিহ্নিত করতে কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে। হাইডিউকিসহ আরও লাখ লাখ মানুষকে যে ক্যানসার আক্রমণ করছে সেটার বেলায় এটা বিশেষভাবে সত্য, কারণ এটা দেখতে অন্যান্য ক্যানসারের মতোই, কেউ বুঝতেই পারে না যে তাঁরা নতুন একটা রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন। তবে ক্রমশ দুনিয়াকে এই ভয় গ্রাস করল যে ভয়ানক প্রকৃতির একটা নতুন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে।

অবশেষে, এক বছর হলো, নতুন এই ক্যানসার ভাইরাস সাফল্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হলো ফুকুজাওয়া ইউনিভার্সিটি স্কুলের ল্যাবরেটরিতে। সেই সঙ্গে তাঁরা প্রমাণ করলেন, এই নতুন ভাইরাসই মেট্যাসটাটিক ক্যানসারের জন্যে দায়ী।

নতুন এই ভাইরাসের নাম দেয়া হয়েছে মেট্যাসটাসিস হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস। আর এর লক্ষণগুলো এরকম:

প্রথমত, একটা আরএনএ [RNA] রেট্রোভাইরাস স্বাভাবিক সেলকে ক্যানসার সেলে পরিণত করে। এভাবে, যে-কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে, সে কারসোন্যাজেনের [ক্যানসারের কারণ হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে এমন একটা পদার্থ] সংস্পর্শে আসুক বা না আসুক।

অবশ্য ব্যক্তিবিশেষ রেহাই পাওয়ার ঘটনাও ঘটছে: সুনির্দিষ্ট এরকম কিছু কেস পাওয়া গেছে, যদিও সংখ্যায় খুব অল্প, তারাও সংক্রমিত, তবে শুধু বাহক হিসেবে, তাদের নিজেদের কখনও ক্যানসার হয়নি।

সংক্রমণ ঘটার পর ক্যানসার হয়েছে কিনা, ডাক্তারদের পরীক্ষায় ধরা পড়ার মতো বড় হতে গড়ে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগে। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সময়ের এই ব্যবধান অনেক কমবেশিও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই ভাইরাস বাতাসে ছড়ায় না; ছড়ায় যৌনমিলন, রক্ত দেয়া-নেয়া, স্তনদানের মতো শারীরিক সংস্পর্শে। অর্থাৎ, এটাকে ঠিক সাংঘাতিক সংক্রামক বলা যাবে না তবে গবেষকদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে তাঁরা জোর গলায় বলবেন ভবিষ্যতে একসময় এই ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়াবে না ওটার রূপান্তরিত হওয়ার গতি অত্যন্ত ভীতিকর।

ছড়ানোর ধরনে মিল আছে দেখে কিছু পণ্ডিত সন্দেহ করছেন নতুন এই ভাইরাস রূপান্তরিত এইডস ভাইরাসের ফলাফল হতে পারে। হয়তো এইডস ভাইরাস উপলব্ধি করতে পেরেছে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাই একটা ক্যানসার ভাইরাসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে দক্ষতার সঙ্গে নিজের চেহারা বদলে নিয়েছে তারা।

সত্যি হলো, দুটো ভাইরাসের মধ্যে বিচ্ছিরি একটা মিল আছে, শুধু দ্রুতবেগে

BanglaBook.org

ছড়ানোর ক্ষেত্রেই নয়, মানবদেহের কোষে যেভাবে বাসা বাঁধে তার সঙ্গেও।

তৃতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই ক্যানসারটা যখন শুরু হয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই, দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ভীতিকর শক্তি নিয়ে। সেজন্যেই এটার নাম দেয়া হয়েছে মেট্যাসটেসিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস।

সদয় টিউমার আছে, আছে চরম ক্ষতিকর টিউমার। কারও একটা টিউমার হলো, তারপরও তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যদি সেটা চারপাশের এলাকা দখল না করে, রক্ত কিংবা লিমফ্যাটিক ভেসেলে না ঢোকে, কিংবা লাফ দিয়ে শরীরের অন্য কোথাও গিয়ে আরও আস্তানা না গাড়ে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যে ক্যানসার সেল তৈরি হলো সেগুলো অমর, মেজবান মারা না গেলে অনন্তকাল বাঁচবে।

মানুষের স্বাভাবিক কোষ অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত মোট কতবার বিভক্ত হতে পারবে তার একটা সীমা আছে–ঠিক মানুষের মতোই, জন্ম সূত্রে তারা জীবনের দীর্ঘতম একটা মেয়াদ পেয়ে থাকে।

যেমন, কোনো ব্যক্তি যতদিনে পরিণত বয়স্ক হয়, তার স্নায়ু কোষ ততদিনে নিজেদের কপি তৈরি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কাজেই বলা যায় স্নায়ু কোষের আয়ু মানুষের আয়ুর মতোই।

এভাবে, মানুষের আয়ু কত হবে না হবে সে প্রশ্নের সঙ্গে কোষের বয়স বাড়া আর মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক আছে কিন্তু এই ক্যানসার সেলগুলো, যে মেজবানকে শিকার বানিয়েছে তারা, সে মারা গেলে যে তারাও মারা যাবে, তা কিন্তু নয়।

মেজবানের শরীর থেকে সরিয়ে এনে পরীক্ষা করে দেখা গেল, কালচার ফ্লুয়িডেও ওগুলো দিব্যি বেঁচে আছে, অবিরত নিজেদের হুবহু প্রতিমূর্তি তৈরি করে চলেছে–মরার কোনো লক্ষণ নেই।

ধর্মীয় কিছু পণ্ডিত আছেন, বেঁচে থাকার এই বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ টেনে বলছেন, *এই ক্যানসার কোষগুলোর শক্তিকে যদি লাগাম পরানো যায়, তারপর কোনোভাবে বদলে স্বাভাবিক কোষে পরিণত করা সম্ভব হয়, মানুষ তাহলে অমরত্ব অর্জন করবে–কেউ কখনও বুড়ো হবে না।*

এ-সব নেহাতই অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা এটা অসম্ভব হলেও সত্য, যে কোষ অমরত্ব অর্জন করবে সে তার মানুষ মেজবানকে মেরে ফেলবে, এ-কথা জেনেও যে তাতে তারা নিজেরাও মারা যাবে।

BanglaBook.org

দুই

তখন বর্ষাকাল, কাউরুর সামনে জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা. এখন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে ওর প্রতিটি দিন। বাবাকে দেখতে যাওয়া আর পার্ট-টাইম চাকরি করতে এত সময় বেরিয়ে যাচ্ছে যে মার মানসিক দিকটা দেখার খুব কমই সুযোগ পায় সে–যেখানে পড়াশোনাই ঠিকমতো করতে পারছে না।

ক্যানসারের বিরুদ্ধে কাজ করে এরকম একটা কিছুর কথা শুধু শুনলে হয়, স্বাধীনতা থাকলে সেটা যেভাবে হোক হাতে পেতে চাইবেন ওর মা। কাজেই তাঁর এই পাগলামি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সেদিকেও একটা চোখ রাখতে হচ্ছে কাউরুকে।

ছেলে পার্ট-টাইম চাকরি করে এত বেশি শক্তি ক্ষয় করছে দেখে সন্তুষ্ট নন হাইডিউকি। তাঁর কথা হলো, পুরোটা সময় লেখাপড়াতেই ব্যয় করা উচিত ওর, চাকরি করাটা নেহাতই সময়ের অপচয়।

কাজটা কাউরুকে তাঁর অসুস্থতার কারণে করতে হচ্ছে, এটা আরও অশান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তাঁকে। তাই জেদের সুরে ওদেরকে জানিয়ে দেন, কাউরুর লেখাপড়ার খরচ বহন করার সামর্থ্য তিনি রাখেন, তাঁর সঞ্চয়ের হিসেবে অনেক টাকা পড়ে আছে।

কথার বহর দিয়ে যদি বিচার করতে হয়, মনে হবে এখনও তিনি আগের মতোই সুস্থ আর স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ। তবে তাঁর এই ইতিবাচক কথাবার্তা কাউরুর জন্যে সঞ্জীবনী সুধার মতো কাজ করে, শক্তি যোগায় সাহসে বুক বাঁধতে।

হাইডিউকি জানেন না পরিবারের পুরো আর্থিক ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে কাউরু। ও জানে, খরচা করার মতো বেশি টাকা আর নেই ওদের হাতে। চাকরিটা ওকে ধরে রাখতে হবে।

তবে এই টানাটানির জন্যে অবশ্যই সে তার বাবাকে দায়ী করে না। ওরা আর্থিক সংকটে আছে, বাবাকে এটা জানিয়ে কোনো লাভ নেই। তাই বাবাকে মিথ্যেকথা বলে কাউরু, বলে, আরও কিছু হাতখরচার টাকা দরকার বলে পার্ট-টাইম কাজটা করছে সে।

যখন একসঙ্গে থাকে, যতটা পারা যায় বাবার মন শান্ত রাখতে চেষ্টা করে কাউরু। এটা তো আর চেপে রাখার মতো কোনো বিষয় নয় যে হাইডিউকির অসুস্থতার জন্যেই ওদের পারিবারিক আয় কমে গেছে, খুব কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাতে হচ্ছে মা আর ছেলেকে।

ভাগ্য ভালো যে মেডিকেলের ছাত্র হওয়ায় প্রাইভেট পড়ানোর একটা সুযোগ আছে তার, তা থেকে বেশ ভালো টাকা রোজগার করে সে। কাউরু যে মেডিকেল স্কুলে পড়ে ওটার সঙ্গে সংযুক্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শিশুদের মা-বাবারা চান না

BanglaBook.org

তাঁদের বাচ্চারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকুক, তা থাকলে স্কুলে ফিরে সমস্যায় পড়তে হবে তাদের। কাজেই পড়ানোর মতো ছাত্র-ছাত্রীর অভাব হয় না কখনও।

গ্রীষ্মের ছুটি মাত্র শুরু হয়েছে, জুনিয়ার হাইস্কুলের এক ছাত্রকে ইংরেজি আর অঙ্ক পড়াতে হাসপাতালে গেছে কাউরু। পড়ানো শেষ করে ক্যাফেটেরিয়ায় বসে হালকা লাঞ্চ খেলো।

এই হাসপাতালেই শুয়ে আছেন হাইডিউকি। মাত্র খানিক আগে কাউরু খবর পেয়েছে ডাক্তাররা ধারণা করছেন ওর বাবার ফুসফুসেও সম্ভবত ক্যানসার ছড়িয়েছে। মনটা তাই খুব খারাপ। কদিন আগে বাবা ওর খাতা খুলে বাৎসরিক ছুটিছাটার ওপর চোখ বুলিয়েছেন। *চলতি বছর,* বলেছেন হাইডিউকি, *আমরা উত্তর আমেরিকার মরুভূমিতে ওই লঞ্জেভেটি জোনস দেখতে যাচ্ছি।'*

তবে তাঁর সুরটা ফাঁপা লেগেছে কানে। আর তারপরই নতুন এই দুঃসংবাদ, ক্যানসার আরও ছড়িয়েছে।

ক্যাফেটেরিয়ায় চুপচাপ বসে আছে কাউরু, বাবার অসুস্থতা আর পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, এই সময় রাইকো সুগিয়োরা আর তার ছেলে রিয়োজিকে দেখতে পেল সে।

ক্যাফেটেরিয়াটা হাসপাতালের চারতলায়, ওটাকে ঘিরে তিনদিকে একটা পাকা চত্বর আছে, সেটার দিকে মুখ করা দেয়াল পুরোটাই কাঁচ। চত্বরে একটা ঝরনা আছে, ক্যাফেটেরিয়ার টেবিলগুলো যথেষ্ট উঁচু জায়গায় ফেলা, যাতে ওগুলোয় বসলে আপনার চোখ আর ঝরনার উত্থিত পানির চূড়া একই সরলরেখায় থাকবে।

জায়গাটা এত সতর্কতার সঙ্গে সাজানো, এখানে এলে আপনি বুঝতেই পারবেন না একটা হাসপাতালের ভেতর আছেন। ঝরনার দিকে তাকালে আপনার মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠবে।

স্বভাবতই কাউরুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুন্দরী এক তরুণীর দিকে, খালি একটা টেবিলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, সঙ্গে একটি শিশু।

তার রোদে পোড়া তামাটে-সোনালি শরীরে ভারি সুন্দর মানিয়েছে বিস্কিট রঙের হালকা উলেন ড্রেসটা। কোনো রকম কসমেটিক্সের ব্যবহার ছাড়াই একটা মুখ যে এত সুন্দর হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করত না কাউরু। ওর বয়স যেটা আন্দাজ করছে সে, সঙ্গে শিশুটি না থাকলে খুব সহজেই আরও দশ বছর কম বলে চালিয়ে দেয়া যেত।

শিশুটিকে নিয়ে ওয়েটারের দেখানো টেবিলে বসল তরুণী, নেহাত কাকতালীয় বলতে হবে যে সেটা কাউরুর পাশের টেবিল। ওদেরকে বসতে দেখল কাউরু, এবং খানিক পর সে খেয়াল করল মিনিড্রেস পরা তরুণীর লম্বা করা পায়ের দিকে বার বার ছুটে যাচ্ছে তার দৃষ্টি।

কাউরুর মনে পড়ল দু'সপ্তা আগে এদের দুজনকেই হোটেলের সুইমিং পুলে

BanglaBook.org

দেখেছিল ও। ওর এক ছাত্রের গ্রেড এত বেশি ওপরে উঠে গেছে যে তার মা-বাবা খুশি হয়ে গোটা গ্রীষ্মকালের জন্যে ওই পুলের ফ্রি পাস যোগাড় করে দিয়েছেন কাউরুকে। প্রথম যেদিন ওখানে সাঁতরাতে গেল, সেদিনই এই মা আর ছেলেটিকে দেখেছে ও –সুইমিং পুলের পাশে চেয়ারে বসেছিল।

সবুজ বেদিং সুট পরা তরুণীর দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ার পরই কাউরু বুঝতে পারে ওকে আগে কোথাও দেখেছে। কিন্তু কোথায় বা কবে, মনে করতে পারেনি। নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে তার, কিন্তু কাছে বা দূরের অতীত তন্নতন্ন করে খুঁজেও ধরতে পারেনি ঠিক কোথায় কীভাবে দেখেছে মেয়েটিকে। এই অভিজ্ঞতা তার মধ্যে একটা তিক্ততার জন্ম দেয়, চেষ্টা করেও সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না।

এরকম বিস্ময়কর সৌন্দর্য একবার দেখার পর কারও পক্ষে মনে না রাখা অসম্ভব, অথচ দেখা যাচ্ছে বেমালুম ভুলে গেছে সে।

ওই সময়, প্রথমবার, মাথা থেকে মেয়েটিকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল কাউরু, নিজেকে বুঝিয়েছিল ওর ভুল হয়েছে। কিন্তু তারপর মেয়েটির কিছু একটা বৈশিষ্ট্য ওর স্মৃতিকে নাড়া দিল, মনে পড়ল একটা সোপ অপেরার তারকা সে–যে সোপ অপেরা ছোটবেলায় দেখত কাউরু। তারপরও বিস্ময় কাটে না–এ সেই মেয়েটিই তো, না অন্য কেউ?

বাচ্চাটিকে দেখে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছিল কাউরুর, বিশেষ করে ওর গঠন দেখে। ব্লু সুইম ক্যাপ, যেটা মাথার পেছন দিকে নামানো ছিল, গগলস, ডোরাকাটা কাপড়ের ঢোলা শর্টস–একবার চোখ বুলিয়েই কাউরু বুঝে নিয়েছিল এ-সব সাঁতারের জন্যে নয়।

ছেলেটার হাড্ডিসার পা দুটো বাঁকা। সবচেয়ে যেটা চোখে লাগে, ওর গায়ের অস্বাভাবিক সাদা চামড়া। ঠিক যেন কোনো ভিনগ্রহের একটা লাশ, বহুদিন আগে বানোয়াট টিভি শোতে দেখেছিল কাউরু। অদ্ভুত মনে হলেও সত্যি, ছেলেটার কিছুই যেন ঠিকঠাক নেই। জোড়াটি কাউরুর মনে গেঁথে আছে, এই তরুণী আর তার অদ্ভুতদর্শন বাচ্চাটিকে আগেও কোথাও দেখেছে সে।

যাই হোক, এখন তারা ওর পাশের টেবিলে বসে আছে। কাউরু জানালার পাশে বসেছে, ঝরনাটা যাতে দেখতে পায়। খেয়াল করল জানালার কাঁচে ওদের প্রতিফলন ফুটে আছে। সরাসরি তাকিয়ে থাকার চেয়ে কাঁচের এই দৃশ্যটাই পছন্দ করল সে।

এক মুহূর্ত পর কাউরু বুঝতে পারল ছেলেটির একটা ব্যাপার কেন সে মেলাতে পারছিল না। ওর মাথার চুল, মানে সেটা না থাকারই মতো। সুইমিং পুলের কাছে প্রথম যখন দেখেছিল তখন ওর মাথায় ক্যাপ ছিল। এখন ক্যাপ নেই, নেই ক্যাপের ভেতরে থাকবে বলে আশা করা মাথাভর্তি একরাশ চুলও।

BanglaBook.org

আজও ওর মাথায় একটা হ্যাট ছিল, টেবিলে বসার পর মাথা থেকে খুলে নামিয়ে রেখেছে ' ওর মাথাটা পুরোপুরি একটা টাকই বলা চলে।

কি ব্যাপার বুঝতে পারছে কাউরু। ছেলেটা এখানে, তার কারণ এখানে ওর ক্যানসারের চিকিৎসা চলছে। প্রথমে ও ভেবেছিল মা আর ছেলে কোনো রোগীকে দেখতে এখানে এসেছে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কেমোথেরাপি নিতে আসা ছেলেকে সঙ্গ দিচ্ছে মা। ওর বাবা হাইডিউকির কেমোথেরাপি চলছে, তাঁর চুলও সব ঝরে গেছে। তবে বাচ্চা একটা ছেলেকে এরকম পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় ভুগতে দেখলে মন আরও বেশি কাতর হয়ে পড়ে।

হাতের ওপর মাথা রেখে ত্রিশ কি বত্রিশ বছর বয়সী তরুণী আর তার শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকল কাউরু, ভাবছে ছেলেটা হয়তো ফিফথ্ কিংবা সিক্সথ্ গ্রেডে পড়ে, লাঞ্চ খাওয়ার সময় দুজনের কারও মুখে কথা নেই। নিজের অজান্তেই বাবার সঙ্গে ওদের তুলনা করছে, এই হাসপাতালেই শুয়ে আছেন। ওর বাবার বয়স ঊনপঞ্চাশ, আর শিশুটির বয়স হবে বারো কি তেরো। দুজনেই ক্যানসারের চিকিৎসা নিচ্ছে।

শুধু কাপড়চোপড়ে নয়, হাবভাবেও বেশ উজ্জ্বল আর শান্ত-স্বাভাবিক লাগছে তরুণী মাকে, একটা হাসপাতালে ঠিক মানানসই নয়। মাঝে-মধ্যে চোখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে সে। যা খাচ্ছে তার স্বাদ নিচ্ছে বলে মনে হয় না, যেন খেতে হয় তাই খাওয়া, সরাসরি কারও দিকে না তাকিয়ে মুখে যে ভাব ধরে রেখেছে সেটাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলার কিংবা হেসে ওঠার পূর্বমুহূর্ত বলা যায়।

তার হাতে ধরা চামচ শূন্যে স্থির হয়ে গেল, ধীরে ধীরে প্লেটে ফিরল, আবার মুখে উঠল, তারপর অকস্মাৎ ঝট করে কাউরুর দিকে তাকাল সে। প্রথমে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, যেন বলতে চাইছে, *এভাবে তাকিয়ে কী দেখছ তুমি!* তবে দু'জোড়া চোখ এক হতে নরম হলো দৃষ্টিটা। কাউরু উপলব্ধি করল সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারছে না।

তরুণী যেন মনে করতে পারছে সুইমিং পুলের কাছে ওকে দেখেছে সে। ভাব দেখে আরও মনে হলো, ওকে কি যেন বলতেও চায়। মাথাটা একটু নোয়াল কাউরু, তরুণীও একই ভঙ্গিতে সাড়া দিল।

তারপর মার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ছেলের ওপর। কি কারণে কে জানে খেপে গিয়ে সে তার চপস্টিক আর চামচ ছুঁড়ে ফেলে দিল। মার মন থেকে উধাও হয়ে গেল কাউরুর ছবি।

কিন্তু তারপরও ওদের দুজনকে দেখছে কাউরু। এটা তার সাধ্য আর ক্ষমতার বাইরে মনে হলো, ওদেরকে না দেখে থাকতে পারছে না—যেন শিকড় উপড়ে সশরীরে তার সচেতনতাকে ওদের কাছে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

দিন কয়েক পর, এবার ওই চত্বরে, মা ও ছেলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো কাউরুর। এখানেও কাকতালীয়ভাবে দেখা গেল একই বেঞ্চের দু'প্রান্তে বসে আছে তারা। প্রথম চাল হিসেবে এগিয়ে গিয়ে আলাপ শুরু করার যে বিব্রতকর রীতি আছে, সেটা ছাড়াই কথাবার্তা শুরু করা সম্ভব হলো।

তরুণী মা নিজেকে রাইকো সুগিয়োরা বলে পরিচয় দিল, ছেলের নাম বলল রিয়োজি। রিয়োজির ক্যানসার প্রথমে ফুসফুসে দেখা দিয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে মগজেও ছড়িয়েছে। বলতে গেলে সারাটা দিনই রেডিয়েশন আর কেমোথেরাপির জন্যে প্রস্তুতি নিতে কেটে যায় তার।

শুধু তাই নয়, ধারণা করা হচ্ছে যে এজেন্ট কোষগুলোকে ক্যানসারে পরিণত করার জন্যে দায়ী সেটা আসলে সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন বা সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এমন একটা ভাইরাস, নাম মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস। রোগের লক্ষণ ও ধরন, কাউরুর বাবা হাইডিউকির সঙ্গে প্রায় হুবহুই মেলে।

কাউরু আত্মীয়তা অনুভব করল। অভিন্ন শত্রুর বিপক্ষে লড়ছে ওরা, এরকম একটা উপলব্ধি জাগল মনে:

'একই যুদ্ধে আছি আমরা।'

কথাটা রাইকোর হলেও, তাতে কাউরুর চিন্তার প্রতিধ্বনি আছে।

তবে তার কথায় সন্দেহ হলো কাউরুর, সেদিন ক্যাফেটেরিয়ায় ওদের আচরণ দেখে মনে হয়নি সত্যি ওরা কোনো যুদ্ধ করছে। ওদের চেহারায় হাল ছেড়ে দেয়ার ভাবই তো দেখেছিল সে, তাই না?

অন্তত, অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে, ওদের মুখ দেখে তা তার একবারও মনে হয়নি। কাউরুর এখনও মনে আছে কি রকম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে খাচ্ছিল রাইকো।

ওদেরকে প্রথমবার দেখার পর থেকে যে সন্দেহ মনে জেগেছে সেটা দূর করার জন্যে কাউরু জিজ্ঞেস করল, 'আগে কি আমাদের কোথাও দেখা হয়েছে?' প্রশ্নটা করার সময় বিব্রত বোধ করল সে, ভঙ্গিটা যেন মেয়ে পটানোর, কিন্তু তার মাথায় ঢুকল না অন্য আর কীভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করা যায়।

রাইকো সাড়া দিল হেসে উঠে, তার এই হাসির কারণটা কাউরু বুঝল না। 'কথাটা প্রায়ই শুনতে হয় আমাকে,' একটু লজ্জা পাওয়ার ভাব নিয়ে বলল সে। 'সবাই বলে আমি নাকি একটা টিভি শো-র এক অভিনেত্রীর মতো দেখতে।'

কাউরুর মনে হলো রাইকো মিথ্যেকথা বলছে। সে দেখতে শুধু ওই অভিনেত্রীর মতো নয়–দুজনকে এক ও অভিন্ন বলে বিশ্বাস করে সে। তবে রাইকো যদি সত্যি অভিনেত্রী হয়, আর নিজের অতীতকে এড়াবার জন্যে মিথ্যেকথা বলে থাকে, প্রসঙ্গটা নিয়ে আর কিছু বলা উচিত হবে না ওর।

যখন বিদায় নেবে, ওই চত্বর থেকে, কাউরুকে নিজেদের কামরার নম্বর দিয়ে

BanglaBook.org

রাইকো বলল, 'আমাদের ওখানে এক সময় চলে এসো না? প্লিজ।'

তিনবার দেখা করল ওরা, কাউরু আর রাইকো সুগিয়োরা। বরং আগের চেয়েও বেশি, ওর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না সে।

তিন

দেরি সহ্য হলো না, পরদিনই রাইকোর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হাজির হয়ে গেল কাউরু, টোকা মারল রিয়োজির দরজায়।

দরজা খুলল রাইকো, ওকে দেখে মুখে যে হাসিটা ফুটল সেটা একটু জোর করা হতে পারে, স্বাগত জানাল কামরার ভেতরে। বিছানার ওপর বসে একটা বই পড়ছে রিয়োজি, পা দুটো খাটের পাশে ঝুলছে। কামরাটায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেলের ছাত্র হিসেবে কাউরু বুঝে নিল এর জন্যে কত ভাড়া গুণতে হচ্ছে ওদেরকে। বাথটাব, বাথরুমসহ স্বতন্ত্র একটা ঘর। যে ঘরে ভাগাভাগি করে থাকার ব্যবস্থা, এটার ভাড়া তারচেয়ে পাঁচগুণ বেশি।

'তুমি সত্যি এসেছ, সেজন্যে ধন্যবাদ,' নিচু গলায় বলতে পারল রাইকো, বোঝাই যাচ্ছে সামাজিক সৌজন্য দেখিয়ে আসতে বলেছিল সে, সত্যি সত্যি আশা করেনি তাতেই হুট করে চলে আসবে।

কাউরুও খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

তবে চলে যখন এসেছে, নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না রাইকো রিয়োজির দিকে ফিরে তার আগ্রহ জাগাবার চেষ্টা করল সে। 'দেখো, কে তোমাকে দেখতে এসেছেন।'

একটা ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারল কাউরু, ছেলের সঙ্গে কথা বলবে এমন কেউ মনে করে ওকে ডেকেছে রাইকো। এটা আগেই বুঝতে পারা উচিত ছিল, বিশেষ করে দুজনের বয়সের ব্যবধানটা মনে রেখে।

কিন্তু কাউরুর আগ্রহ জাগিয়েছে রাইকো, রিয়োজি নয়। মেয়েমানুষ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই ওর, তবে রাইকোর মায়া মায়া চোখের অপলক দৃষ্টিতে যৌন কিছুর, যেন এক ধরনের আকাঙ্ক্ষারও, আভাস পেয়েছিল ও।

ভরাট কমলাকোয়ার মতো ঠোঁট রাইকোর, টসটসে টানা চোখ দুটো কোনের দিকে একটু ঢালু, আর স্তনযুগল বিশেষ বড় না হলেও তার পাঁচফুটী কাঠামোয় নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য ভালোই ফুটিয়ে তুলেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, শুধু চেহারাতে নয়, তার আচরণেও পরিশীলিত ও মার্জিত যে ভাবটা আছে সেটা সমবয়েসী কোনো মেয়ের মধ্যে আজ পর্যন্ত দেখতে পায়নি

BanglaBook.org

কাউরু। এই ব্যাপারটা ওর ভেতরে কিছু একটাকে জাগিয়ে তুলেছে।

রাইকোর দেখানো চেয়ারে বসে রিয়োজিকে দেখছে কাউরু। ছেলেটার চোখে আলো এত কম, বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। রিয়োজি এমনকি ওর দিকে ভালো করে একবার তাকালও না। তাকিয়ে আছে এদিকেই, তবে দেখছে না কিছু। ওর দৃষ্টি কাউরুকে ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পেছনের দেয়ালে দীর্ঘক্ষণ চোখ থেকে শূন্য দৃষ্টিটা কাটলই না।

রিয়োজি তার হাতের বই হাঁটুর ওপর নামাল, এখনও একটা আঙুল পাতাগুলোর ভেতরে ঢোকানো। কিছু একটা বলে আলাপ শুরু করার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে কাউরু দেখার চেষ্টা করল ছেলেটা কি পড়ছে।

ভাইরাস আতঙ্ক।

রোগীরা তাদের রোগ সম্পর্কে যতটা সম্ভব বেশি জানতে চায়। রিয়োজিও তাদের একজন। ওর শরীরে বহিরাগত যে জিনিসটা চুপিসারে হামলা চালিয়েছে সেটা সম্পর্কে জানতে চাওয়াটা স্বাভাবিক।

ছেলেটাকে কাউরু জানাল, মেডিকেলের ছাত্র সে। তারপর ভাইরাস সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করল ওকে।

সিক্সথ্ গ্রেডে পড়া একটা ছেলে এমন সঠিক আর বিস্তারিত উত্তর দিল, একেবারে তাজ্জব বনে গেল কাউরু। ভাইরাস সম্পর্কে এই ছেলে অনেক কিছু জানে। ডিএনএ কীভাবে কাজ করে তা তো সে জানেই, প্রাণরহস্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সময়ের ধ্যান-ধারণার ওপর তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও আছে।

পরস্পরকে প্রশ্ন করা আর উত্তর দেয়ার মাধ্যমে নানা বিষয়ে আলাপ করার সময় এক পর্যায়ে কাউরু প্রায় চমকে উঠে উপলব্ধি করল যে সে তার কৈশোর সংস্করণের মুখোমুখি বসে আছে।

ছেলেটার দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল কাউরু, যে ছেলের মাথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, ওর বাবা ঠিক যে দৃষ্টিতে তাকাতেন ওর দিকে। নিজেকে একজন পরিণত মানুষ বলে মনে হলো ওর।

তবে ভালো লাগার সময়টা বেশিক্ষণ টিকল না। পরস্পরকে ওরা যখন পছন্দ করতে শুরু করেছে, একে অন্যের প্রতি উষ্ণতা অনুভব করছে, আলোচনাটা যখন সত্যিকার অর্থে তুঙ্গে, নার্স এসে হাজির হলো রিয়োজিকে এগজামিন রুমে নিয়ে যাবে বলে।

ছোট্ট সিকরুমে এই মুহূর্তে রাইকো আর কাউরু একা। হঠাৎ করে অস্থিরতা অনুভব করছে কাউরু। আর রাইকো, জানালার পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠাণ্ডা একটা ভাব নিয়ে হেঁটে এসে বিছানার পাশে বসল।

'আমার কোনো ধারণা ছিল না তোমার বয়স বিশ।'

BanglaBook.org

রিয়োজির সঙ্গে আলাপ করার সময় নিজের বয়স বলেছে কাউরু, রাইকোর কানে গেছে সেটা। বয়সের চেয়ে তোমাকে বড় দেখায়, এটা সব সময় শুনে আসছে কাউরু, শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

'আমাকে দেখে কত মনে হয়েছিল আপনার?'

'হুমম। এই ধরো আর হয়তো পাঁচ বছরের বড়–?' ক্ষমাপ্রার্থনার সুর তুলে থেমে গেল রাইকো, ভয় পাচ্ছে কাউরু না আহত বোধ করে।

'আপনি বলতে চাইছেন আমাকে দেখে বয়স্ক মনে হয়?'

'দেখে মনে হয় পরিণত। সত্যি...দুটোই।' বয়স্ক বললে কাউরু আহত হতে পারে, পরিণত বললে শুনতে লাগবে প্রশংসা, বোঝা গেল এরকম একটা হিসেব করেছে রাইকো।

'আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, আমার মা-বাবাকে আমি খুব খুশি হতে দেখেছি,' বলল কাউরু।

'তাতে কি বয়সের চেয়ে বড় দেখায় বাচ্চাদের?' হাসি চেপে, সামান্য ভ্রূ কুঁচকে, জানতে চাইল রাইকো।

'না, মানে, আমার তো সব সময় মনে হয়েছে বিরক্ত করা না হলেই খুশি হন তাঁরা, দুজনে ভালো সময় কাটাতে পারেন। কাজেই আমি খুব কম বয়সেই স্বাধীন হতে শিখেছি।'

'ও।' রাইকোর ভাব দেখে মনে হলো, কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। কাউরু লক্ষ করল, খালি বিছানার দিকে তাকাল সে।

রাইকোর স্বামীর কথা ভাবছে কাউরু। বাবা নেই বা এরকম কি যেন একটা বলতে চাইছিল রিয়োজি। হয়তো স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে রাইকোর, কিংবা হয়তো মারা গেছে সে, কিংবা শুরু থেকেই অনুপস্থিত ছিল। মোটকথা, কাউরুর মনে হলো বাবার সঙ্গে রিয়োজির সম্পর্ক, বুঝতে অসুবিধে হয় না, অত্যন্ত ক্ষীণ।

'সে অর্থে আমার ছেলে হয়তো কখনোই স্বাধীন হতে পারবে না,' বলল রাইকো, এখনও বিছানার দিকে তাকিয়ে।

কাউরু কিছু বলছে না। রাইকো আরও কি বলে শোনার জন্যে নিজেকে শক্ত করে অপেক্ষায় রয়েছে।

'ওরও ক্যানসার...'

'ওহ্।' এরকম কিছুই আশা করছিল কাউরু।

'আজ দুবছর,' ম্লান সুরে বলল রাইকো। 'বাবা মারা যাওয়ায় রিয়োজি এতটুকু দুঃখ পায়নি, জানো।'

এটা কাউরু বুঝতে পারে। বাচ্চাটা সম্ভবত তার কান্না একবারও দেখতে দেয়নি মাকে।

'এমন যে হয় না, তা নয়।'

BanglaBook.org

তবে কাউরু ঠিক তা বোঝাতে চাইছে না। সে তার নিজের বাবার মৃত্যুর কথা যখন ভাবে, হৃদয়ের গভীর থেকে অদম্য একটা বিষণ্নতা উঠে এসে তাকে প্রায় অসুস্থ করে তোলে। ঘটনাটা যখন সত্যি ঘটবে, কাউরুর বিশ্বাস হয় না আঘাতটা ওর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে। ওর উপলব্ধি, অন্তত এই একটা ব্যাপারে, এখনও ততটা স্বাধীন হতে পারেনি সে।

'কাউরু, তুমি কি কিছু মনে করবে...' আবার নিজের কথা শেষ করতে পারল না রাইকো, ওর ওপর স্থির হয়ে আছে তার দৃষ্টি। 'মানে, ওর পড়াশোনার দিকটা তোমাকে যদি দেখতে বলি, তুমি কিছু মনে করবে?'

'বলতে চাইছেন, ওর টিউটর হিসেবে?'

'হ্যাঁ?'

বাচ্চাদের পড়াতে ইতিমধ্যে দক্ষ হয়ে উঠেছে কাউরু, এক কি দুটো ছাত্রের জন্যে ওর হাতে এখন সময়ও আছে। কিন্তু ও ঠিক নিশ্চিত নয় রিয়োজির আদৌ গৃহশিক্ষক দরকার আছে কিনা। অল্প সময়ের ভেতর যে আলোচনা হয়েছে ওর সঙ্গে, তা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সমবয়েসী ছেলেদের চেয়ে লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে আছে ছেলেটা।

তবে শুধু এটাই না। ক্যানসার যদি এরই মধ্যে ওর ফুসফুস আর মগজে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, কাউরু জানে দুনিয়ার সমস্ত শিক্ষক আর দুনিয়ার সমস্ত পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত ওর জন্যে কোনো অর্থ বহন করবে না। এই ছেলে আবার স্কুলে ফেরত যাবে, তার কোনো সুযোগই নেই।

আবার, হয়তো ঠিক সে কারণেই রাইকো ওর ছেলের জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর রাখতে চাইছে, এই আশায় যে ছেলেকে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ করে দিলে, এবং লেখাপড়াটা আবার শুরু করতে উৎসাহ যোগালে নিজের ভবিষ্যতের ওপর ওর আস্থা ফিরে আসবে। কাউরু জানে রোগীকে যারা ঘিরে রাখে তাদের আচরণে এই ভাব থাকাটা কত জরুরি যে তারা হাল ছাড়েনি।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' রাইকোর প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছে কাউরু। 'সপ্তায় দুদিন আসার মতো সময় আছে আমার হাতে, তাতে যদি কাজ চলে।'

কাউরুর দিকে দুই কি তিন পা এগোল রাইকো, শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাত দুটো নিজের সামনে রাখল, একটার ওপর একটা। 'ধন্যবাদ। এতে ওর স্কুলের কাজে খুব সুবিধে হবে। তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কথা বলার কাউকে পাবে ও।'

'ঠিক আছে তাহলে।'

জানা কথা এত বড় দুনিয়ায় রিয়োজির কোনো বন্ধু নেই। ব্যাপারটা বোঝে কাউরু, কারণ ও নিজেও এরকম ছিল। সমাজ যাদেরকে পরিত্যাগ করে, বলা যায় স্কুলে অনেকটা তাদের একজন ছিল ও। তবে ওর বেলায় মা-বাবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকায়, নিঃসঙ্গতায় ভুগতে হয়নি ওকে।

BanglaBook.org

বাবার মধ্যে যতই পাগলাটে ভাব থাকুক, আলোচনার সঙ্গী হিসেবে সম্ভাব্য সেরা একজনকেই পেয়েছিল কাউরু। পাশে মা-বাবা থাকায় কাউরুর মনে এ-প্রশ্ন কখনও জাগেনি যে এই দুনিয়ায় কেন সে জন্মেছে; নিজের পরিচয় সম্পর্কে ওর মনে কখনও কোনো সন্দেহ জাগেনি।

কাউরুর মধ্যে নিজের ছেলের জন্যে একজন বাবার প্রতিমূর্তি দেখতে চাইছে রাইকো। তাতে কাউরুর কোনো সমস্যা নেই। নিজের ওপর আস্থা আছে ওর, এই ভূমিকায় ভালোই উতরে যাবে।

তবে কাউরুর মনে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জাগল: *সে কি নিজের জন্যেও একজন স্বামীর প্রতিমূর্তি চাইছে?*

কাউরুর কল্পনা সঙ্গে সঙ্গে ডালপালা ছড়াতে শুরু করল। এই ব্যাপারটায় তত আত্মবিশ্বাসী নয় সে। তবে অন্তত চেষ্টা করে দেখতে চায় সেরকম পুরুষ সে হতে পারে কিনা, রাইকোর যেমনটি দরকার।

চার

কাউরু আর রিয়োজির মধ্যে প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে, এমনকি দুজনের বাঁধাধরা সময়ের বাইরেও। ঘুরেফিরে ওদের আলোচনায় বারবার ফিরে আসে সাধারণ বিজ্ঞান। নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় কাউরুর, যখন দুনিয়াটাকে বুঝতে পারার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গভীরে অনুসন্ধান চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল ওকে।

এক সময় কাউরুর আকাঙ্ক্ষা ছিল একটা সিস্টেম বা থিয়রি দাঁড় করাবে, সেটা এমন সব জিনিসকে ধারণ ও ব্যাখ্যা করতে পারবে যেগুলোকে সাধারণত বিজ্ঞান নয় বলে বাতিল করে দেয়া হয়– প্যারানরমাল ফেনমেনান। কিন্তু যত শিখল ও, ততই দেখতে পেল যে থিয়রিই দাঁড় করানো হোক না কেন, তারপরও কিছু প্রতীত ব্যাপার [ফেনমেনান] থেকে যাবে যেগুলোকে তাতে জায়গা দেয়া যাবে না। এই উপলব্ধির সঙ্গে বাবার অসুস্থতা যুক্ত হয়ে ওর অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা পাঠ করার জন্যে খুঁজে নিল বাস্তব একটা ক্ষেত্র–মেডিসিন।

রোমন্থন বাদ দিয়ে রিয়োজির দিকে তাকাল কাউরু–একজন খুদে তদন্ত সহকারী, বিশ্বপ্রকৃতির ধরন-ধারণ বোঝার চেষ্টা করছে।

বরাবরের মতো বিছানার ওপর পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে রিয়োজি, অলস একটা ছন্দে আগুপিছু দুলছে। রাইকো বসে আছে জানালার পাশের একটা চেয়ারে, ওদের আলোচনা শুনছে; নিশ্চয় খুব ঘুম পেয়েছে তার, কারণ ছেলের দোল খাওয়ার

BanglaBook.org

সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে-ও মাথাটাকে দোলাতে শুরু করল।

'ঠিক এখন তাহলে এটার ওপরই আপনার মনোযোগ?'

কাউরুকে জেনেটিকস সম্পর্কে একের পর প্রশ্ন করছে রিয়োজি।

'হ্যাঁ, তা বলতে পার।'

কোটরে ঢোকা চোখ সামনের দিকে তাক করে ওখানে বসেই খিল ছাড়াবার জন্য শরীরটাকে মোচড়াল রিয়োজি। বরাবরের মতো হাসছে, যদিও ওরা যে বিষয়ে আলোচনা করছে তার মধ্যে হাসির কিছু নেই; এটাকে স্বাস্থ্যকর হাসি বলে না।

এই শব্দহীন বেপরোয়া হাসি তার মুখেই দেখা যায় যে নিজ জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে বিদ্রূপ করতে পারে পৃথিবীকে। কাউরু ভেবেছিল এটার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে, তবে দেখল বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ব্যাপারটা এখনও তাকে বিচলিত করে। ওর বাবা যদি এভাবে হাসত, তাঁকে সে...খামচি দিত, বাপ হোক আর যাই হোক।

রিয়োজির এই হাসিটা মুছে ফেলার একটাই উপায়ঃ ওকে ওর প্রিয় কোনো বিষয়ের তর্কে টেনে আনা।

প্রসঙ্গ বদল করল কাউরু। 'তো বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কী ভাব তুমি?' জেনেটিকসের পর স্বভাবতই এটা প্রাসঙ্গিক।

শরীরটাকে মোচড়াল রিয়োজি, হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। 'কী জানতে চাইছেন, শুনি?' কোটরের ভেতর চোখ ঘুরিয়ে কাউরুর দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে, এটা দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়?' বলল কাউরু। 'বিবর্তন কি এলোমেলোভাবে সংঘটিত হচ্ছে, নাকি এটার পূর্ব-নির্ধারিত গন্তব্য আছে?'

'আপনার কী ধারণা?' রিয়োজির এটা ছোটখাটো বাজে অভ্যাসগুলোর একটা নিজের মতামত দেয়ার আগে প্রথমে জানতে চেষ্টা করবে প্রশ্নকর্তা কি ভাবছে।

'আমার ধারণা বিবর্তন একটা বিশেষ দিকে এগোচ্ছে, তবে সবসময় বাছাই করার একটা নিশ্চিত জায়গা রেখে।'

'এটা সেই ডিরেকশন থিয়রি। আমারও প্রায় তাই বিশ্বাস।' কাউরুর দিকে ঝুঁকল রিয়োজি, ভাবটা যেন সে কিছু অর্জন করেছে।

'এবার আমরা প্রাণের উদ্ভব নিয়ে শুরু করতে পারি?'

'প্রাণের উদ্ভব?' সত্যি সত্যি বিস্মিত দেখাল রিয়োজিকে।

'হ্যাঁ, প্রাণের সূচনা। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, প্রাণের আবির্ভাবকে কোন দৃষ্টিতে দেখো তুমি।'

'তাই?' ভ্রূ কোঁচকাল রিয়োজি, চেহারা দেখে মনে হলো প্রসঙ্গটা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

রিয়োজির এই প্রবণতা কাউরুর ভালো লাগল না। ওর মতো একটা বাচ্চার এ-ধরনের প্রশ্ন নিয়ে খেলতে মজা পাওয়ার কথা। পৃথিবীর বুকে জীবন কীভাবে

BanglaBook.org

ছড়াবার যোগ্যতা অর্জন করল, এই প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রয়েছে পৃথিবীর বুকে প্রথম কীভাবে জীবনের সূচনা ঘটল। কাউরু অন্তত ওর বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে প্রচুর আনন্দ পেয়েছে।

'ঠিক আছে, এবার তাহলে এগোনো যাক। এসো স্বীকার করি জীবনের সূচনা ঘটল, এমন একটা মেকানিজমের দ্বারা, যেটার সম্পর্কে এখনও কোনো ধারণা নেই আমাদের। কাজেই, পরবর্তী...' রিয়োজিকে শুরু করার সুযোগ দিয়ে থেমে গেল কাউরু।

'আমার ধারণা পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রাণ ছিল একটা বীজের মতো। বীজটার মধ্যে সঠিক তথ্য ছিল, কাজেই সেটা গজাতে, বাড়তে শুরু করল, এবং এক পর্যায়ে হয়ে উঠল আমাদের পরিচিত সেই গাছ, যার একটি শাখা মানবজাতি।'

'এর আর কোনো ভিন্নতা নেই?'

'আছে আবার নেই। ক্ষুদ্রতম বীজ থেকে বৃহত্তম গাছ তৈরি হয়েছে। কাণ্ডের আকার, পাতার রঙ, কী ধরনের ফল–সমস্ত তথ্য আগে থেকেই ওই বীজে ছিল। ওটা যদি সূর্যের আলো না পায়, মারা যাবে; যদি পুষ্টি না পায়, কাণ্ড সরু হবে। বজ্রাঘাতে চিরে দু'ভাগ হয়ে যাবার সম্ভাবনাও হয়তো আছে। হয়তো ঝড়ো বাতাসে ওটার ডালপালা ভেঙে যাবে। কিন্তু এসব অপ্রত্যাশিত যে-কোনো পরিমাণ প্রভাব, বীজ যে মৌলিক প্রকৃতি ধারণ করে, তার মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন আনতে পারবে না। তুফান আসুক আর ভূমিকম্প হোক, কলাগাছে আপেল ফলবে না।'

কাউরু ঠোঁট ভেজাল। রিয়োজির সঙ্গে তর্ক করতে যাচ্ছে না সে। ওর সঙ্গে মোটামুটি একমতই পোষণ করে।

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ সামুদ্রিক প্রাণীরা যদি ডাঙায় হাঁটতে শিখে থাকে, জিরাফ যদি তার গলা লম্বা পেয়ে থাকে, তার কারণ হলো শুরু থেকেই ওগুলোকে ওভাবে প্রোগ্রাম করে দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

'সেক্ষেত্রে, আমাদের তাহলে ধরে নিতে হয়, প্রাণের সূচনা ঘটার আগে কোনো ধরনের ইচ্ছেশক্তি কাজ করেছে।'

ভাবটা নিরীহ, রিয়োজি প্রশ্ন করল, 'কার ইচ্ছেশক্তি? ঈশ্বরের?'

কাউরু বিশেষভাবে ঈশ্বরের কথা ভাবছে না, ভাবছে প্রাণের উদ্ভব ঘটার আগে এবং বিবর্তন পদ্ধতি শুরু হওয়ার পরও স্রেফ একটা অদৃশ্য ইচ্ছেশক্তি কাজ করেছে কিনা।

কাউরু কল্পনা করল, এক ঝাঁক মাছ ডাঙায় পৌঁছুনোর জন্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ওই সব মাছের চিন্তায় প্রচণ্ড একটা শক্তি আছে, তাদের সংখ্যা এত বেশি যে সাগরকে কালো করে দিতে পারে, শুকনো ডাঙার খোঁজে চারদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

এও সম্ভব বলে মনে হয় যে সামুদ্রিক জীবন কখনোই ডাঙায় উঠতে চায়নি, পাহাড় তৈরির আয়োজন শুরু হওয়ায় পানি শুকিয়ে যায়, ওগুলোও তখন বাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে ডাঙার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়।

বিবর্তনবাদ নিয়ে মূলধারার চিন্তাবিদরা এই ব্যাখ্যাই দেবেন।

কিন্তু মনের পরদায় বার বার ওই মাছের ছবি দেখতে পাচ্ছে কাউরু, সারাদিন ডাঙার দেখা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ছুটছে, মারা যাচ্ছে পানির কিনারায়, তৈরি করছে লাশের পাহাড়।

মূলধারা থেকে বলা হচ্ছে ওদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট অল্প সংখ্যকই যথেষ্ট ভাগ্যবান যারা নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। এটা কাউরু স্রেফ বিশ্বাস করে না।

জলজগৎ থেকে জায়গা বদল করে জমিনপ্রধান জীবনযাপনে চলে আসতে হলে ভেতরের বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অর্থাৎ দেহযন্ত্রের পরিবর্তন দরকার হয়েছে। জিল শ্বাসযন্ত্রের জায়গায় লাঙস্ শ্বাসযন্ত্র যাতে কাজ করতে পারে, সেজন্যে তাদের ভেতরটা নতুন করে তৈরি করার দরকার পড়েছিল।

এসব পরিবর্তন করার জন্যে শারীরিক কি ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার [ট্রায়াল] ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে? তার ফলাফল হিসেবে কি ধরনের ভুল আর বিচ্যুতি [এরর] পাওয়া গেছে? এক ধরনের দেহযন্ত্র অন্য ধরনের একটা দেহযন্ত্র হিসেবে পুনর্জন্ম পেয়েছে, তাই তো?

চিন্তা করতে গেলে বিশাল একটা কর্মকাণ্ড।

সরাসরি কাউরুর চোখের সামনে রয়েছে রিয়োজির টাক মাথা। রিয়োজি মাথা নত করে থাকায়, ওর মাথার মাঝখানটা কাউরুর নাকের ডগার কাছে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, ছোট্ট রুগ্ন শরীরটার ভেতর, প্রচণ্ড এক সেলুলার সংঘর্ষ সংঘটিত হচ্ছে। ঠিক যেমনটি ঘটছে ওর বাবা হাইডিউকির শরীরে। তিনি তাঁর পেটের বেশিরভাগ, বৃহদন্ত আর যকৃৎ হারিয়েছেন। এতকিছুর পরও, এই মুহূর্তেও, এখন পর্যন্ত অজানা ক্যানসার সেল তাঁর শরীরের ভেতর নতুন কোনো আশ্রয় বেছে নিয়ে কিলবিল করছে।

হঠাৎ অনুপ্রাণিত বোধ করল কাউরু।

ক্যানসার সেল স্বাভাবিক একটা সেলের ভেতর হামলা চালায়, ওটার রঙ আর আকৃতি বদলে দেয়, এভাবে একটা স্তূপ তৈরি করে, যতক্ষণ না অঙ্গটির স্বাভাবিক কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটা মারা না যায়।

এর নেতিবাচক দিকটাই প্রথমে নজরে পড়ে, সেটাই স্বাভাবিক, তবে একই সঙ্গে এটা চিহ্নিত করা সম্ভব যে ক্যানসারের আচরণে কিছু একটাকে লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট গুচ্ছ তৈরির প্রবণতা আছে।

রক্ত আর লসিকায় অনুপ্রবেশ করা হয় অন্য কোনো জায়গার কোষে ঢোকার

BanglaBook.org

জন্যে, ওটা আসলে একটু একটু করে নিজের অমর প্রকৃতি অন্য কোথাও সংযোজনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা চালাচ্ছে।

কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্যটা কী?

শরীরের ভেতর কোথাও নতুন একটা অঙ্গ তৈরি করা? যেটা শরীরের সঙ্গে ভবিষ্যতে খাপ খাবে, অর্থাৎ শরীর একসময় সেটাকে মেনে নেবে? হতে পারে মেট্যাসটাটিক ক্যানসার ভাইরাস অন্য কিছু নয়, নতুন একটা দেহযন্ত্র তৈরি করার ট্রায়াল-অ্যান্ড-এরর প্রচেষ্টা বা পর্যায় মাত্র।

এই পদ্ধতিতে বিশাল সংখ্যায় মারা যাবে মানুষ, যেমনটি পানির কিনারায় বেশিরভাগ মাছ মারা গিয়েছিল। তবে ঠিক যেমন একশ মিলিয়ন বছরের পুরোনো সামুদ্রিক জীবন ঠিকই অবশেষে ডাঙায় উঠতে সফল হয়েছিল, মানবজাতিও একদিন, অসংখ্য প্রাণ হারানোর বিনিময়ে, নিজের জন্যে নতুন একটা দেহযন্ত্র পেয়ে যাবে।

মানবজাতির বিবর্তন ঘটবে। হতে পারে ক্রমবিকাশ পদ্ধতি বিরাট একটা লাফ দেবে, যে লাফের সঙ্গে তুলনা করা চলে পানি থেকে ডাঙায় ওঠা অসম্ভব ছিল নতুন একটা দেহযন্ত্র ছাড়া।

কখন ঘটবে সেটা?

ক্যানসারে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু ক্যানসার সেল কখন থেকে তাদের কাজ শুরু করেছে তা না জানা থাকলে এটা বোঝা অসম্ভব মানবজাতির ক্রমবিকাশ সবেমাত্র শুরু হতে যাচ্ছে, নাকি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে?

শুধু একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে ক্রমবিকাশের গতি বেড়েছে। সামুদ্রিক প্রাণীদের উভচর হতে যে সময় লেগেছিল, তারচেয়ে অনেক কম সময় লেগেছে বানর থেকে মানুষ হতে—এত কম যে প্রায় কোনো তুলনাই চলে না। কাজেই এটা সম্ভব।

ক্রমবিকাশের বিরতিগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, কাজেই মানবজাতির এই পরিবর্তন ঘটার সময় হয়নি, এরকম ভাবা চলে না।

কাউরুর তাই ধারণা। প্রাণে আশা জাগাবে, এমন কিছুর দিকে মন আর মেধা ঢেলে দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে ও। ও বিশ্বাস করতে চায় ওর বাবা আরেকটা বলি না হয়ে, হবেন প্রথম সফলভাবে বিবর্তিত একজন মানুষ।

পুনর্জন্ম।

এরচেয়ে জাদুময় শব্দ আর কোথায় পাবে তুমি? যদি সম্ভব হয় কাউরু আবার জন্মাতে চায়। সন্দেহ নেই সবাই আবার বাঁচতে চায়, ফিরে পেতে চায় জীবনকে। উপহার অনন্ত জীবনের।

অমর কোষ তৈরি করা যেখানে এমএইচসি ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, সেখানে এটা খুব স্বাভাবিক যে মানবজাতির অমরত্ব নিয়ে কল্পনার ঘোড়া ছোটানো হবে। কাউরুর

BanglaBook.org

বিশ্বাস, এমনকি রিয়োজিরও হয়তো একটা সুযোগ আছে।

কথাটা প্রায় বলেই ফেলছিল, একেবারে শেষমুহূর্তে জিভ কামড়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে। কোনো কথা শুনতে যদি এমন লাগে যে তার অসুখটা খুব কঠিন, জীবনের সঙ্গে ওই ছেলের বাঁধন শিথিল হয়ে যেতে পারে

একেবারে ঠিক পেছন থেকে অস্পষ্ট নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল কাউরু। রাইকো বেশ কিছুক্ষণ থেকে ঝিমোচ্ছিল, তারপর কখন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাউরু আর রিয়োজি খিকখিক করে হেসে উঠল।

রাত বেশি নয়, আটটাই বাজেনি। জানালার বাইরে গোধূলির ঝাপসা ভাব কাটিয়ে সবেমাত্র রঙে আর আলোতে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে শহর। জানালার নীচে থেকে ভেসে আসা হাইওয়ে ট্র্যাফিকের শব্দ হঠাৎ করে কানে বাজছে।

রাইকোর কনুই সামান্য একটু ঝাঁকি খেলো, ধাক্কা লেগে খালি সোডা ক্যানটা পড়ে গেল মেঝেতে, তবে তার ঘুম ভাঙল না।

নিচু গলায় কথা বলছে কাউরু। 'তোমার মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার বোধহয় চলে যাওয়া উচিত।' পড়ানো অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ওর আর বসে থাকার কোনো অজুহাত নেই।

'আপনি এইমাত্র না আমাকে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কাউরু?'

রিয়োজি অতৃপ্ত, তার যেন কথা বলার সাধ এখনও মেটেনি

'পরের দিন ধরা যাবে ওটা, যেখানে শেষ করেছি সেখান থেকে।'

চেয়ার ছেড়ে কামরার চারদিকে তাকাল কাউরু। হাতের ওপর ডান গাল রেখে ঘুমোচ্ছে রাইকো, মুখটা ওর দিকে ফেরানো। তার চোখ বন্ধ, তবে ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে–তার হাতের পেছনটা লালায় ভেজা। ঘুমের মধ্যে অসম্ভব সুন্দর লাগছে তাকে।

এই প্রথম নিজের চেয়ে দশ বছরের বড় একটা নারীকে নিয়ে এরকম ভাবছে সে। রাইকোর পুরো শরীরটার প্রতি স্নেহ অনুভব করছে কাউরু, মুহূর্তের জন্যে হলেও লালন করল ওকে একবার ছুঁয়ে দেখার প্রবল ইচ্ছেটা।

রিয়োজি হাত বাড়িয়ে মার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'মা, মা।' তারপরও রাইকোর ঘুম ভাঙছে না।

'কোনো লাভ নেই। ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছে।'

নিরীহ চোখ দুটো তুলে কাউরুর দিকে তাকাল রিয়োজি, তারপর ঘাড় ফেরাল অতিরিক্ত বিছানার দিকে–রোগীর সঙ্গে যে থাকে সে ওটায় শোয়। 'আমার যত্ন নিতে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে মা, তাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি কখনও জাগাই না। মাকে অবশ্য আজ মাঝরাতে একবার উঠতে হবে,' কথাটা এমন সুরে বলল, সে যেন মিথ্যে কিছু দাবি করছে না।

BanglaBook.org

নিজের শরীরে অচেনা একটা উষ্ণতা অনুভব করল কাউরু, রিয়োজি যেন ওর হৃদয়ের ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখতে পেয়েছে। সে উপলব্ধি করল ছেলেটা আসলে যা বলতে চাইছে তা হলো–*দয়া করে তুমি আমার মাকে খুব আলতো করে তুলে ওই বিছানায় রেখে আসবে, যাতে তার ঘুম না ভাঙে!*

রাইকোকে যদি শুধু তুলতে পারে কাউরু, চেয়ার থেকে বিছানার দূরত্ব মাত্র ছ'ফুট। দু'পেয়ে খাটো স্কার্টের নীচে রাইকোর হাঁটু দুটো পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে সাঁটা, যেন তাকে স্পর্শ করার যে-কোনো চেষ্টা প্রতিহত করার জন্যে ঘুমের মধ্যেও প্রস্তুত সে।

কাউরুর গায়ে যে শক্তি, একটা তরুণীকে বিছানায় তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপার না, কিন্তু তাকে স্পর্শ করার চিন্তাটা সাবধান করে দিল ওকে–এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে, সন্দেহ হচ্ছে নিজের আসক্তি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে কিনা।

'মা যখন এভাবে ঘুমোয়, আপনি কিছুতেই তাকে নড়াতে পারবেন না।' কথাটা বলার সময় বুদ্ধি দেয়ার সুর ফুটল রিয়োজির গলায়; তারপর কি যেন বোঝাতে চেয়ে নিজের মুখটা কাউরুর দিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। সে বোধহয় জানে একজন নারী হিসেবে তার মার ওপর কাউরুর আগ্রহ আছে, আর তাতে ওকে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

দেখো, আমি জানি তুমি আমার মাকে ছুঁতে চাইছ। ঠিক আছে। আমি অনুমতি দিলাম। তোমাকে এমনকি সুযোগও করে দিচ্ছি।

হাসিটা জোর করে চেপে রেখে, ওকে প্ররোচিত করছে রিয়োজি।

মুখ বুজে অতিরিক্ত বিছানাটা ঠিকঠাক করছে কাউরু। রিয়োজির চ্যালেঞ্জের মুখে ততটা নত হয়ে পড়েনি সে, রাইকোকে ছুঁলে কেমন লাগে সেটা অনুভব করতে যতটুকু ব্যগ্র। যদি তার অনুভব আর আবেগ আরও গভীর হয়, তো হোক। এখন পর্যন্ত জানা নেই এই নারীর সঙ্গে শারীরিক যোগাযোগ ওর মন-মানসিকতার ওপর কি রকম প্রভাব ফেলবে।

রাইকোর ঘাড় আর হাঁটুর তলায় হাত রাখল কাউরু, তারপর এক টানে ওকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়, নড়াচড়ায় এতটুকু বিরতি না দিয়ে।

ওকে যখন বিছানায় শোয়াচ্ছে, কাউরুর ঘাড়ে ঘষা খেলো ওর ঠোঁট, মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে রাইকো ওর চোখ দুটো একটু খুলল, হাত দুটো এমনভাবে টান টান করল যেন তাকে জড়িয়ে ধরে আরও কাছে টেনে নিচ্ছে, তারপর চেহারায় তৃপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে ঢিল দিল বাঁধনে, আবার ঘুমের অতলে রাজ্যে হারিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল কাউরু, ভয় পাচ্ছে সে নড়লেই জেগে উঠবে রাইকো। কয়েক সেকেন্ড তার শরীর রাইকোর শরীরটাকে ঢেকে রাখল।

রাইকোর বুক আর নাভীর মাঝখানে মুখ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার পেটের মৃদু ওঠা-নামা অনুভব করছে কাউরু, চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে লাবণ্যমাখা মুখে।

BanglaBook.org

একটু নীচে থেকে ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে সে, দৃষ্টিপথ তির্যক। দেখতে পাচ্ছে রাইকোর সুগঠিত চোয়াল রেখা, একটু ওপরে কালো দুটো ফুটোসহ নাক। রাইকোর মুখ এই কোন থেকে আগে কখনও দেখেনি সে।

একসময় আবার সিধে হয়ে দাঁড়াল কাউরু। রাইকোর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় নিজেকে সে প্রশ্ন করল, বারবার, *আমি কি ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছি?*

ওর ঘাড়ের পেছনে রাইকোর ঠোঁটের স্পর্শ এত তাজা যে এখনও সেটা অনুভব করতে পারছে কাউরু।

'ঠিক আছে, তাহলে, আবার আগামী সপ্তায় দেখা হবে।'

আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে দরজার নবে হাত রাখল কাউরু, যেন হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি গোপন রাখতে চাইছে।

এখনও পায়ের ওপর পা তুলে বিছানায় বসে আছে রিয়োজি, আঙুপিছু দোল খাচ্ছে, পট পট করে আঙুল মটকাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত আগে ওর চোখে-মুখে প্ররোচিত করার বা ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক যে ভাব ছিল সেটা এখন আর নেই—ধুয়েমুছে একেবারে সাফ করে রেখেছে।

'গুড নাইট।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল কাউরু। পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে কবাট বন্ধ করার সময় দরজার দিকে ধরে রাখা রিয়োজির অস্বাভাবিক স্থির হাসিটা অনুভব করতে পারছে।

কাউরুর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে এই সাক্ষাৎ নেহাতই একটা কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না। রাইকো আর রিয়োজির সঙ্গে শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়বে ওর ভবিষ্যত।

পাঁচ

কাউরুর জীবনের অন্যতম একটা আনন্দ হলো, প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টের সহকারী প্রফেসর সাইকির অফিসে যেতে পারা এই ভার্সিটিতেই ওর বাবার ক্লাসমেট ছিলেন সাইকি। এখন, ওর বাবা যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন, ওর কথা শোনার জন্যে যত খুশি সময় দিতে রাজি তিনি, প্রয়োজনে সৎ পরামর্শও। কাগজে-কলমে কাউরুর পরামর্শক নন তিনি, তবে পরিবারের একজন পুরোনো বন্ধু; এমন একজন, যাকে কাউরু ছোটবেলা থেকে চেনে।

ইদানিং এখানে নিয়মিত আসার পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কাউরুর। ওর বাবাকে যে ক্যানসার কষ্ট দিচ্ছে তার সেলগুলো সহকারী প্রফেসর সাইকির ল্যাবে কালচার করা হয়েছে।

BanglaBook.org

ওই সেলগুলোকে মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখতে আসে কাউরু, এটা ওর প্রায় একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। শত্রুর হামলা ঠিকমতো প্রতিহত করতে হলে, কাউরুর ধারণা, তার চেহারা আর মেজাজ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার।

মূল হাসপাতাল ভবন ছেড়ে নতুন একটা দালানে ঢুকল কাউরু– এখানে প্যাথলজি, ফরেনসিক মেডিসিন আর মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব আছে। কয়েকটি নতুন ও পুরোনো দালান নিয়ে ভার্সিটির হাসপাতাল, এই দালানটা পুরোনো। ফরেনসিক মেডিসিনের ক্লাস বসে তিনতলায়, প্যাথলজির ক্লাস চারতলায়। সেখানেই যাচ্ছে ও।

সিঁড়ি বেয়ে করিডরে উঠল। দু'ধারে সারি সারি কামরার ভেতর ল্যাব। প্রফেসর সাইকির দরজার সামনে থেমে নক করল কাউরু।

'কে?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'আমি, স্যার,' বলে দরজা সামান্য একটু খুলে ভেতরে মাথা গলাল কাউরু।

'ও, তুমি। ঢুকে পড়ো,' বললেন সাইকি, ওকে দেখলে সব সময় এভাবেই ডাকেন।

'আমি কি আপনার কাজের সময়ে চলে এলাম?'

'আমি ব্যস্ত, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ, তবে তুমি তোমার ইচ্ছেমতো যা করার করতে পার।'

আজ বিকেলে অসুস্থ এক রোগীর কাছ থেকে পাওয়া কিছু সেল পরীক্ষা করছেন সাইকি, মুখ তুলে ভালো করে তাকাতেও পারছেন না। কাউরুর জন্যে ভালোই হলো, একা পর্যবেক্ষণ চালানোর স্বাধীনতা পাচ্ছে।

'তা করলে আবার কিছু মনে করবেন না যেন।'

বড়সড় রেফ্রিজারেটারের মতো দেখতে ইনকিউবেটারের দরজা খুলে ওর বাবার কোষ খুঁজছে কাউরু। ইনকিউবেটারে সারাক্ষণ একটা তাপমাত্রা ধরে রাখা হয়, সেটা কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে একই মাত্রায়। তারমানে দরজাটা বেশিক্ষণ খুলে রাখা যাবে না।

তবে প্ল্যাস্টিকের পেট্রি ডিশ, যেটায় ওর বাবার কোষ কালচার করা হয়েছে, আগের জায়গাতেই রয়েছে, কাজেই খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না।

অমরত্ব তাহলে এরকম দেখতে, ভাবল কাউরু। জিনিসটা ওকে বরাবরের মতো আজও যেন সম্মোহিত করে ফেলছে।

ওর বাবার যকৃৎ বের করে আনা হয়েছে, এখন সেটা অন্য একটা কেবিনেটের ভেতর কাঁচের জারে সিল করা, সংরক্ষণের জন্যে ফরমালডিহাইডে ডোবানো। ওখানে ওটা প্রায় তিন বছর হতে চলল আছে। মাঝে-মধ্যে পাশ ফেরে কিংবা মোচড় খায়, তবে সেটা আলোর কারসাজিও হতে পারে।

ওই লিভার অবশ্যই মারা গেছে। তবে পেট্রি ডিশে রাখা ক্যানসার কোষগুলো কোনো সন্দেহ নেই বেঁচে আছে।

BanglaBook.org

কাউরুর বাবার ক্যানসার সেল থেকে বেড়ে ওঠা সেল রয়েছে এই ডিশে. কালচার করা হয়েছে এক শতাংশেরও কম একটা ব্লাড সেরাম কনসেনট্রেইশানের সঙ্গে।

স্বাভাবিক কোষের বেলায়, ব্লাড সেরামের গ্রোথ ফ্যাক্টর থেমে গেলে ওটারও ক্রমবৃদ্ধি থেমে যায়। এবং পেট্রি ডিশের ভেতর ওগুলো একটি মাত্র স্তরের বেশি সংখ্যায় বাড়বে না, যতই কিনা গ্রোথ ফ্যাক্টর যোগ করা হোক–যেটাকে কনট্যাক্ট ইনিবিশন বলা হয়, তার কারণে।

ক্যানসার সেলে শুধু যে কনট্যাক্ট ইনিবিশনের অভাব, তাও নয়, ব্লাড সেরামের প্রতি ওগুলোর নির্ভরতার মাত্রাও খুব কম। সংক্ষেপে বললে, ওগুলো প্রায় কোনো খাদ্য ছাড়াই অতি ক্ষুদ্র জায়গায় স্তরের পর স্তর জন্মাতে এবং পুনরুৎপাদন করতে পারে।

স্বাভাবিক কোষ একটা পেট্রি ডিশে মাত্র একটা স্তর তৈরি করবে, কিন্তু ক্যানসার কোষ তৈরি করবে স্তরের পর স্তর। স্বাভাবিক কোষ পুনরুৎপাদিত হয় সুষম আকার এবং শৃংখলা বজায় রেখে, ক্যানসার সেল তৈরি হয় ত্রিমাত্রিক এবং বিশৃংখল একটা ভঙ্গিতে। মোট কতবার ভাগ হতে পারবে তার একটা নির্ধারিত কোটা আছে স্বাভাবিক কোষের, কিন্তু ক্যানসার সেল বিরতিহীন অনন্তকাল ভাগ হতে থাকবে।

অমরত্ব।

কাউরু এই প্রহসনের প্রতি পুরোপুরি সচেতন যে অমরত্ব, স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের সবচেয়ে গভীরতম আকাঙ্ক্ষা, এই প্রাচীন আতঙ্কের দখলে রয়েছে, এই মানুষ হত্যাকারীর কাছে।

যেন নিজেদের ত্রিমাত্রিক প্রকৃতি বোঝাবার জন্যে, ওর বাবার ক্যানসার সেলগুলো প্রায় গোলাকার একটা বুদ্বুদে পরিণত হয়েছে। যতবার ওগুলোকে দেখতে এসেছে কাউরু, ততবার ওগুলোর অন্যরকম আকৃতি লক্ষ করেছে সে।

শুরুতে, ওর বাবার লিভারে যে স্বাভাবিক সেল ছিল, সেগুলোর ভেতরই ছিল এই ক্যানসার সেলের উৎস, কিন্তু এখন সম্ভবত এগুলোকে স্বাধীন প্রাণ হিসেবে দেখাটাই ঠিক হবে। এমনকি এদের আগের মেজবান যখন চরম সংকটের মুখোমুখি, এই কোষগুলো লোভীর মতো অনন্ত জীবন উপভোগ করছে।

ডিশটা মাইক্রোস্কোপের নীচে রাখল কাউরু। ওটার বড় করার শক্তি [ম্যাগনিফিকেশন] মাত্র X200, তবে সহজেই রঙিন ছবি পাওয়া যায়। শুধু হাতে বেশি সময় থাকলেই স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করতে পারে ও।

এই ক্যানসার সেল, প্রাণের এই প্রকার, যা কিনা নিজের প্রভাবকে লাগাম পরিয়ে রাখতে অক্ষম, অদ্ভুত একটা চেহারা নিয়ে আবির্ভুত হলো। ওগুলোর চেহারা হয় সত্যি সত্যি বিদঘুটে, তা না হলে মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় বলে জানা থাকায় কাউরুর চোখে ওরকম উদ্ভট লাগে।

BanglaBook.org

বাবার শত্রুর ওপর হঠাৎ খুব রাগ হলেও, ধীরে ধীরে সেটাকে সরিয়ে দিয়ে নমুনার দিকে মন দিল কাউরু।

আকারে বড় করার মাত্রা বাড়িয়ে দেখল, কোষগুলো জড়ো হচ্ছে। লম্বাটে, সরু, দুর্বল, স্বচ্ছ. ঘন হয়ে আছে, সবুজ একটা দাগের মতো। এটা ওদের স্বাভাবিক রঙ নয়, মাইক্রোস্কোপে সবুজ ফিল্টার লাগানো আছে।

মসৃণ, সুশৃংখল স্বাভাবিক কোষ হলে সব জায়গায় সমান হারে ছড়িয়ে থাকত, তাদের কোনো অঙ্গ আলাদাভাবে চোখে পড়ত না, কিন্তু এই ক্যানসার কোষে এখানে-সেখানে খুব গাঢ় সুবজ ছায়া দেখা যাচ্ছে।

ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কাউরু: বিন্দুর সমষ্টি, বৃত্তাকারে চকচকে বুদ্বুদ তৈরি করছে। বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এই কোষগুলো।

মাইক্রোস্কোপের নীচে কয়েকবার ডিশ বদল করল কাউরু– স্বাভাবিক সেল আর ক্যানসার সেল, একটার সঙ্গে আরেকটা তুলনা করছে। পিঠ বা উপরিভাগ খুবই আলাদা, সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে: ক্যানসার সেল নোংরা আগোছাল চেহারা নিয়ে উপস্থিত।

তবে শুধু সেলের সারফেসই পরীক্ষা করতে পারছে কাউরু, কারণ অপটিকাল মাইক্রোস্কোপ এত শক্তিশালী নয় যে ওগুলোর নিউক্লিয়াস কিংবা ডিএনএ পরীক্ষা করতে পারবে।

তারপরও, ক্লান্তিহীন তাকিয়ে আছে কাউরু। এরকম একটা ধারণায় মন ভার হয়ে আছে যে সে আসলে নিজের সময় নষ্ট করছে: ওগুলোকে বাইরে থেকে দেখে কি শিখতে পারবে বলে আশা করছে সে? তবু, নিজেকে তিরস্কার করতে করতে, ওগুলোর প্রতিটির বাইরের অঙ্গ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সে।

উপরিভাগে [সারফেস] সব সেল একই রকম দেখতে। হুবহু একই চেহারা নিয়ে হাজার হাজার মুখ, সব এক সারিতে।

সব মুখ হুবহু এক।

মাইক্রোস্কোপ থেকে মাথা তুলল কাউরু।

একেবারে কিছু না ভেবেই, সেলগুলোকে মানুষের মুখের সঙ্গে তুলনা করেছে সে। তবে দেখতে ওগুলো ওরকমই: একই মুখ সংখ্যায় কয়েক হাজার গুণ, এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে পরিণত হচ্ছে একটা দাগে।

কিছুক্ষণ ওগুলোর দিকে না তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে কাউরুকে।

এই চেহারা আমাকে কে দেখাল?

আমার ষষ্ঠইন্দ্রিয় বা অন্তর্জ্ঞান।

এর পেছনে কি কোনো উদ্দেশ্য আছে?

এই প্রশ্নটাই সবার আগে বিবেচনা করতে হবে। বাবা ওকে শিখিয়েছে ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের প্রতি কীভাবে খেয়াল রাখতে হয়।

BanglaBook.org

এরকম প্রায়ই ঘটে যে কাউরু হয়তো বই পড়ছে, কিংবা রাস্তায় হাঁটছে, হঠাৎ সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একটা দৃশ্য চলে এলো ওর মনের চোখে। সাধারণত খুঁজে দেখা হয় না কেন এমন হয়।

ধরা যাক রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় একটা পোস্টারে সিনেমা জগতের একজন তারকাকে দেখতে পেল কাউরু। হঠাৎ করে পরিচিত এক ব্যক্তির কথা মনে পড়ে যেতে পারে ওর, যার সঙ্গে ওই তারকার চেহারার মিল আছে। পোস্টারের ওই ছবি যদি ওর চোখে না পড়ত, খুবই সম্ভব ছিল সেটা, ওর মনের পরদায় চলে আসা পরিচিত ব্যক্তির ছবি তখন মনে হত আকাশ থেকে পড়েছে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের এধরনের ব্যাখ্যাহীন কাণ্ডের কোনো অর্থ আছে কিনা জানার জন্যে গোটা ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কাউরুকে X200 মাইক্রোস্কোপের নীচে ফেলে ক্যানসার সেল দেখছিল ও, এই সময় কিছু একটার বোতাম কিছু একটা টিপে দিয়েছে, যাতে ওর চোখে সেলগুলো দেখতে মানুষের মুখের মতো লাগে।

এখন: সেটার কি কোনো অর্থ আছে?

চিন্তা-ভাবনা থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই কাউরু আবার মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগাল।

কিছু একটার প্ররোচনায় তুলনা করার চিন্তাটা ওর কল্পনায় ঢুকেছিল। সরু সেলগুলোকে নিজ এলাকার ভেতর স্তূপ হতে দেখছে সে। চকচকে খুদে গোলক।

একই কথা আবার বিড়বিড় করল কাউরু।

এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, ওদের সবার মুখ একরকম।

শুধু তাই নয়, এটা পরিষ্কার পুরুষের মুখও নয়, অন্তত ওর কল্পনায় নয়। ওকে যদি বেছে নিতে বলা হয়, ও বলবে, কেন যেন এটাকে মেয়ে মেয়ে লাগছে। ডিম আকৃতির গড়ন, মুখ সুগঠিত, মসৃণ ত্বককে পিচ্ছিলও বলা যায়।

এটা খুব অবাক করা রহস্য। ফেইজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে যতবার কোষগুলোর দিকে তাকিয়েছে ও, ভুলেও কখনও ওর মনে হয়নি ওগুলো মানুষের মতো দেখতে।

অথচ...

BanglaBook.org

ছয়

একটা হাসপাতালের কামরায় রিয়োজির মুখোমুখি বসে আছে কাউরু, তবে ওর মন পড়ে আছে বাথরুম থেকে ভেসে আসা শব্দের দিকে। কিছুক্ষণ হলো ওখানে আছে রাইকো, কলের পানি ছেড়ে দিয়ে।

সে শাওয়ার নিচ্ছে না, হতে পারে অন্তর্বাস ধুচ্ছে। রিয়োজিকে পড়ানোর সময় লক্ষ করেছে কাউরু, শুকানোর জন্যে কামরার ভেতর ঝুলিয়ে রাখা অন্তর্বাস ব্যস্ত হাতে নামাচ্ছিল রাইকো।

কাউরু অন্যমনস্ক, ওর বাবার অবস্থা সম্পর্কে রিয়োজির প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। সংক্ষেপে একটু বলল, কিন্তু রিয়োজির মুখভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না, আরও শুনতে চায়। হতে পারে ওর বাবার অসুস্থতা সম্পর্কে বিশদ শুনে নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চাইছে ছেলেটা। সব রোগীই জানতে চায় এই অসুস্থতা কোথায় তাকে নিয়ে যাবে।

ওর বাবার ক্যানসার সম্ভবত ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছেছে, রিয়োজি এটা আন্দাজ করতে পারার আগেই আলোচনাটা থামিয়ে দিল কাউরু। ওর ইতস্তত বোধ করার একটা কারণ হলো, তথ্যটা রিয়োজির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে; তবে তারচেয়েও বড় কারণ, কথাটা উচ্চারণ করতে চায় না কাউরু।

ক্যানসার ফুসফুসে পৌঁছে গেছে, এই ভয় পাওয়ার পর দুর্বলতার লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করল হাইডিউকির চেহারায়। এই প্রথম প্রসঙ্গটা তুললেন, তিনি চলে গেলে কি হবে। বলছেন, কাউরুর ওপর তাঁর আস্থা আছে, সে তার মার দেখভাল করতে পারবে।

মাচিকে দেখে রেখো, ঠিক আছে!

এরকম দুর্বলতা আর অসহায়ত্ব চাক্ষুষ করে বাবার প্রতি খুব রাগ হলো কাউরুর, ওর ইচ্ছে হলো সেই রাগ প্রকাশও করে। *তুমি মারা গেলে আমার পক্ষে কীভাবে মাকে সান্ত্বনা দেয়া সম্ভব,* বলতে ইচ্ছে করল ওর। *এসব অসম্ভব কাজ আমার ওপর চাপানো বন্ধ করো তুমি!*

এখন বাবার অবস্থা রিয়োজিকে জানানোর সময়, হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে সে-ও, কাউরুর মনের পরদায় বাবার ছবিটা ভেসে উঠল, সেই সঙ্গে নিজের অজান্তেই ধরে এল গলাটা।

খেয়াল করেনি কাউরু চুপ করে গেছে, ব্যথাটা সম্পর্কে অসচেতন রিয়োজি কি এক কারণে জোর করে হেসে উঠল।

'এখন ভাবতে গিয়ে, হঠাৎ, কাউরু, আমার মনে হচ্ছে আপনার বাবার সঙ্গে আমার একবার কথা হয়েছে।'

একই রোগ নিয়ে দুজনেই ওরা হাসপাতালে বার বার আসা-যাওয়া করেছে। সব মিলিয়ে জায়গাটা যত বড়ই হোক, ওদের দেখা হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

'তাই নাকি?'

'লম্বা গড়ন, ৭-এর খ-তে আছেন, ঠিক?'

'হ্যাঁ, তিনিই।'

BanglaBook.org

'বেশ শক্ত-পোক্ত, ঠিক? সব সময় হাসিখুশি থাকেন, নার্সদের পেছনে চাপড় মারছেন, এটা করছেন, সেটা করছেন।'

সন্দেহ নেই এই লোক হাইডিউকিই বটে। হাস্যকৌতুক পুরো মাত্রায় ধরে রেখে যেভাবে তিনি নিজের অসুস্থতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তাতে রোগীদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে একটা কুখ্যাতি-সুখ্যাতি যাই বলা হোক ছড়িয়েছে। ইনি আশা ছাড়তে জানেন না।

তারা বলছে, ভদ্রলোককে এরকম হাসিখুশি দেখে, মৃত্যুকে এতটুকু ভয় না পাওয়ায়, যাদের বাঁচার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ তারাও অনুপ্রাণিত হয়ে জুয়া খেলার মানসিকতা অর্জন করছে।

এক এক করে পেট, বৃহদন্ত আর যকৃৎ হারিয়েছেন হাইডিউকি; ক্যানসার এখন বোধহয় তাঁর ফুসফুসেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সময়, মনে হচ্ছে, এসে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, লোকজনের সামনে যেরকম হাসি -আনন্দে ভাসতে দেখা যায় তাঁকে সেটা তিনি সত্যি সত্যি অনুভব করেন বলে বিশ্বাস করা যায় না।

একমাত্র ব্যতিক্রম, তিনি যখন কাউরুর সঙ্গে থাকেন: শুধু তখন তিনি নিজের দুর্বল দিকটা দেখার অনুমতি দেন...

'আপনার মার ব্যাপারটা, কাউরু? তিনি কেমন আছেন বলুন,' জানতে চাইল রিয়োজি, ওর মধ্যে খুব একটা উদ্বেগ নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো রাইকো, ধোয়া কাপড়গুলো দ্বিতীয় খাটে রাখল, তারপর আবার ফিরে গেল বাথরুমে।

কাউরুর চোখ অনুসরণ করল তাকে। কিন্তু বাথরুমের ভেতর থেকে প্রত্যাশিত পানির আওয়াজ এখন আর ভেসে আসছে না। যেন মনে হচ্ছে কামরার চেয়ে বাথরুমে থাকতেই বেশি পছন্দ করছে রাইকো। হতে পারে ওদের আলোচনার বিষয় হিসেবে কাউরুর মা চলে এসেছেন, সেটাই কারণ।

যে-সব ডাক্তাররা হাইডিউকিকে দেখছিলেন তাঁরা বলেছেন রক্ত ছাড়াও অন্যান্য শারীরিক রসের দ্বারা মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস ছড়াতে পারে।

কথাটা শোনার পর মাকে নিয়েই প্রথম ভয় পেয়েছে কাউরু। সে ধরে নিয়েছে ঝুঁকি সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করার পর তাঁরা আর মিলিত হচ্ছেন না, তবে এরকম একটা ভয়ও আছে যে তার আগেই হয়তো ওর মা ভাইরাসটার সংস্পর্শে এসেছেন।

অবশেষে, মাত্র কিছুদিন আগে, রক্ত পরীক্ষা করাতে মাকে রাজি করতে পারল কাউরু।

রেজাল্ট পাওয়া গেল পজিটিভ।

ম্যাচিকোর মধ্যে এখনও কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায়নি বটে, তবে এটা একটা

BanglaBook.org

নিরেট সত্য যে এমএইচসি [MHC] ভাইরাস এরইমধ্যে তাঁর ডিএনএ [DNA]-তে ঢুকে পড়েছে। আরেক ভাষায়, তাঁর কোষের ক্রোমজোমে রেট্রোভাইরাসের বেইস সিকোয়েন্স নিগমবদ্ধ হয়েছে।

ওই মুহূর্তে, প্রক্রিয়াটি ওই পর্যায়ে থেমে ছিল, তবে যে-কোনো সময় তাঁর কোষ ক্যানসারে পরিণত হতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, এরইমধ্যে তা শুরু হয়ে যাওয়ার সব রকম সম্ভাবনা আছে, শুধু এখনও সেটা বাইরে প্রকাশ পায়নি।

যে মেকানিজম সিদ্ধান্ত নেয় ক্রোমজোমের সঙ্গে সংযুক্ত প্রোভাইরাস কখন কিংবা কীভাবে কোষকে ক্যানসারে পরিণত করবে, তা এখনও বোধগম্য নয়। কাজেই এই পর্যায় থেকে রোগটা সম্পর্কে আগাম কিছু সঠিকভাবে জানানো যাচ্ছে না! তবে সেটা যখন পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছুবে, ওর মার কোষ নতুন এমএইচসি ভাইরাস কপি উৎপাদন শুরু করবে।

আমি যদি অসুস্থ হইও, অপারেশন করাতে রাজি নই, রেজাল্টের কথা শুনেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ম্যাচিকো

মেট্যাসটাটিসকে থামাবার যেহেতু কোনো উপায় নেই, শুরু থেকেই সবার বোঝা হয়ে গেছে সার্জারি নিষ্ফল একটা চেষ্টামাত্র। রোগটার আগে বাড়া শ্লথ করতে পারে অপারেশন, সারাতে পারে না।

স্বামীকে ওভাবে ভুগতে দেখার পর, নিজের শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে কাটতে দিতে প্রবল আপত্তি আছে ম্যাচিকোর।

মাকে আধ্যাত্মিক শক্তির দিকে সরে যেতে দেখে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল কাউরু। ম্যাচিকো বলছেন, আধুনিক ওষুধ-পত্র যদি তাঁকে সুস্থ করতে না পারে তাহলে অন্য কোথাও থেকে তিনি তাঁর মিরাকল খুঁজে নেবেন।

সত্যিকার অর্থে নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবছেন না ম্যাচিকো, যদিও তিনি জানেন একদিন তাঁর ভেতরও ক্যানসার ধরা পড়বে। যাকে তিনি রক্ষা করার কথা সারাক্ষণ ভাবছেন, তাঁর সেই স্বামী জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন।

যে প্রচণ্ড মোহ শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিতে হলেও চোখের পলক ফেলবে না, বুকের ভেতর সেটা নিয়ে উত্তর আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ওপর প্রাচীন লেখা পড়তে শুরু করলেন ম্যাচিকো । কে জানে কোত্থেকে গাদা গাদা বই এসে তাঁর টেবিলে স্তূপ তৈরি করছে।

পৌরাণিক জগতে ক্যানসার ভালো করার চাবি রয়ে গেছে, জোর দিয়ে বলছেন ম্যাচিকো , প্রায় প্রলাপ বকার সুরে।

বাথরুম থেকে আবার পানি ছাড়ার আওয়াজ ভেসে এলো। রিয়োজির প্রতিক্রিয়া—ওদিকে একবার তাকাল সে।

'আমার মা একজন ক্যারিয়ার,' নিচু গলায় বলল কাউরু।

BanglaBook.org

'ওহ্। তাহলে আপনিও কি....

কথাটা রিয়োজি কোনো আবেগ ছাড়াই জিজ্ঞেস করেছে, উত্তরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কাউরু। মাস দুয়েক আগে সে তার রক্ত পরীক্ষা করিয়েছে, রেজাল্ট এসেছে নেগেটিভ।

উত্তর শুনে সত্যি সত্যি হেসে উঠল রিয়োজি। তবে তা কাউরু সংক্রমিত না হওয়ার স্বস্তিতে নয়। ওর হাসির মধ্যে বরং তিরস্কার রয়েছে, সে যেন করুণা করছে কাউরুকে

তার দিকে কঠিন চোখে তাকাল কাউরু।

'তুমি এর মধ্যে মজার কী পেলে?'

'আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

'আমার জন্যে?' নিজের দিকে আঙুল তাক করল কাউরু, জবাবে ওপর-নীচে দুবার মাথা ঝাঁকাল রিয়োজি।

'হ্যাঁ। আপনি শক্ত-পোক্ত আর স্বাস্থ্যবান, কাজেই আপনি সম্ভবত অনেক দিন বাঁচবেন বলে ধরে নেয়া যায়! ব্যাপারটা নিয়ে স্রেফ ভাবছিলাম...'

মোটরসাইকেলে চড়ার একটা নেশা ছিল বাবার, সেটার প্রভাবে মোটোক্রসের দিকে ঝুঁকেছে কাউরু। হাইডিউকির কাছ থেকে শিক্ষা আর নির্দেশনা পাওয়ায় নাম লেখানো প্রতিটি রেসে আগের বারের চেয়ে ভালো করছে সে।

যেরকম দর্শনীয় পেশিবহুল শরীর নিয়ে বেড়ে উঠেছে কাউরু, কাউকে বিশ্বাস করানো মুশকিল ওর ছেলেবেলা কেটেছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কমপিউটার নিয়ে। এমনকি টি-শার্ট ভেদ করেও ওর পেশি দেখা যায়, অথচ এই হাড্ডিসার ছেলেটা ওকে করুণা করছে। কাউরুর মনে হলো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছু একটাকে বিদ্রূপ করে হাসছে রিয়োজি।

ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

'তুমি যেমন ভাবছ বলে মনে হচ্ছে, বেঁচে থাকাটা তত খারাপ কিছু নয়,' বলল কাউরু।

কাউরুর একটা অংশ ঠিকই রিয়োজির এই আচরণের কারণ বুঝতে পারছে। ওর জানা নেই কবে বা কীভাবে সংক্রমিত হয়েছে সে, কিন্তু মাত্র বারো বছরের একটা ছেলেই তো–যার সময় খেলাধুলো আর আনন্দ-ফূর্তির মধ্যে কাটছে না, কারণ একে তো শরীরে শক্তি নেই, তার ওপর ব্যস্ত থাকতে হয় সার্জারি, কেমোথেরাপি এবং বারবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝক্কি সামলাতে; ওর জীবনটা অনন্ত ভোগান্তির একটা অভিশপ্ত বৃত্ত ছাড়া কিছু নয়।

কাউরু বোঝে কেন রিয়োজি তার বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতা থেকে এই পরিস্থিতিকে সরলীকরণ করতে চাইছে: সবার অনুভূতি অবশ্যই তার মতো হতে হবে।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তা ঠিক আছে, কিন্তু আসলে কেউ কি বাঁচবে? সবাইকেই তো মরতে হবে।' রিয়োজি তার শূন্যদৃষ্টি সিলিংয়ের দিকে তুলল। কাউরুর আর ওর সঙ্গে তর্ক করার মন নেই।

মৃত্যু সব জায়গায় সবকিছু ভরে দেয়

যার অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝবে না কেমোথেরাপির কি কষ্ট। প্রচণ্ড বমি পাবে। খিদে পাবে না। জোর করে যদি বা কিছু খেতে পারলেন, খুব তাড়াতাড়ি আবার তা বের করে দেবেন। ঘুম বলতে কিছু পাবেন না। এই হলো রিয়োজির জীবন, এবং এভাবেই অদূর ভবিষ্যতে ওর জীবনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে। কাউরু এসব জানে। এসব মাথায় রেখে কি-ই বা ওর বলার থাকতে পারে?

ক্লান্ত লাগছে ওর তবে সেটা শারীরিক অবসাদ নয়। যেন শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিৎকার করছে ওর হৃৎপিণ্ড। ও খেপে উঠতে চাইছে। মুক্ত-স্বাধীন হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা হাসি হাসতে চাইছে।

আবার ইচ্ছে করছে কাঁদে।

আরেকজন মানুষ দরকার কাউরুর। উষ্ণ একটা শরীর। শারীরিক সঙ্গ, সান্নিধ্য আর স্পর্শ ছাড়া ওর বাঁচা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোথাও পাব তাকে আমি? নিজেকে প্রশ্ন করল কাউরু।

'প্রথম কথা হলো, আমি কখনও জন্মাতে চাইনি,' বলল রিয়োজি, কাউরু সাড়া না দেয়ায় কিছু মনে করছে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রাইকো, যেন রিয়োজির কথাটার অনুরণন হয়ে। মুখের ভাবে এতটুকু পরিবর্তন না ঘটিয়ে কামরাটা পার হলো সে, বেরিয়ে গেল বাইরের করিডরে।

আমাকে তুমি নিলে কেন?

রাইকো চলে গেল, কারণ সে হয়তো ছেলের এই অভিযোগ সইতে পারবে না, কিংবা হয়তো বাইরে তার কোনো কাজ আছে। তাই বলে কারও দিকে একবারও না তাকিয়ে?

বলা মুশকিল।

তবে তার প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর নজর রাখছে কাউরু। এখন ওর মাথায় দুটো প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন, রাইকো কি এমএইচসি ভাইরাসে সংক্রমিত? দ্বিতীয় প্রশ্ন, রিয়োজি কোন পথে সংক্রমিত হয়েছিল?

এসব প্রশ্ন কাউরু সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারে না, তাতে পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাবে।

'এবার বোধহয় উঠতে হয় আমাকে।' রিয়োজিকে আর সময় দিতে পারছে না কাউরু। তাছাড়া, ওর ইচ্ছে হচ্ছে রাইকোর পিছু নেয়।

রিয়োজির বিছানা ছেড়ে করিডরে বেরোবার দরজা খুলল কাউরু। রাইকোর

BanglaBook.org

সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে ও, শারীরিক অর্থে তো বটেই, তার মনের ভেতরে যা কিছু আছে সেগুলোর সঙ্গেও।

কে জানে, রাইকোর প্রতি ওর যে বিপুল আগ্রহ, এটাকেই হয়তো প্রেম বলে। ওর জানা নেই। ও শুধু জানে হাসপাতালের বদ্ধ কামরা থেকে ওই নারীই এই খোলা দুনিয়ায় বের করে এনেছে ওকে।

এভাবে প্ররোচিত হয়ে হাসপাতালের দীর্ঘ করিডর ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটছে কাউরু, রাইকোকে খুঁজছে।

সাত

কাউরুর একটা ধারণা আছে কোথায় রাইকোকে পাওয়া যাবে। অন্তত ওর তাই মনে হচ্ছে।

আজকাল আমার একমাত্র শান্তি হাসপাতালের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে শহর দেখা।

কয়েকদিন আগের এক সন্ধ্যা, হাসপাতালের মাথার ওপর সেই রেস্তোরাঁর বাইরে, কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে রাইকোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাউরু জিজ্ঞেস করেছিল, কী করছেন। তার উত্তরে এই কথাটা বলেছিল রাইকো।

সূর্য অস্ত যেতে আর খুব বেশি দেরি নেই, সোনালি কিরণ আকাশ ছোঁয়া প্রতিটি ভবনের শুধু রেখাগুলোকে ফুটিয়ে তোলায় ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে, দৃশ্যটায় আরামপ্রদ একটা ভাব চলে এসেছে।

কাউরু জানে পাখির চোখ দিয়ে শহরের ওপর চোখ বুলানোর এটাই আদর্শ সময় রাইকোর।

সতেরো তলায় উঠে এলিভেটর থেকে নামল। হলওয়েতে পৌঁছে বাঁ দিকে তাকাতেই দেখতে পেল এক তরুণী ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে। কথা না বলে সেদিকে এগোল কাউরু, যতক্ষণ না দুজন পাশাপাশি হলো।

অস্তগামী সূর্য টকটকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে রাইকোর মুখ। ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া আকাশের আভা প্রতিফলিত হয়ে ওর গাল দুটোকে এমন মারাত্মক লোভনীয় করে তুলল যে সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না কাউরু।

পৌঁছুনো মাত্র ওর উপস্থিতি টের পেয়েছে রাইকো, কাঁচে ওর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে। ঠোঁটে অস্পষ্ট একটু হাসি নিয়ে কাউরুর ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে রাইকো।

'আমি দুঃখিত।'

BanglaBook.org

কাউরু ঠিক ধরতে পারছে না কি জন্যে ক্ষমা চাইছে রাইকো। হয়তো সামলানো কঠিন এমন একটা ছেলেকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ায়। তবে সেজন্যে শুধু ধন্যবাদ বলাটাই কি মানানসই হত না?

কি বলবে ভেবে না পেয়ে বিব্রত হচ্ছে কাউরু ঠিক করল ক্ষমা চাওয়ার কারণটা জানতে চাইবে না। 'আপনি দেখতে পাচ্ছি সত্যি উঁচু জায়গা পছন্দ করেন।'

'করি। কি জানি, এর কারণ আমি হয়তো আমার সারাটা জীবন মাটি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছি।'

ও কি বোঝাতে চাইছে, সব সময় একতলা বাড়িতে বসবাস করছে? তা যদি হয়, কাউরুর নিজের আবাসিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ উল্টো সেটা! এখনও মার সঙ্গে সেই অ্যাপার্টমেন্ট টাওয়ারে বাস করছে ও, যেখান থেকে টোকিও বে দেখা যায়।

পরিবেশ হালকা করার জন্যে প্রসঙ্গ বদল করল রাইকো, উৎসাহভরা গলায় নিজের স্বপ্নের কথা বলছে।

কোনো ভূমিকা ছাড়াই দ্রুত শুরু করল রাইকো, তার ছেলে সুস্থ হওয়ার পর প্রথমে কি করতে চায়। শর্তটাই–ছেলের সুস্থতা–একটা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই অবাস্তব স্বপ্ন যেটা তার দেখতে ইচ্ছে হয় দেখুক গে। বাস্তবের কাছাকাছি যে-সব আইডিয়ার কথা বলল তার মধ্যে একটা বেশ ভালোই লাগল কাউরুর–বিদেশে কোথাও বেড়াতে যাবে।

তারপর রাইকো জানতে চাইল, 'এবার বলো, তোমার স্বপ্ন কী?'

মাথাতেই ছিল, কিছু চিন্তা করার দরকার হলো না, স্থগিত হয়ে থাকা পারিবারিক সেই বেড়ানোর কথাটা বলল কাউরু, দশ বছর আগের প্ল্যান। 'উত্তর আমেরিকায় যেতে চাই, মরুভূমিতে।'

দশ বছর আগের সেই রাতের খুঁটিনাটি অনেক কথাই সংক্ষেপে রাইকোকে শোনাল কাউরু–আয়ুর সঙ্গে মহাকর্ষের সম্পর্ক, জীবনের রহস্য, তারপর কীভাবে তাদের আলোচনা লঞ্জেভেটি জোনস সত্যি আছে কিনা এই প্রশ্নে গিয়ে থেমে যায়।

তারপর সরল ভাষায় কাউরু ব্যাখ্যা করল কীভাবে হাইডউকি ওকে মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পৃথিবী জুড়ে লঞ্জেভেটি জোনসের প্যাটার্ন সম্পর্কে ওর আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তারপর ওর বাবার ক্যানসার ধরা পড়ল। তাতে আরও গভীর গবেষণায় ডুবে গেল সে, এবং সেই সঙ্গে তার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নিল যে লঞ্জেভেটি জোনস আর ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও একটা সম্পর্ক আছে।

এই কথাটা শুনে আগ্রহী হয়ে উঠল রাইকো। কাঁচের গায়ে যেমন হেলান দিয়ে ছিল তেমনি থাকল, শুধু ঘাড় ফিরিয়ে কাউরুর দিকে তাকাল সে।

BanglaBook.org

'কী ধরনের সম্পর্ক?'

'এখনও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই; তবে পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট কিছু অদ্ভুত জিনিস দেখাচ্ছে, যেগুলো এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।'

রাইকো কান পেতে অপেক্ষা করছে বুঝতে পেরে আবার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল কাউরু।

'সেই রাতে আমার গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালিজ এবং লঞ্জেভেটি জোনসকে এক করে দেখার ব্যাপারটা শুধু একটা কোইন্সিডেন্স ছিল না। একটা ঝলকের মতো আমার ভেতর অন্তর্জ্ঞান চলে আসে। বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের পথনির্দেশ পাওয়াতেই সম্ভব হয়েছে। যদি বলি ওই রাতে আমি যেন কোনো ধরনের সাজেশনের প্রতি সাড়া দিচ্ছিলাম, তাহলে বোধহয় কিছু ভুল বলা হবে না।

'বাবার ক্যানসার যখন লিভারে ছড়াল, গোটা পৃথিবীর লঞ্জেভেটি জোনস নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম আমি। ব্যাপারটা শুধু আমার কল্পনা ছিল না। নিশ্চিত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেল: পৃথিবী জুড়ে এমন বহু জায়গা আছে যেখানে মানুষ বেশিদিন বাঁচে। সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমি। কোথাও কোনো মিল থাকলে, আমার চোখে নিশ্চয়ই তা ধরা পড়বে।

'সংখ্যা কমিয়ে একসময় আমি মাত্র চারটে লঞ্জেভেটি জোনসকে বেছে নিলাম, সবগুলো নামকরা: আবখাজিয়া, কৃষ্ণসাগরের তীরে একটা ককেসীয় এলাকা; ভিলকাবামবা, পেরু আর ইকুয়েডরের মাঝখানে পবিত্র একটা উপত্যকা; হুঞ্জা, কারাকোরাম আর হিন্দুকুশ পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটা পার্বত্য এলাকা, আশপাশের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; এবং সানারু দ্বীপ, জাপানের সামেইজিমা আর্কিপেলাগো। তদন্ত করার জন্যে আমি নিজে এসব জায়গায় যেতে পারিনি, তাই এ বিষয়ে ওগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন যা কিছু পেয়েছি সব পড়েছি, তারপর নিজে একটা পরিসংখ্যান বের করেছি। তা করতে গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল। জানি এখনই চূড়ান্ত রায় দিয়ে ফেলাটা সময়ের আগে হয়ে যাবে, তবে মনে হচ্ছে এসব জায়গার কোথাও একটাও ক্যানসারে মৃত্যু নেই। না, আপনার শুনতে ভুল হচ্ছে না—এসব জায়গায় ক্যানসারে মারা যায়নি কেউ। সারা পৃথিবী থেকে ডাক্তার আর বায়োলজিস্টরা লঞ্জেভেটি জোনসে গিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তৈরি করেছেন অসংখ্য রিপোর্ট। সেগুলোর একটাতেও ক্যানসারে মারা গেছে এমন কোনো মৃত্যুর রেকর্ড নেই।

'প্রতিটি রিপোর্টে ক্যানসারের এরকম নিচু হারের জন্যে কৃতিত্ব দেয়া হয়েছে খাদ্য আর পানীয় গ্রহণের অভ্যাস, অর্থাৎ ডায়েটকে। তবে সেটা নেহাতই একটা অনুমান মাত্র, কারণ যে-মেকানিজম থেকে ক্যানসারের উদ্ভব বা উৎপত্তি সেটাকে এখনও আমরা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারি না। এ-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে এ-সব এলাকার মানুষ খুব সাধারণ খাবার খায়, তার মধ্যে

BanglaBook.org

বেশিরভাগ থাকে শাকসব্জি আর শস্যদানা, কিন্তু একই সঙ্গে এমন তথ্যও পাচ্ছি যে অন্য এলাকার চেয়ে ওসব জায়গার মানুষ বোধহয় তামাক ও মদ বেশি গ্রহণ করছে। অনন্ত এ-কথা আমরা বলতে পারছি না, যে-সব পদার্থ ক্যানসার সৃষ্টির জন্যে দায়ী সেগুলোর সংস্পর্শে স্বাভাবিকের চেয়ে কম আসছে তারা।

'এগুলো আমাকে ভাবিয়েছে। এসব লঞ্জেভেটি জোনসে এত কম লোক কেন ক্যানসারে ভোগে? তারপর...শুনুন এটা। স্বাভাবিক সেলকে অমর করার সামর্থ্য আছে ক্যানসার সেলের। এর সঙ্গে কি ওই ব্যাপারটার যোগাযোগ আছে? তাছাড়া, যে-সব এলাকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অস্বাভাবিক কম সেগুলোর সঙ্গে এসব লঞ্জেভেটি জোনস নিখুঁত খাপ খাচ্ছে, এটাই বা আমরা ব্যাখ্যা করব কীভাবে?

'সন্তুষ্ট করতে পারে এমন ব্যাখ্যা থাকতে হবে প্রতিটির, কিন্তু এখনও আমি সেগুলো বের করতে পারিনি।'

দম নেয়ার জন্যে থামল কাউরু। কথা বলার সময় ওর উত্তেজনা অনেক বেড়ে গেছে।

'হঠাৎ করে সব জায়গায় এমএইচসি ভাইরাস দেখা যাচ্ছে কেন– কোত্থেকে এল এটা?'

রাইকোর প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছে না কাউরু।

'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

চোখ বড় হয়ে ওঠায় বিচলিত দেখাচ্ছে রাইকোকো, বোঝা যাচ্ছে উত্তরটা ওর জানা দরকার। এই মুহূর্তে ওকে অসম্ভব আকর্ষণীয় মনে হলো কাউরুর। দুজনের বয়সের পার্থক্য দশ বছর, কথাটা ভুলে গেল ও, ইচ্ছে হলো রাইকোর গালে আলতো করে হাত রাখে, নিজের দিকে টেনে নেয় ওকে।

'হেসো না। চিন্তাটা কোত্থেকে জানি না হুট করে ঢুকে পড়ল আমার মাথায়–এই এমএইচসি ভাইরাস তোমার কোনো লঞ্জেভেটি জোনস থেকেও এসে থাকতে পারে। সত্যি কি পারে?'

রাইকো কোন পথে চিন্তা করছে আন্দাজ করতে পারল কাউরু। একবার একটা উপন্যাসে পড়েছিল সে, এক লোকের পুরো শরীর দখল করে নিয়েছে ক্যানসার, কিন্তু মৃত্যুর বদলে ক্যানসার তাকে অমরত্ব দান করল।

হতে পারে এসব এলাকার মানুষ ক্যানসারের সঙ্গে সহাবস্থান করতে শিখেছে, আর সেজন্যেই তারা এত বেশিদিন বাঁচছে।

বেশিরভাগ সম্ভাবনা রাইকোর কল্পনা এ লাইনেই এগোচ্ছে।

হতে পারে এসব এলাকা মোটেও ক্যানসার-মুক্ত নয়। হতে পারে বাস্তবে ওগুলো ক্যানসারে ভরাট হয়ে আছে। হয়তো শুধু ওই ক্যানসারে তারা কেউ মারা যাচ্ছে না। হতে পারে ক্যানসার ভাইরাস ওখান থেকে ছড়িয়েছে।

'হতে পারে একটা ভাইরাস কোনোভাবে এই লোকগুলোর ক্যানসার

BanglaBook.org

ক্রোমজোমে ঢুকে পড়ে, এবং তার ফলাফল পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছে মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস হিসেবে। এটাই আপনি বলতে চাইছেন?'

'এসব বুঝতে পারা আমার জন্যে খুব কঠিন, স্বীকার করছি। ওটা স্রেফ একটা চিন্তা ছিল, ভুলে যাও।'

মুখ ঘুরিয়ে আবার নীচের জগৎটা দেখছে রাইকো। কয়েক মিনিট হলো নাটকীয় ঢংয়ে রঙ বদলাচ্ছে আকাশ, আর সেই পরিবর্তন আরও উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটিয়েছে রাইকোর মুখের ভাব-ভঙ্গিমায়। ওর চোখের ভেতর গভীর ছায়া। বাইরে যত গাঢ় হচ্ছে পৃথিবী, জানালাটা আরও বেশি আয়না হিসেবে ভূমিকা রাখছে। কাঁচের গায়ে রাইকোর মুখের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে কাউরু, শরীরবিহীন অবস্থায় ওটা যেন অন্ধকারে ভাসছে।

'মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিশেষ করে জাপান আর আমেরিকাতেই বেশি।'

কথাটা সত্যি: গোলক জুড়ে আক্রান্তরা কারা কোথায় কতজন কীভাবে ছড়িয়ে আছে, তার ছবি দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় হারটা সমান বা একরকম নয়।

আমেরিকা আর জাপানে এই ভাইরাসে আক্রান্ত কমবেশি এক মিলিয়ন করে রোগী পাওয়া যাবে, আর উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলোয় আছে কয়েক লাখ, অথচ যে-সব এলাকাকে লঞ্জেভেটি জোনস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী নেই বললেই চলে। কাউরু দেখাবার চেষ্টা করছে রাইকোর হাইপথেসিসে ফুটো আছে।

'তুমি যে মরুভূমির কথা জানো, ওটার ব্যাপারে কী বলবে? উত্তর আমেরিকায়? ওখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অসম্ভব কম, কাজেই ওখানে মানুষ যদি বেশিদিন বাঁচে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তাই না?'

'ওটা স্রেফ একটা অনুমান।'

'তার মানে তোমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই।'

'আপনি বলতে পারেন এসবই আমার জন্যে একটা খেলা মাত্র।'

কথাটা শুনে যেন একটা ধাক্কা খেলো রাইকো। ওর চোখে-মুখে উৎসাহ হারিয়ে ফেলার ছাপ। 'ওহ্।' এবার ভ্রূ কোঁচকাল, ভাব দেখে মনে হলো কাউরুর দিকে পেছন ফিরতে যাচ্ছে।

'কী হলো?'

রাইকোর আকস্মিক পরিবর্তন অবাক করল কাউরুকে।

'আমি একটা মিরাকল আশা করছিলাম। একমাত্র ওটাই তো শুধু বাকি আছে,' বলল রাইকো, এখনও অন্যদিকে তাকিয়ে।

মিরাকল, হতাশ মনে ভাবল কাউরু ওর মার মতো সেই একই ফাঁদে পড়তে

BanglaBook.org

যাচ্ছে রাইকো।

'আমি মনে করি অলৌকিক কিছু ঘটার অপেক্ষায় থাকা ঠিক নয়।'

'আমি থাকব।'

'আপনার আরও অনেক কিছু করার দরকার আছে।'

কাউরু চাইছে সতর্কতা এবং বুদ্ধি, দুটোই নিজের ভেতর ধরে রাখুক রাইকো। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কথা শুনছে না সে।

'আমি শুধু ভাবছিলাম, ওসব লঞ্জেভেটি জোনসে যারা বসবাস করছে তাদের সবারই হয়তো এক পর্যায়ে ভাইরাল ক্যানসার হয়েছিল। কিন্তু ক্যানসার সেল তাদের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দখল নেয়ার আগে, কোনো একটা ফ্যাক্টর ওগুলোর সেলকে অমর করে দিল, সেই সঙ্গে শত্রু ক্যানসার হয়ে উঠল বন্ধু ক্যানসার। ওটার খারাপ দিকগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এবং মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করার যোগ্য হয়ে উঠল ক্যানসার। ওদের সেল আরও বেশি মাত্রায় বিশদ কোষ বিভাজনের [মাইটোসিস] সামর্থ্য অর্জন করল, যার ফলাফল হলো বেশিদিন বাঁচা। থিয়রি হিসেবে কেমন এটা?'

রাইকোকে আগে কখনও এভাবে কথা বলতে শোনেনি কাউরু, ওর কল্পনাতেও এরকম কিছু ছিল না। যুক্তি দিয়ে কথা বলছে সে, ফলাফল তাকে কতটুকু আশা করার অনুমতি দেয় তার ওপর ভিত্তি করে। তবে ওর এই অলস চিন্তা-ভাবনার ফসল গল্পের রসদ যোগাতে পারে মাত্র, কাউরু যদি ডাক্তার হতে চায় তাহলে এগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়ার সময় পাবে না সে।

কিন্তু রাইকোর জেদ সে তার কল্পজগতের ওপর বিশ্বাস সবটুকু শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

এটা যে তার প্রয়োজন আছে, কাউরু তা বোঝে এত কথা তার সঙ্গে বলাই বোধহয় ঠিক হয়নি ওর।

'প্লিজ, যা বলেছি আপনি স্রেফ ভুলে যান!'

'কী বলছ ভুলে যাব! তা আমি পারব না। যে জায়গায় তুমি যেতে চাইছ ওখানে কিছু একটা আছে। এমন একটা ফ্যাক্টর, যেটা ক্যানসারের নেগেটিভ বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধ্বংস করে দেয়, যেটা শত্রুর বদলে হয়ে ওঠে বন্ধু।'

হাত দুটো উঁচু করল কাউরু, ওকে যেন শান্ত করতে চাইছে, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। আগের চেয়েও বেশি উৎসাহ দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে।

'আমি মনে করি ওখানে যাওয়ার দরকার আছে তোমার—ওই জিনিসে তোমার হাত পড়া উচিত, মৃত্যুকে যেটা বদলে দিতে পারে জীবনে

'এবার এক মিনিট থামুন।'

রাইকোর মুখ ইতিমধ্যে কাউরুর সামনে চলে এসেছে, খপ করে ওর একটা হাত চেপে ধরল সে।

BanglaBook.org

'প্লিজ!' রাইকোর নরম স্পর্শ আবেগটাকে জোরাল করে তুলল।

'এই জীবন আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। আর কদিন পর রিয়োজি ওর চার নম্বর কেমোথেরাপি নেবে।'

'আমি জানি আপনার ওপর দিয়ে কী ঝড় বইছে।'

'যদি সম্ভব হয় তোমার সঙ্গে আমি যাব।'

ওই মুহূর্তে, যেটা শুরু হয়েছিল পারিবারিক ভ্রমণ হিসেবে, রূপ পাল্টে অন্য কিছুতে পরিণত হলো। রাইকোকে নিয়ে উত্তর আমেরিকায় বেড়াতে যাচ্ছে, এটা কল্পনা করতেই কাউরু অনুভব করল ওর ভেতরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

ফোর্থ কর্নার এলাকার সেই লো-গ্র্যাভিটি পয়েন্ট–যেন মনে হয় একটা গহ্বর, একটা ঘূর্ণিপাক, সমস্ত কিছু গ্রাস করে নিচ্ছে। ওকে টেনে নিচ্ছে লো গ্র্যাভিটি...না, এই মুহূর্তে কাউরুকে টানছে একজোড়া মায়াভরা চোখ।

খুব সামান্য লিপস্টিক ছাড়া আর কোনো মেকআপ ব্যবহার করেনি রাইকো, আর ওর শরীর থেকে যে সেন্ট বেরোচ্ছে সেটা মনে হলো ওর ত্বকের স্বাভাবিক গন্ধ। কাউরু আর রাইকোকে ঢেকে রেখেছে গাঢ় একটা ছায়া, হলওয়ের আলো বড় একটা পিলারে বাধা পেয়ে এদিকে ঢুকতে পারছে না। জানালাটা এখন নিখুঁত আয়না, মাঝে-মধ্যে করিডর ধরে দু'একজন যারা আসা-যাওয়া করছে তাদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটায়।

কি ঘটাচ্ছে বুঝতে পারার আগেই, হাতে অনুভব করা চাপ ফিরিয়ে দিল কাউরু। তারপর থেকে হাত হাতের সঙ্গে খেলছে, আঙুল আঙুলের সঙ্গে জড়াচ্ছে, আর চোখ দু'জোড়া পরীক্ষা করছে পরস্পরের উদ্দেশ্য।

করিডর থেকে শেষ পায়ের শব্দটা মিলিয়ে গেল দূরে, ওরা যেন সময়টা মাপছিল নীরবতা কখন ওদেরকে সুযোগ করে দেবে, সরে এসে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরল।

সুযোগটা ওরা গ্রহণ করেছে ঠিক যখন সতেরতলার করিডর খালি হয়ে গেছে। শরীরের ভেতর সবখানে রক্তভরা রগ আর শিরা দিয়ে বোনা জাল ছড়ানো আছে, সেই শরীরকে দু'জোড়া বাহু শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে। পরস্পরের পালস অনুভব করছে ওরা। পরস্পরের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। খাড়া হয়ে উঠল কাউরু, ওর ফোলন চাপ সৃষ্টি করছে রাইকোর নাভির ওপর।

রাইকোর ঠোঁট দরকার কাউরুর, তাই মাথাটা পিছিয়ে এনে চেষ্টা করল সঙ্গিনীর মুখটা ঘোরাতে; রাইকো সাড়া দিল না, তবে সঙ্গীর পিঠের আরও গভীরে নিজের আঙুল ঢোকাল।

কাউরুর চোয়ালে মুখ চেপে ধরল রাইকো, সঙ্গীকে বাধ্য করল মাথাটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে–যেন একটা প্রত্যয় নিয়ে চুমো খেতে বাধা দিচ্ছে কাউরুকে। বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টা করার পর কাউরু বুঝতে পারল ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

সে-ও সংক্রমিত।

জানা গেছে এমএইচসি ভাইরাস মুখের লালা থেকেও ছড়াতে পারে। রাইকো নিশ্চয়ই ওর নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্রত্যাখ্যান করছে ওকে। আজ সন্ধ্যায় তার আচরণের ব্যাখ্যা বোধহয় পেতে শুরু করেছে কাউরু।

এর আগে, রিয়োজি যখন বলল, 'প্রথম কথা হলো, আমি কখনও জন্মাতে চাইনি,' একটাও কথা না বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে রাইকো। হতে পারে মার গর্ভে থাকতেই সংক্রমিত হয়েছে রিয়োজি।

রিয়োজির এই কথার মধ্যে অভিযোগ আছে, শেষ পর্যন্ত সেটা সে প্রকাশও করল, আর রাইকোর মনে হলো ওখানে দাঁড়িয়ে এসব শোনা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে সংক্রমিত হওয়ার ভয় কাউরুর ভেতর জ্বলে ওঠা আগুনকে নেভাতে পারছে না। রাইকোর শরীর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, দু'হাতের নরম স্পর্শ দিয়ে আদর করছে ওর গালে, চোখের দৃষ্টি দিয়ে বলতে চেষ্টা করছে পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেছে সে, তারপর প্রত্যাখ্যান না মানার দৃঢ়তায় রাইকোর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল।

এবার রাইকো ওকে বাধাও দিল না।

রাইকোর ঘাড়ের পেছনে একটা হাত রাখল কাউরু, অপর হাতটা সঙ্গিনীর নিতম্বে, তারপর ওকে নিজের দিকে টানল। দুজনের এক হওয়ার ঝাঁকিটা এত তীব্র, ওদের দাঁত পরস্পরের সঙ্গে মৃদু ধাক্কা খেলো; একই সঙ্গে লালসায় ভরপুর একটা আওয়াজ তৈরি হলো, দাঁতের কাঠিন্য ছাড়াও তাতে তাল মেলাল দু'জোড়া ঠোঁটের পরস্পরকে খুঁজে নেয়ার ব্যস্ততা, আর লালার নিঃসরণ।

নিজেদের মুখ এক করে রাখল ওরা, একে অন্যের সমস্ত বাতাস টেনে নিচ্ছে। তারপর ওদের আবেগের তীব্রতা যখন আর সহ্য করার মতো থাকল না, ঠোঁট জোড়া বিচ্ছিন্ন হলো, এখন শুধু গালে গাল ঘষছে, পরস্পরের হাঁপানোর আওয়াজ শুনছে। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে যতটুকু পারা যায় উঁচু হলো রাইকো, ওর ঠোঁট যাতে কাউরুর কানের নাগাল পায়।

'প্লিজ,' বলল রাইকো, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

কাউরু ধরতে পারল না ওর কানের কাছে কম্পনটা ফোঁপানোর, নাকি হাঁপানোর।

রাইকো শুধু ওর ছেলেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে না; বাঁচতে চাইছে নিজেও।

'প্লিজ...হেলপ।'

'আমি ঈশ্বর নই

এর বেশি কিছু বলতে পারল না কাউরু, আর কিছু ওর বলার নেইও। উত্তেজিত শরীর আর যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে না পারা মন নিয়ে এই মুহূর্তে শুধু একটা জিনিসই পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, তা হলো, মৃত্যুর নিজস্ব এলাকায় প্রথম

BanglaBook.org

পা ফেলা হয়ে গেছে তার।

শরীরের চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করার ব্যাপারে কাউরুর মনে কোনো বিভ্রান্তি নেই, নেই এতটুকু অনুশোচনা। মুহূর্তটি যতবারই তার জীবনে আসুক, তাতে কিছু আসে যায় না, সব সময় এই একই সিদ্ধান্ত নেবে সে। রাইকোর শরীর এমন একটা শক্তির উৎস যার বিরোধিতা করা যায় না।

'প্লিজ। আমি জানি তুমি ওখানে যাবে।'

এখন রাইকোও ওকে সেই লো গ্র্যাভিটি জোনে যাওয়ার জন্যে খোঁচাচ্ছে। যে কাহিনির বীজ সে নিজের হাতে বপন করেছিল, যেটাকে আঙ্গিক দান করেছে রাইকো, এখন সেটা কাউরুর ভেতর শিকড় ছড়াচ্ছে।

আট

হাসপাতালে বাবার কামরায় ঢুকল কাউরু, ঠিক তখনই হাইডিউকির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর বন্ধু প্রফেসর সাইকি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'কি হে,' কাউরুকে দেখে বললেন প্রফেসর। একটা হাত তুললেন তিনি, যেন বোঝাতে চাইলেন এখনই চলে যাচ্ছেন।

'না, ঠিক আছে, আরেকটু বসুন আপনি।' কাউরু বিরক্ত হতে পারে ভেবে যদি চলে যাওয়ার কথা ভেবে থাকেন সাইকি, তাহলে তাঁকে বসতে বলাটা কর্তব্য বলে মনে করে সে।

'না, হে, বসতে পারছি না। তুমি তো জানোই কেমন ব্যস্ত আমি।'

'ও, হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে।'

'হ্যাঁ। বিশেষ একটা অনুরোধে একবার ঢু মেরে গেলাম,' বললেন সাইকি, হাইডিউকির দিকে তাকালেন। হাতটা আবার একবার তুললেন তিনি। 'পরে, তাহলে,' বলে চলে গেলেন। চোখ ফিরিয়ে তাঁর চলে যাওয়াটা দেখল কাউরু। তারপর বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'কেমন আছ, বাবা?'

এক মুহূর্ত চোখ নামিয়ে বাবাকে দেখল কাউরু, তাঁর মুখের রঙ পরীক্ষা করল, লক্ষ করল চোয়াল দুটো কীভাবে আছে, তারপর ধীরে ধীরে প্রফেসর সাইকির ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসল।

'খুব নার্ভাস। খুব খেপে আছি,' একঘেয়ে সুরে বললেন হাইডিউকি, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সিলিংয়ে।

'কী ঘটল?'

BanglaBook.org

'সাইকি। সে কখনও খারাপ ছাড়া ভালো কোনো খবর আনে না।'

সেই মেডিকেল স্কুল থেকে হাইডিউকির একজন পুরোনো ক্লাসমেট প্রফেসর সাইকি, তবে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের বদলে গবেষণাকে বেছে নেয়ায় হাইডিউকির কেসটার সঙ্গে তিনি সরাসরি জড়িত নন এটা আরও বেশি চিন্তিত করে তুলল কাউরুকে, প্রফেসর সাইকি আবার কি ধরনের খারাপ খবর আনতে পারেন।

'খুলে বলো।'

'মাসাটো নাকামুরাকে চেনো তুমি?'

হাইডিউকির গলা কর্কশ।

'তোমার বন্ধুদের একজন, ঠিক?'

নাকামুরা নামটা মনে আছে কাউরুর। লূপ প্রজেক্টে হাইডিউকির সহকর্মী ছিলেন তিনি। যতদূর জানে ও, একটা প্রাদেশিক ভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর হিসেবে আছেন ভদ্রলোক।

'সে মারা গেছে,' বললেন হাইডিউকি, ঝাঁজের সঙ্গে।

'ওহ্, সত্যি?'

'আমার আর তার একই অসুখ।'

কাউরু শুনেছে একই বয়সী কেউ মারা গেলে মানুষ নাড়া খাবেই, হয়তো স্মরণ করিয়ে দেয় এরপর আপনার পালা।

'তুমি এখনও ভালো আছ, বাবা।'

কাউরু এমন কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছে না যেটা শুনতে আলাদা কিছু মনে হবে। হাইডিউকি এরইমধ্যে বালিশে পড়ে থাকা মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়তে শুরু করেছেন, যেন বলতে চাইছেন অর্থহীন কথাবার্তা তাঁর কোনো উপকারে আসবে না

'কোমাতসুজাকিকে চেনো তুমি?'

'না।' এই নাম আগে কখনও শোনেনি কাউরু।

'সে আমার পরে লূপ প্রজেক্টে যোগ দেয়।'

'ওহ্?'

'সে-ও মারা গেছে।'

শক্ত একটা ঢোক গিলল কাউরু। মৃত্যুর নিঃশব্দ ছায়া ওর বাবার আরও কাছে সরে আসছে।

যেন সহজ যোগ অঙ্ক কষছেন, এক এক করে আরও তিনজনের নাম বললেন হাইডিউকি। 'ওরা সবাই মারা গেছে।'

বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল কাউরু।

'তোমাকে ভাবাচ্ছে না, আসলে কী ঘটছে ব্যাপারটা?' বললেন হাইডিউকি। 'যাদের কথা বললাম তারা সবাই আমার সঙ্গে আর্টিফিশাল লাইফ প্রজেক্টে কাজ

BanglaBook.org

করেছে, কিংবা এটার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত ছিল।'

'ওঁদের সবার মৃত্যুর জন্যে এই এমএইচসি ভাইরাস দায়ী?'

'জাপানে এই ভাইরাসে কত লোক সংক্রমিত হয়েছে?'

'পুরো এক মিলিয়ন যদি নাও হয়, কাছাকাছি হবে ' আন্দাজ করল কাউরু, এদের মধ্যে রাইকো আর কাউরুর মাও আছেন, যারা সংক্রমিত হলেও এখনও অসুস্থ হয়ে পড়েননি। 'কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'এক মিলিয়ন অনেক মানুষ, কিন্তু তারপরও মোট জনসংখ্যার এক শতাংশের বেশি নয়। অথচ, আমি, এমন কাউকে আমি চিনি না যে সংক্রমিত হয়নি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাউরুর দিকে তাকিয়ে আছেন হাইডিউকি।

প্রথমে কাউরুর মনে হলো ওর আত্মার ভেতর অনুসন্ধান চালাচ্ছেন বাবা, তারপর তাঁর চোখ-মুখ জানান দিল, প্রার্থনা করছেন।

'তুমি তো ভালো আছ, ঠিক?'

চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করে জিনস ঢাকা ছেলের হাঁটু স্পর্শ করলেন হাইডিউকি। সন্দেহ নেই ছেলের হাত ধরতে চাইছেন, তবে চামড়ার সঙ্গে চামড়ার সংযোগ ঘটাতে ভয় পাচ্ছেন।

স্ত্রী এরই মধ্যে সংক্রমিত, ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছেশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে তাঁর কাছ থেকে, শুধু এই খবরটা দিয়েঃ যেভাবেই হোক, কাউরুও এই ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছে।

বাবার দিকে কাউরু সরাসরি তাকাচ্ছে না

'টেস্ট রেজাল্টে কোনো সমস্যা ছিল?'

কাউরু অনুভব করল বাবা ওর মনের ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। ভয়ের গলা টিপে ধরল সে, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে কথা বলছে, 'তোমাকে তো বলেছি, উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।'

কথাটা সত্যি, দু'মাস আগে ওর টেস্ট রেজাল্ট নেগেটিভ ছিল, তবে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না আগামী মাসের টেস্ট থেকে কি জানা যাবে। তিনমাসের ব্যবধানে কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে।

মুখ ঘুরিয়ে নিল কাউরু, ভান করল করিডর থেকে ভেসে আসা পায়ের আওয়াজ শুনছে। কাল বিকেলের দৃশ্যটা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর, রিয়োজির কামরায়। রক্ত-মাংসের খেলাটা জমে উঠেছিল ওখানে।

আহ্, ওর শরীর মেতে উঠেছিল ছন্দময় ওঠা-নামায়।

তার আগের দিন, পরশু, রাইকোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুধু চুমোর মধ্যে সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল কাউরু। রিয়োজির কামরার বাইরে, করিডরে ছিল ওরা, নিরাপদ সময় পেয়েছে মাত্র কয়েক মিনিট।

জায়গাটা হাসপাতাল, এই বিবেচনায় এর বেশি কিছু আশা করা যায় না।

BanglaBook.org

বিশেষ করে ঘরের বাইরে।

পরদিন বিকেলে–গতকাল–রিয়োজির কামরায় একবার যেতে হয়েছিল কাউরুকে, ফেলে রেখে আসা প্যাথলজি টেক্সবুকটা আনতে। গিয়ে শুনল রিয়োজিকে এইমাত্র রেডিওলজিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিছু টেস্ট করানোর জন্যে। এখন যে রিয়োজির টেস্ট করা হবে, এটা কাউরু জানত না, রাইকো ওকে কিছু বলেনি। তবে সবকিছু মনে রাখলে এমন মনে হতে পারে যে ঠিক নিজের সুবিধেমতো সময়েই আসা হয়েছে কাউরুর, ছেলেটা যখন কামরায় নেই।

আস্তে নক করেছে কাউরু। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলেছে রাইকো, তবে সামান্য একটু। ওর মুখ ভিজে, হাতে তোয়ালে–কাউরু নক করার সময় নিশ্চয় মুখ ধুচ্ছিল। দরজার পাশে একটা সিঙ্ক আছে, তার ওপর দশ ওয়াটের আলো জ্বলছে। বাথরুমে না ঢুকে, ওখানে দাঁড়িয়ে মুখের মেকআপ তুলছিল রাইকো।

শান্ত সুরে মুখ খুলল সে, পালা করে দু'গালে তোয়ালে বুলাচ্ছে।

'কাল তুমি একটা জিনিস ফেলে গেছ।'

'দুঃখিত। আসার আগে টেলিফোন করা উচিত ছিল আমার,' খুব নিচু গলায় কথা বলছে কাউরু। রিয়োজিকে কোথাও দেখতে পেল না।

'ভেতরে এসো।'

হাত ধরে কাউরুকে কামরার ভেতর টেনে নিল রাইকো। একজন তরুণের জীবন এরপর আর সার্থক না হয় কীভাবে? সুন্দরী, উদ্ভিন্নযৌবনা একজন নারী হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিচ্ছে তাকে। ওর বয়স অবশ্য একটু বেশি, তবে সেটা বরং আরও বেশি উত্তেজক আর ভরসার জায়গা নয়?

দরজা বন্ধ করল রাইকো।

সিঙ্ক আর আয়নার সামনে, পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল দুজন। তারপর আয়নার দিকে ঘুরে হাতের কাজটা, মুখ পরিষ্কার, শেষ করল রাইকো। নিজের মেকআপবিহীন চেহারা কাউরুকে দেখতে দিচ্ছে ও। কাউরুর চোখে এটা আরও বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হলো।

ওদের আর রিয়োজির খালি বিছানার মাঝখানে একটা নিশ্ছিদ্র বেড়া দাঁড়িয়ে আছে, হার্ডবোর্ডের তৈরি, ইশারায় সেদিকটা দেখাল কাউরু, যেন জানতে চাইল ওখানে রিয়োজি নেই কেন।

'নার্স এসে এইমাত্র নিয়ে গেল ওকে।'

'টেস্ট?'

'হ্যাঁ।'

'কী টেস্ট?'

'সিনটেগ্রাম,' গলার স্বর একটু কেঁপে যাওয়ায় কাউরু বুঝতে পারল এই শব্দের সঙ্গে রাইকোর পরিচয় নেই।

BanglaBook.org

কেমোথেরাপির আগে নিতে হয় সিনটেগ্রাম, তাতে কম করেও দু'ঘণ্টা সময় লাগে। টেস্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কামরায় কেউ আসছে না, অর্থাৎ সময়টা নিজেদের নিয়ে একা থাকতে পারবে ওরা।

রিয়োজির চিকিৎসার এই পর্যায়টা রাইকোকে আরও বেশি হতাশ ও বিষণ্ন করে তুলেছে এটা নতুন শুরু হতে যাওয়া আরেকটা তিক্ত যুদ্ধ ক্যানসার বিরোধী ওষুধ-পত্র ক্যানসার সেলকে আক্রমণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক সুস্থ সেলেরও ক্ষতি করছে। রাইকো জানে এখন থেকে ওকে লক্ষ রাখতে হবে ছেলে প্রাণচাঞ্চল্য হারায় কিনা, তার খিদে কমে যায় কিনা, বমি পায় কিনা। সবচেয়ে দুঃখ লাগে, রিয়োজি এত কষ্টের ভেতর দিয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু এই গ্যারান্টি কেউ তাদেরকে দেবে না যে এসবের বিনিময়ে ক্যানসার কোষগুলো ধ্বংস হবে।

এত কিছুর পর ওগুলোর শুধু পুনরুৎপাদন মন্থর করা যাবে, আর তার ফলে দেরি করিয়ে দেয়া যাবে শেষ মুহূর্তটিকে। এই ক্যানসারের নিয়তিই ছড়ানো, সেটাকে ঠেকাবার কোনো উপায় নেই।

এই দুর্ভাগা মাকে কিছু বলার নেই কাউরুর। ওর ছেলেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। ছকবাঁধা সান্ত্বনার বুলি ওর কী উপকারে আসবে?

কিন্তু কাউরুর চোখে তাকিয়ে রাইকো বলল, 'আমরা যদি অপেক্ষা করি, মিরাকল ঘটবে, তুমি দেখো!'

কাউরুর হাত দুটো নিজের হাতে নিল রাইকো, এটা যেন ওর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

'আমি বলব, আমার কিছু জানা নেই।'

'কাকে জিজ্ঞেস করব এটা কেমন। এই জীবন কখনও চাইনি। আমি ক্লান্ত। আমি অসুস্থ

'আমিও!'

'তাহলে কিছু করো! প্লিজ! সাহায্য করো আমাকে! সাহায্য করো রিয়োজিকে! আমি জানি তুমি পার।'

হ্যাঁ, আমি যেন সব পারি!

হায়, আমাকেই কে সাহায্য করে!

প্রতিবাদে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো কাউরুর, তবে মুখ না খুলতে বাধ্য করল নিজেকে।

রাইকোর কপালের ওপর ঝুলে থাকা কিছু চুল এখনও ভিজে। ওগুলোর নীচে ভেজা ভেজা চোখ দুটোয় করুণ মিনতি। ওর ঠোঁট আর ঠোঁটের আশপাশের মুখ কাঁপছে, যেন যে-কোনো মুহূর্তে ফুপিয়ে উঠবে। কাউরুর বুকটা ওর জন্যে ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। এমন সুন্দর একটা দেহসৌষ্ঠব নেতিয়ে পড়বে, আর অসহায় দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখতে হবে, এটা মেনে নিতে পারছে না কাউরু।

BanglaBook.org

শুধু যদি ওর পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব হত। চায় সে, খুব চায়, কিন্তু কীভাবে?

ওদের পাশে পানির কলটা পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি, সরু একটা ধারায় পানি ঝরছে। ওই আওয়াজে ভরাট হয়ে উঠল কামরা, ওর উত্তেজনা আর বাসনা বাড়িয়ে দিচ্ছে : শব্দটার মধ্যে একটা আবেদন আছে, সেটা অগ্রাহ্য করতে না পেরে সাড়া দিল কাউরু।

কলের দিকে তাকাল রাইকো, মুক্ত হাত দিয়ে প্যাঁচ ঘুরিয়ে বন্ধ করতে চাইছে। কিন্তু ওর হাত আরও শক্ত করে চেপে ধরল কাউরু, খুব শক্তি খাটিয়ে নিজের দিকে টানল ওকে।

প্রথমে মনে হলো বাধা দিতে চেষ্টা করছে রাইকো, ওর চেহারায় মেঘের মতো আসা-যাওয়া করছে জটিল ভাবাবেগ। পরস্পরবিরোধী অনুভূতি ঝড় তুলছে ওর ভেতরে, এটা কাউরু টের পেল ওর ত্বক স্পর্শ করে। একজন মা হিসেবে ওর বাধ্যবাধকতা, আবার একজন নারী হিসেবে ওর কামনা।

রাইকোকে না ছেড়েই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বদলাল কাউরু, তারপর ওকে বিছানায় শোয়ানোর চেষ্টা করল। একটু বাধা দিল রাইকো, ফলে শোয়ার বদলে মেঝেতে বসে পড়তে হলো ওকে, বিছানার কিনারায় পিঠ ঠেকে আছে।

কাঁধে মৃত্যুর বোঝা, এত ভারি যে কুঁজো হওয়ার যোগাড়; রোগীর অনুপস্থিতিতে, তার বিছানার গায়ে হেলান দিয়ে আছে, নিজ যৌন চাহিদার সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করছে রাইকো। মৃত্যুর প্রতিনিধি হয়ে নানাজাতের ভূত চারদিক থেকে হামলা চালাচ্ছে ওর ওপর, শুধু একটা দিক বাদ রেখে, যেদিকটায় রয়েছে লালচের উৎসমুখ–টগবগ করে ফুটছে সেই লালসা, যেন এটা প্রমাণ করার জন্যে যে সে বেঁচে আছে।

তারপর মনে পড়ল এই মুহূর্তে ওর সন্তান কি নির্দয় টেস্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কামনার আগুনে হিম পানি ঢেলে দিল চিন্তাটা। সন্তানের প্রতি মার ভালবাসা তার যৌনচাহিদার গলা টিপে ধরেছে।

কিন্তু কাউরুর চাহিদা বহাল আছে। ফেরার অবস্থায় নেই সে আর, তার মন ও শরীর যুক্ত হয়ে একটিমাত্র লক্ষ্যের পিছু নিয়েছে।

রাইকো এমএইচসি ভাইরাসে আক্রান্ত, এটাকে কাউরু গ্রাহ্য করছে না। তার এটা জানা আছে যে মৌখিক সংযোগের চেয়ে যৌনঅঙ্গের সংস্পর্শে এই ভাইরাস অনেক সহজে ছড়ায়, কিন্তু এই মুহূর্তে সেই জানাটা ওর স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

রাইকোর পাশে মেঝেতে বসেছে কাউরু, দুটো শরীর এক হয়ে আছে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে। সঙ্গিনীর মুখে মুখ রাখল সে, খেপা আঙুল ওর ব্লাউজের বোতাম খুলছে। এই দৃঢ়, প্লেবয়সুলভ ক্রিয়া এমনকি কাউরুকেও বিস্মিত করল: তুলনা করলে এসব ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা কম।

BanglaBook.org

কাউরু যখন কালকের ঘটনা রোমন্থন করছে, হাইডিউকি তখন হুশিয়ার করার সুরে ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার বিপদ সম্পর্কে সাবধান করছেন ছেলেকে। ওরে আমার বুকের ধন, মন দিয়ে শোন।

...তোমার ব্লাড টেস্ট নেগেটিভ এসেছে?...এক সময় আমিও তোমার বয়সী ছিলাম–মেয়েছেলে সম্পর্কে তোমাকে সাবধান থাকতে হবে... কোনো অবস্থাতেই নিজেকে তুমি অসতর্ক হতে দেবে না... তাৎক্ষণিক ঝোঁকের কাছে নতি স্বীকার করবে না

কথাগুলো কাউরুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। বাবার চোখে তাকাতে পারছে না সে। এক নারীর প্রতি সহজ ও নির্ভেজাল ভালোবাসা বাবার প্রত্যাশার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে উঠেছে।

'হেই, কচি! তুমি আমার কথা শুনছ?'

কাউরুর রোমন্থনে বলা যায় একটা হাতুড়ি ছুঁড়ে মারলেন হাইডিউকি। বহু বছর হয়ে গেল কচি বলে ওকে ডাকেন না তিনি। ধীরে ধীরে বর্তমানে ফিরতে শুরু করল কাউরু।

'চিন্তা করতে হবে না, বলেছি তো।'

তবু দৃষ্টি থেকে সন্দেহের মাত্রা কমাতে রাজি নন হাইডিউকি।

নীরবে পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল দুজন। শব্দের মাধ্যমে যোগাযোগের চেয়ে এভাবেই বরং অনেক বেশি তথ্য দেয়া-নেয়া করতে পারে ওরা। তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে কাউরুর হাঁটু স্পর্শ করলেন আবার।

'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না?' গলা নামানো আদুরে সুর হাইডিউকির। 'তুমি আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ।'

বাবার হাতের ওপর হাত রাখল কাউরু।

'আমি জানি, বাবা।'

'আমি চাই না এটার কাছে ধরা খাও তুমি। এর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে। সমস্ত বোধ-বুদ্ধি এক করে রুখে দাঁড়াতে হবে এই শত্রুর বিরুদ্ধে, যে তোমার শরীর আর তারুণ্য ধ্বংস করতে চায়।'

ওদিকে ওর *সাহায্য* পাবে বলে আশা করে বসে আছে সাইকো, আর এদিকে বাবা ওকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু ও যদি এমএইচসি ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে থাকে, ওর যদি মেট্যাসটাটিক ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে থাকে, তাহলে গুরুতর এসব বিষয় আর বাইরের কিছু থাকে না। ওর তখন নিজেকে দাঁড় করাতে হবে নিজের শরীর বাঁচাতে।

হাইডিউকি তাঁর আগের প্রসঙ্গে ফিলে গেলেন।

'এখানে বসে সাইকি আমাকে অনেক কথা বলে গেল। আমার পুরোনো

BanglaBook.org

সহকর্মীরা, একজনের পর একজন, এই রোগের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। এটা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

অপেক্ষা করছে কাউরু

'আমি প্রচুর ক্যানসার রোগীকে চিনি,' ফের বললেন হাইডিউকি।

'হ্যাঁ, তা চেনো,' বলল কাউরু। সে নিজেও অনেক এমএইচসি ভাইরাস ক্যারিয়ারকে চেনে।

'হতে পারে এর একটা কারণ আছে।'

'যেমন, গবেষকরা বিশেষভাবে অরক্ষিত? তাঁদের প্রতিরোধশক্তি তুলনায় কম?' সাবধানে জানতে চাইল কাউরু।

'এটা তোমার বিষয় বলে মনে হচ্ছে না? তুমিই তো গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি ম্যাপ থেকে ওই লঞ্জেভেটি জোনস খুঁজে বের করেছিলে। আমি কি বলি শোনো। আমি চাই তুমি একটা ডিস্ট্রিবিউশন ম্যাপ তৈরি করো, তাতে আমেরিকা ও জাপানের কোথায় কজন এমএইচসি রোগী আছে তা দেখানো হবে। কিংবা যারা সংক্রমিত হয়েছে তাদের কার কি পেশা সেটা ধরে আলাদা আলাদা গ্রুপ তৈরি করো। মোটকথা, সমস্ত তথ্য-উপাত্ত যোগাড় করে একটা পরিসংখ্যান দাঁড় করাও।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখব আমি।'

'এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার ভেতর একটা অনুভূতি কাজ করছে,' বললেন হাইডিকি। 'এই যে আমাদের চারপাশে এত অসুস্থতা, এটা কোইন্সিডেন্স হতে পারে বলে মনে হচ্ছে না।'

এখনও সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, হাতটা লম্বা করে সাইডবোর্ডের ভেতরটা হাতড়াচ্ছেন, যেন কিছু খুঁজছেন।

চোখ তুলে তাকাতে সাইডবোর্ডের ভেতর স্তূপ করা কিছু ছাপা কাগজ দেখতে পেল কাউরু, সব মিলিয়ে কয়েক ডজন পাতা।

প্রথমে ওগুলোই বের করে এনে বাবাকে দেখাল কাউরু, জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো খুঁজছ তুমি?'

প্রথম পাতায় কিছু হরফ এই ধাঁচে সাজানো হয়েছে:

```
           10              20              30      40
AATGCTACTACTATTAGTAGAATTGATGCCACCTTTCAGCTCGC
   50
GCCCCA...
```

এক পলক চোখ বুলিয়েই জিনিসটা চিনতে পারল কাউরু, এটা একটা ক্রোমজোমাল বেইস সিকোয়েন্স।

'এগুলো সাইকি রেখে গেছে।'

BanglaBook.org

'কী ক্রোমজোম বিশ্লেষণ করছিলেন তিনি?'

'অবশ্যই এটা,' বলে নিজের বুকে আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন হাইডিউকি। এখন যখন প্রতিদিনের টেস্ট থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে তাঁর ফুসফুসেও সম্ভবত ক্যানসার ছড়িয়েছে, ভাইরাসের অবস্থান বোঝাবার জন্যে, চেহারায় রাগ আর বিতৃষ্ণা নিয়ে, বুকের ওপর আঙুল রাখেন তিনি।

এটা মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাসের সম্পূর্ণ বেইস সিকোয়েন্স।

উৎসাহ বোধ করছে কাউরু, হরফগুলোর ক্রম আরেক বার দেখল। ওর হাতে ধরা কয়েক ডজন কাগজের পাতা নটা জিনের বেইস সিকোয়েন্স ধারণ করছে; অসংখ্য হরফ। ওর হাতে এটা, যে ভাইরাস ওদেরকে শেকড় সুদ্ধ ধ্বংস করে ফেলেছে, তার ব্লুপ্রিন্ট।

নয়

কাউরু সিদ্ধান্ত নিল প্রথমে ওই ল্যাবে যাবে সে, যেখানে সংরক্ষিত আছে লূপ প্রজেক্টের বিশাল মেমোরি ব্যাঙ্কস। কাল্পনিক বিশ্বের ইতিহাস, যেটা লূপ নামে পরিচিত, ৬২০ টেরাবাইট হলোগ্র্যাফিক মেমোরিতে জমা আছে। দশ বছর পর, আজও, নিরাপদ আর অক্ষত আছে সব।

ওই ল্যাবে যেতে হলে পুরোনো সাবওয়ে সিস্টেমের চেয়ে *নিউ লাইন* ধরে যাওয়াই ভালো, তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো যাবে। ইউনিভার্সিটি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলো কাউরু।

মাত্র কয়েক মিনিট হাঁটতে হলো ওকে, তাতেই ঘামে ভিজে গেল গায়ের টি-শার্ট। কটকটে দুপুর, ট্রেনে আরোহী বেশ কম। এয়ার কন্ডিশনিং খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করল ওকে।

সিটে বসে ব্রিফকেস থেকে বাবার দেয়া ছাপা কাগজগুলো বের করল কাউরু, যেগুলোয় এমএইচসি ভাইরাসের সম্পূর্ণ বেইস সিকোয়েন্স আছে। সিকোয়েন্সে ব্যবহার করা A,T,G ও C প্রতিনিধিত্ব করছে বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিয়াটাইডের। ওর জানা আছে, এগুলোর দিকে সারাজীবন তাকিয়ে থাকলেও লাভ নেই কোনো, কিছুই বোধগম্য হবে না। তবে এই মুহূর্তে করার মতো কিছু নেই ওর। সঙ্গে একটা পেপারব্যাক থাকলে পাতা ওল্টাতে পারত। তাই বসে বসে খই ভাজছে।

জিন আসলে তথ্যের একটা ইউনিট, আর এমএইচসি ভাইরাসের তা মাত্র নটা আছে। একজন মানুষের জিন আছে তিন লাখের মতো– কাজেই, তুলনায়, ভাইরাসের জিন খুবই কম।

BanglaBook.org

প্রতিটি জিন কয়েক হাজার থেকে শুরু করে কয়েক লাখ বেইস সিকোয়েন্সের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে; তিনটে বেইস গঠন করে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড। কাজেই, উদাহরণ হিসেবে, তিন হাজার অক্ষরের একটা সারির [A,T,G ও C... এভাবে] মানে হলো এক হাজার অ্যামিনো অ্যাসিড পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে একটা প্রোটিন তৈরির করার জন্যে।

পাতার পর পাতা দেখছে কাউরু, চোখ দুটো ক্লান্ত হয়ে উঠলে মুখ তুলে জানালা দিয়ে ট্রেনের বাইরে তাকাচ্ছে। হরফগুলো এত ছোট, তার ওপর আছে ট্রেনের ঝাঁকি, আচ্ছন্ন বোধ করছে সে।

সারির মাথায়, দশটা করে হরফের পর পর, সংখ্যা ছাপা আছে, পাঠক যাতে একবার চোখ বুলিয়েই সিকোয়েন্সের প্রতিটি হরফের নম্বর বলে দিতে পারে।

এই সংখ্যাগুলো দেখে খুব সহজেই হিসেবটা বের করা যায় কত বেইস মিলে গঠন করেছে নটা জিনের প্রতিটিকে।

জিন # ১: ৩০৭২ বেইস
জিন # ২: ৩৯৩,২১৬ বেইস
জিন # ৩: ১২,২৮৮ বেইস
জিন # ৪: ৭৮৬,৪৩২ বেইস
জিন # ৫: ২৪,৫৭৬ বেইস
জিন # ৬: ৪৯,১৫২ বেইস
জিন # ৭: ১৯৬,৬০৮ বেইস
জিন # ৮: ৬১৪৪ বেইস
জিন # ৯: ৯৮,৩০৪ বেইস

উঠল কাউরু, দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এয়ার কন্ডিশনিংয়ের বাতাস ওর শরীরের বাম দিকে রীতিমতো আঘাত করছিল। এধরনের অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা বিশেষভাবে অপছন্দ করে ও। বসে থাকার মাসুল যদি বরফ হওয়া হয়, তার আগে দাঁড়িয়ে পড়াই ভালো।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রাইকোর কথা ভাবতে চাইল কাউরু, কিন্তু পারল না। রাইকোকে সরিয়ে দিয়ে রুগ্ন বাবার ছবি চলে আসছে ওর মনের পরদায়। তিনি কি যেন বোঝাচ্ছেন ওকে।

যে রিসার্চ সেন্টারে কাউরু যাচ্ছে, সেটা ওর বাবা এককালে যেখানে কাজ করতেন তার রয়ে যাওয়া অংশবিশেষ মাত্র।

কাউরু জানে পঁচিশ বছর আগে, ডক্টরেট করার পর, ওর বাবাকে লূপ প্রজেক্টে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

BanglaBook.org

কাউরু আরও জানে, পরবর্তী পাঁচ বছর কৃত্রিম প্রাণ নিয়ে গবেষণার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন হাইডিউকি। তবে বাবা নির্দিষ্ট ঠিক কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেটা ওর জানা নেই।

এসবই কাউরুর জন্মের আগের ঘটনা

একটু বড় হয়ে যখনই বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করেছে কাউরু, হাইডিউকি সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখে তালা মেরে দিয়েছেন।

তবে প্রজেক্টটা বোধহয় ভালোভাবে শেষ হয়নি, এটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে কাউরু। হাইডিউকি এমন একজন মানুষ যিনি নিজের কোনো সাফল্যে লাফ-ঝাঁপ দেবেন, উৎসব করবেন, কিন্তু ব্যর্থ হলে নিজের মুখ সেলাই করে রাখবেন। লক্ষণটা চিনতে পারার পর বিষয়টা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেনি কাউরু।

কিন্তু এবার–হয়তো বয়স হয়েছে বলে, কিংবা অসুস্থতা তাঁকে নরম করে ফেলেছে–প্রফেসর সাইকির রেখে যাওয়া কাগজগুলো নিয়ে অসুস্থ বাবার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময়, একটা শব্দ উচ্চারণ করে ওকে থামিয়ে দিয়েছেন হাইডিউকি।

'কচি।'

তারপর ওর হাইডিউকি নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা তুললেন–প্রায় দু'যুগ আগে কি নিয়ে গবেষণা করতেন তিনি।

'আমার ক্ষেত্র ছিল প্রাণের উদ্ভব নিয়ে একটা কমপিউটার সিম্যুলেশন তৈরি করা।'

হাইডিউকির ব্যাখ্যাটা কঠিন কিছু নয়: বহু বছর ধরে তাঁর একটা স্বপ্ন ছিল দুনিয়ার বুকে কীভাবে প্রাণ এলো সেই ব্যাখ্যা তিনি জানবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু, কাউরু যেমনটা আন্দাজ করেছিল, তাঁদের এক্সপেরিমেন্ট অপ্রত্যাশিত একটা উপসংহারে পৌঁছোয়, এবং তারপর প্রজেক্টটা স্থগিত হয়ে যায়।

কাউরুর বাবা 'ব্যর্থ' শব্দটা ব্যবহার করেননি। তাঁর কথা হলো, একটা এক্সপেরিমেন্টকে এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে নিলে সেটাকে প্রশংসিত সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে তারপরও তিনি বুঝতে পারেননি গবেষণার এই পরিণতি কেন হলো।

তারপর তিনি বললেন, 'লুপ...কীভাবে ব্যাখ্যা করব...বলতে পার ওটা ক্যানসারাস হয়ে উঠেছিল।'

এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চাইছেন, ওই প্রোগ্রামের সমস্ত প্যাটার্ন এক হয়ে মাত্র একটা সেট প্যাটার্নে পরিণত হয়েছিল: তাতে সমস্ত বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা অদৃশ্য হয়েছিল, আর প্রোগ্রামটা থেমে যায়।

কাউরুর কানে বাজল ওর বাবা যেন প্রলাপ বকছেন। তিনি যা বলছেন সেটা থেকে ঠিক কি বুঝতে হবে তা ওর মাথায় ঢুকছে না। তবে এতে অবাক হওয়ারও

BanglaBook.org

কিছু নেই: ওই প্রজেক্টের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে, তাছাড়া পুরো বিষয়টা একসঙ্গে দেখতেও পাচ্ছে না।

তবে, প্রথম কথা, বাবা কি নিয়ে কাজ করেছেন সেটা জানার তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা আছে ওর মধ্যে! আর দ্বিতীয় কথা, কাউরু জানতে চায় ওর বাবার পুরোনো প্রায় সব ল্যাব বন্ধুরা এমএইচসি ভাইরাসে যে মারা গেলেন, এটা কোইন্সিডেন্স কিনা।

তাই রিসার্চ সেন্টারে ঢু মারার আইডিয়াটা কাউরুরই ছিল। ওর দেখতে যাওয়াটা যাতে নির্বিঘ্ন হয় সেজন্যে যতটুকু যা করার করেছেন হাইডিউকি। তাঁর যে-সব ল্যাব বন্ধুরা আজও বেঁচে আছেন, বাবার কাছ থেকে তাঁদের নাম জেনে নিয়েছে কাউরু।

সন্দেহ নেই ইতিমধ্যে রিসার্চ সেন্টারের কারও না কারও কাছে ওর বাবার বার্তা পৌঁছে গেছে। কাউরু আশা করছে ওকে হাসিমুখেই ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে।

কাগজগুলোয় আবার একবার চোখ বুলাচ্ছে কাউরু।

প্রতিটি জিনের সর্বমোট যে বেইস সংখ্যা, তার মধ্যে কি যেন একটা খোঁচাচ্ছে ওকে। ওপরের কাগজটায় রয়েছে নটা সংখ্যা, চার থেকে ছয় অঙ্কের মধ্যে, প্রতিটি সংখ্যা একটি করে জিনের প্রতিনিধিত্ব করছে।

৩০৭২
৩৯৩,২১৬
১২,২৮৮
৭৮৬,৪৩২
২৪,৫৭৬
৪৯,১৫২
১৯৬,৬০৮
৬১৪৪
৯৮,৩০৪

সংখ্যার ব্যাপারে কাউরুর বিশেষ একটা সক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে, ওর সেই যোগ্যতা এখন লাল সংকেত দিচ্ছে। তবে ঠিক বুঝতে পারছে না কেন সংকেতটা আসছে। ওর মন বলছে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে প্রতিচ্ছবির সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে এমন কিছু আছে। হ্যাঁ, নিশ্চিত ও।

এ-ব্যাপারে ওর ষষ্ঠইন্দ্রিয় অত্যন্ত শক্তিশালী।

মাথাটা পরিষ্কার করার জন্যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শহর দেখছে

BanglaBook.org

কাউরু লাইনের দু'ধারেই গোছা গোছা লম্বা ভবন জড়ো হয়ে আছে, ওগুলোর মাঝখান দিয়ে অবাধে ছুটে চলেছে নিঃশব্দ ট্রেন।

সম্ভবত কোনো প্লাটফর্ম কাছে চলে আসায় ট্রেনের গতি কমল। একটা দালান দেখল কাউরু, এখনও তৈরি হচ্ছে; ওটার পেছনে আরেকটা দালান, সেটার গায়ে প্রথম দফা এক পোঁচ উজ্জ্বল রঙ দেয়া হয়েছে।

চারটে বহুতল ভবনের মাঝখানে স্টেশনটা, প্রতিটি হাজার ফুট উঁচু, প্রস্থেও সমান, শুরু থেকেই শহরের-ভেতর-শহর হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। ওটার একটা ইংলিশ নাম আছে, সবাই জানে

দ্যা স্কয়ার বিল্ডিং।

'স্কয়ার।'

কাউরু এর মানে জানে: চতুর্ভুজ, প্রতিটি দিক সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তবে এর অন্য একটা অর্থও আছে।

প্রিন্টআউটের দিকে আবার তাকাল কাউরু। মাথা একটু ঘুরলেও, নটা সংখ্যার দিকে মন দিচ্ছে।

'এ হতে পারে না,' বিড়বিড় করল। মনে পড়ল, একটা সংখ্যা নিজেকে নিজে গুণ করা অর্থেও ইংরেজি স্কয়ার শব্দটির ব্যবহার আছে সে হিসেবে, ও দেখল–

৩০৭২	=	$[2^{10} \times 3]$
৩৯৩,২১৬	=	$[2^{11} \times 3]$
১২,২৮৮	=	$[2^{12} \times 3]$
৭৮৬,৪৩২	=	$[2^{13} \times 3]$
২৪,৫৭৬	=	$[2^{14} \times 3]$
৪৯,১৫২	=	$[2^{15} \times 3]$
১৯৬,৬০৮	=	$[2^{16} \times 3]$
৬১৪৪	=	$[2^{17} \times 3]$
৯৮,৩০৪	=	$[2^{18} \times 3]$

হুমম্, আচ্ছা, কী আশ্চর্য!

সত্যি তাজ্জব ব্যাপার: প্রতিটি সংখ্যার একই মান দুই ধরে, সেই দুইকে যতবার প্রয়োজন গুণ করে, গুণফলকে তিনবার পূরণ করা হয়েছে–*power of n* ব্যবহার করে

মনে মনে দ্রুত কিছু হিসেব কষল কাউরু, এলোমেলো করা নয়টা চার ও ছয় অঙ্কের সংখ্যা সবগুলো সমান $2^n \times 3$ হওয়ার সম্ভাব্যতা কতটুকু ছয় অঙ্ক পর্যন্ত এরকম মাত্র আঠারটা সম্ভাব্য সংখ্যা আছে

নির্ভুল সম্ভাব্যতা জানার দরকার নেই কাউরুর, যদিও সেটা দম আটকে আসা একটা ফল–প্রায় শূন্য।

এই ভাইরাস জিন সিকোয়েন্স $2'' \times 3$ হচ্ছে কেন!

এরকম ঘটার সুযোগ যেখানে বলতে গেলে শূন্য, অথচ ব্যাপারটা ঘটেছে এই নটা সংখ্যা অসম্ভাব্যতার ওই পাঁচিলে চড়ে বসেছে। এটা কাকতালীয় কিছু হতে পারে না। ওকে এখন এটা ধরে নিয়ে এগোতে হবে যে এর কিছু একটা অর্থ আছে।

কাউরুর মনে পড়ছে দশ বছর আগে বাবার সঙ্গে বিতর্ক করার সময়ও এই একই উপসংহারে পৌঁছেছিল সে। সেবার আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাণের উদ্ভব ওহ্, কুসংস্কার আর জিন্ধসও...এটাই বোধহয় ধরে নেয়া ভালো যে প্রতিটি বিস্ময়কর কোইন্সিডেন্সের পেছনে সুতো টানার জন্যে একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে।

অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে জানা গেল সামনেই কাউরুর স্টেশন আওয়াজটা মনে হলো দূর, বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।

প্লাটফর্মে নামল কাউরু বাবার কথা সত্যি হলে এখান থেকে রিসার্চ সেন্টার পৌঁছুতে হাঁটাপথে মাত্র দশ মিনিট লাগবে।

হিম ট্রেন থেকে গরম বাতাসে বেরিয়ে এসে ক্লান্ত বোধ করছে ও কাগজগুলো ব্রিফকেসে ভরল, তারপর বাবার বলে দেয়া পথ ধরে রিসার্চ সেন্টারের দিকে এগোল।

দশ

স্টেশন থেকে রিসার্চ সেন্টার সত্যি বেশি দূরে নয়, তবে পথটা পাহাড়ী। কাউরু যখন পৌঁছুল, ঘেমে আবার গোসল হয়ে গেছে এক দূতাবাসের পেছন দিকে, মান্ধাতা আমলের একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লিখে আনা ঠিকানাটা মেলাচ্ছে সে কোনো ভুল নেই এই ভবনের পাঁচ ও ছ'তলায় একটা ল্যাবরেটরি আছে, সেখানে সমস্ত লুপ ডেটা পাওয়া যাবে

পাঁচতলায় ওঠার জন্যে এলিভেটরে চড়ল কাউরু ওখানে পৌঁছে রিসেপশনিস্টকে অ্যামানো-র নাম বলল হ্যাঁ, মিস্টার অ্যামানো এই নামটাই হাইডিউকি দিয়েছেন ওকে ওর জানা নেই তিনি কে বা কি

ল্যাবে গিয়ে অ্যামানো নামে এক ভদ্রলোককে খুঁজে বের করতে হবে। তুমি যে যাচ্ছ, আমি সেটা ওঁকে জানিয়ে রাখব।

কাউরুকে এটা কয়েকবার বুঝিয়ে বলেছেন হাইডিউকি

BanglaBook.org

ডেস্কে বসা মহিলা ইন্টারকমের রিসিভার তুলল।

'স্যার, আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন– মিস্টার কাউরু ফুতামি।' এতক্ষণে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল মহিলা, ইঙ্গিতে হলের এক সেট সোফা দেখাল। 'একটু পরই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি।'

সোফায় বসে অপেক্ষা করছে কাউরু। সময় কাটছে চারপাশে চোখ বুলিয়ে, ভাবছে ওর জন্মের আগে এখানেই বাবা কাজ করত। প্রতিদিন সকালে ল্যাবে যাওয়ার সময় বাবা কি ঠিক এই হল ধরেই হেঁটে যেত?

'তোমাকে অপেক্ষা করতে হলো বলে দুঃখিত।'

কথাটা ভেসে এলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে। কাউরু ভেবেছিল এই অফিসের মূল অংশ, অর্থাৎ রিসেপশন ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে আসবেন মিস্টার অ্যামানো, কিন্তু তাঁকে নেমে আসতে দেখা গেল এলিভেটর ল্যান্ডিং থেকে।

সোফা ছেড়ে মাথাটা একটু নত করল কাউরু।

রোগা-পাতলা, ছোটখাটো মানুষ ভদ্রলোক।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি কাউরু ফুতামি। বাবা সব সময় বলেন আপনার প্রতি তাঁর অনেক ঋণ।'

'একদমই না, একদমই না। আমিই বরং তাঁর প্রতি ঋণী।'

কার্ড কেস থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করে কাউরুর হাতে ধরিয়ে দিলেন অ্যামানো। মেডিকেলের ছাত্র হিসেবে কাউরুর কাছে এ-ধরনের কিছু নেই, কাজেই বিনিময়ে কিছু দিতে পারল না।

কার্ডটা দেখল কাউরু। প্রথমে রিসার্চ সেন্টারের নাম। তারপর নিজের নাম, টারু অ্যামানো। সবশেষে পেশা, মেডিসিনের প্রফেসর।

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার স্পেশালিটি কি বলবেন?'

মৃদু হাসলেন অ্যামানো, টোল পড়ল গালে। 'মাইক্রোবায়োলজি।'

কাউরুর মনে পড়ল, বাবার চেয়ে দু'বছরের জুনিয়র তিনি, তারমানে তাঁর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু দেখে অত বয়স বলে মনে হয় না। পঁয়ত্রিশ বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যাবে।

'আমি জানতাম আপনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত থাকবেন, তাই...'

'ও কিছু না। এসো, তোমাকে আমি চারদিকটা ঘুরিয়ে দেখাই।'

কাউরুকে এলিভেটরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন অ্যামানো।

ছ'তলাতেও একই রকম রিসেপশন এলাকা, না থেমে ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছেন প্রফেসর অ্যামানো। তাঁর পাশে কাউরু।

ওকে নিয়ে বড়সড় একটা প্রাইভেট কামরায় ঢুকলেন তিনি। দুটো দেয়াল বইয়ে ঠাসা, ডেস্কের ওপর কয়েকটা কমপিউটার।

নিজের চেয়ারে বসে হেলান দিলেন প্রফেসর অ্যামানো, ইঙ্গিতে সামনের একটা

BanglaBook.org

চেয়ার দেখালেন কাউরুকে।

'আমাকে বলা হয়েছে তুমি নাকি ডক্টর হাইডিউকি ফুতামির গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানতে চাও।'

'জি।'

'ভালো কথা, তিনি আছেন কেমন? তাঁর শরীর কতটুকু সামলাতে পারছে?' ভদ্রলোক শুধু ভদ্রতার খাতিরে এসব জানতে চাইছেন, কাউরুর তা মনে হলো না। সত্যিসত্যি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে।

যদি নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় যে ক্যানসার তাঁর ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়েছে তাহলে আর আশা করার মতো কিছু থাকে না। তবে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল কাউরু।

'যতটুকু সামলাতে পারবে বলে আশা করা যায়।'

'তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, জানো।' পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় প্রফেসর অ্যামানোর চোখে-মুখে কাতর একটা ভাব ফুটে উঠল। 'গত কয়েক বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। এটা...শান্ত হয়ে গেছে।'

কাউরু ধরে নিল রিসার্চ সেন্টার প্রসঙ্গে কথাটা বললেন তিনি। মনে পড়ল, এখন পর্যন্ত ওই মহিলা আর প্রফেসর ছাড়া আর কাউকে এখানে দেখেনি। ধরে নিল এর সঙ্গে ভাইরাসের সম্পর্ক আছে।

'বাবা বলছিলেন লূপ রিসার্চ প্রজেক্টে আপনারা যারা অংশ নিয়েছেন তাদের অনেকেই ক্যানসারে মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ, অনেকেই।'

'এর পেছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে কি?'

'মনে হয় না সে ধরনের কোনো প্রভাব বা ফলাফলের কথা কিছু বলা হয়েছে কোথাও।'

তারপরও কাউরু এটাকে কোইন্সিডেন্স বলে বিশ্বাস করে না। কারণ-ও-ফলাফল, এই সম্পর্ক যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেটা হবে এই সময়ের বিশেষ একটা ঘটনা। সেটার সূত্র ধরে সংক্রামক ক্যানসারের চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতি বেরিয়ে আসতে পারে।

'আপনি জানেন এই ভাইরাসের প্রথম ভিক্টিম কোথায় পাওয়া গেছে?' মাইক্রোবায়েলজিস্ট হিসেবে এসব তথ্য তাঁর জানার কথা।

'সঠিক ডেটা দেয়া সম্ভব নয়, কারণ আগের অন্যান্য ক্যানসারের সঙ্গে এটাকে আলাদা করা খুবই কঠিন, তবে এমএইচসি ভাইরাস প্রথমে আবিষ্কৃত হয় এক আমেরিকান রোগীর শরীরে।'

এরকম একটা গুজব কাউরুও শুনেছে বটে যে এই রোগের জন্মস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান বা অন্য কোনো দেশ নয়।

'আমেরিকার কোথায়, জানেন?'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর অ্যামানো। 'ভিক্টিম পেশায় একজন কমপিউটেকনিশিয়ান। নিউ মেক্সিকো, অ্যালবাকারকির লোক।'

হঠাৎ ভ্রূ কোঁচকালেন, যেন কৌতূহল জাগার মতো কিছু একটা লক্ষ করেছেন তিনি। এমএইচসি ভাইরাস প্রথম ধরা পড়ে একজন কমপিউটার টেকনিশিয়ানের শরীরে। এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে, অর্থাৎ একটা কমপিউটার-রিসার্চ সেন্টারে, সংক্রমণের হার গড়পরতার চেয়ে অনেক বেশি। তবে জোর করে বলা যাবে না যে এটার কোইন্সিডেন্স হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু...

প্রফেসরের ভ্রূ জোড়া আবার স্বাভাবিক হলো। কাকতালীয় ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন তিনি, তবে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এটার বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়ার দরকার নেই, ভুলে যাওয়াই ভালো।

তারপর দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

'ও, হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। খুব পুরোনো একটা ভিডিও টেপ আছে, বুঝলে। ওটা বোধহয় তুমি দেখতে চাইবে।'

'ভিডিও টেপ?' রুদ্ধশ্বাসে পুনরাবৃত্তি করল কাউরু। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল ওর পেশি, কি কারণে জানে না।

'ওটাকে বলা যায়, ফুতামি-সেনসের সমস্ত জিনিস একসঙ্গে রাখা। গবেষণার বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ভূমিকা আর কি। ওঁদের কাজের একটা অংশ ছিল বিভিন্ন সূত্র থেকে বাজেটের অর্থ সংগ্রহ করা। ভিডিওটা তৈরি করা হয় দাতাদের মনে উৎসাহ জাগানোর জন্যে, তবে ওটা থেকে লূপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চমৎকার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।'

'আচ্ছা।'

'এসো,' বলে কাউরুকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন প্রফেসর অ্যামানো।

ল্যাব কমপ্লেক্সের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে করিডরটা। অবশেষে কাউরুকে ঠেলে একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিলেন প্রফেসর অ্যামানো, দেখে রিসেপশন হল বলে মনে হলো। একটা টেবিল আর কয়েক প্রস্থ সোফা দেখা যাচ্ছে।

কামরায় একটাও জানালা নেই দেখে কাউরু ভাবল ওরা সম্ভবত দালানের মাঝখানে কোথাও রয়েছে ফার্নিচার দেখে মনে হলো, এটা গ্যালারি–চারদিকের দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্য এই যে প্রতিটি দেয়ালে হুবহু একটা ছবিই ঝুলছে–এক রকম উঁচুতে, কোনগুলো থেকে সমান দূরত্বে, প্রতিটি ফ্রেম একই আকার ও আকৃতির–ওগুলো যেন একেকটা পবিত্র প্রতিকৃতি, দেয়ালে টাঙানো হয়েছে দুষ্ট আত্মা বা ওই ধরনের অশুভ কিছুকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। প্রতিটি ফ্রেমে ফটোগ্রাফির ওপর ভিত্তি করে আঁকা আধুনিক পেইন্টিং শোভা পাচ্ছে।

BanglaBook.org

ছবিগুলো আবার পরীক্ষা করছে কাউরুর চোখ যেন এক প্রস্থ চৌকো আধুনিক আর্ট চারদিক থেকে ধারণ করা হয়েছে ক্যামেরায়, তারপর সেটাকে দোমড়ানো-মোচড়ানো হয়েছে; কামরার চারদিকে চোখ বুলানোর সময় ওর অনুভূতি হলো যেন এক ধরনের গুলতি আকৃতির জায়গার ভেতর রয়েছে ও।

আধুনিক শিল্পের বিষয়বস্তু সাধারণত ঠাণ্ডা, কঠিন সব অনুভূতির জন্ম দেয়। কি শিল্পবোধ থেকে এই ব্যাপারটা ঘটল–বিষয়বস্তু নয়, বরং বিষয়বস্তুর ছবি ঝোলানো হয়েছে চারটে দেয়ালের একই জায়গায়? যেন নির্দিষ্ট কিছু একটার তীব্র তাড়না বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে ছবিগুলোকে।

একটা ছবির দিকে চোখ সরু করে তাকাল কাউরু, যেন শিল্পীর নাম পড়তে পারবে। সই আছে, নামটা বিদেশী, তবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটা বড় হরফের 'সি' পড়া গেল, তারপর লেখা 'এলিয়ট'।

'প্লিজ, বসো।'

পেছন থেকে প্রফেসর অ্যামানোর গলা ভেসে আসতে সংবিৎ ফিরে পেয়ে কাউরু বুঝতে পারল কোথায় রয়েছে ও।

প্রফেসরের দেখানো একটা সোফায় বসল, দেখল ওর দিকে মুখ করা একটা বত্রিশ ইঞ্চি টেলিভিশন রয়েছে সামনে। নিশ্চয়ই কেবিনেট থেকে একটু আগে বের করেছেন প্রফেসর।

আরেকটা কেবিনেট খুলে ভিডিওটেপটা বের করলেন তিনি। ওটার শিরদাঁড়ায় বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা রয়েছে–

লূপ

চোখে না পড়ে উপায় নেই।

BanglaBook.org

এগারো

কৃত্রিম প্রাণের ধারণাটা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ভিডিওর মাধ্যমে। এই প্রোগ্রাম সাধারণ দর্শক-শ্রোতার কথা মনে রেখে তৈরি করা হয়েছে, কাজেই শুরুতে মূল বিষয়গুলো সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

কাউরুর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'এই অংশটা আমরা বাদ দিতে পারি, তাই না?' তিনি ধরেই নিচ্ছেন হাইডিউকি ফুতামির ছেলে মানেই কৃত্রিম প্রাণ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা থাকবে।

মাথা ঝাঁকাল কাউরু।

বোতাম টিপে ফাস্ট-ফরওয়ার্ড দিলেন প্রফেসর অ্যামানো। ভিডিওতে এখন জ্যামিতিক কিছু প্যাটার্ন ফুটে উঠেছে–আসছে, বদলাচ্ছে, মিটমিট করছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বারবার, বিরতি নেই।

কৃত্রিম প্রাণ মানে এই নয় যে ডিএনএ কেটে পেস্ট করার মাধ্যমে মানুষের হাত দিয়ে দানব তৈরি করা হচ্ছে। এর সঙ্গে ক্লোনিং টেকনোলজিও জড়িত নয়। এটা একটা কমপিউটার সিম্যুলেশন: মানুষের তৈরি প্রাণীসত্তা কমপিউটার মনিটরে আসা-যাওয়া করছে।

এটা স্বীকার করা উচিত যে আর্টিফিশাল লাইফ-এর আইডিয়া এসেছে **লাইফ গেইম** থেকে। ওটা কমপিউটারের একটা খেলা, চলতি শতাব্দীর শেষদিকে প্রায় সবখানেই পাওয়া যেত।

শুরুর দিকে দাবার ছক সাজিয়ে খেলতে বসার মতো একটা ব্যাপার ছিল। পরস্পরকে ভেদ করে যাওয়া দুদিকে বিস্তৃত কিছু রেখায় ভর্তি থাকত কমপিউটারের পরদা, দাবার একটা বোর্ডের মতো, পার্থক্য শুধু এই যে তাতে চতুষ্কোণ সংখ্যা অনেক বেশি থাকত।

প্রতিটি চতুষ্কোণ একটা সেল বা কোষ হিসেবে পরিচিত ছিল। একটা সেল হয় জীবিত কিংবা মৃত হতে পারে। 'জীবিত' সেল কালো, কিন্তু মৃত সেলের কোনো রঙ নেই।

বোর্ডে চোখ বুলালে শুধু 'জীবিত' সেল দেখা যেত, যেগুলোর রঙ কালো। প্রতিটি সেলকে ঘিরে রেখেছে অন্য আরও আটটা সেল–ওপরে, নীচে, বাঁয়ে, ডানে, ওপরের ডানদিকে, নীচের ডানদিকে, ওপরের বামদিকে, নীচের বামদিকে।

সেলগুলোর জন্যে পরিষ্কার নিয়মকানুন তৈরি করা আছে। উদাহরণ দেয়া যাক–একটা 'জীবিত' সেলকে যদি দুটো বা তিনটে 'জীবিত' সেল ঘিরে রাখে, এরচেয়ে কমও নয় বা এরচেয়ে বেশিও নয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মে যাওয়ার সুযোগ পাবে সেটা; কিন্তু যদি ওটাকে ঘিরে রাখা সেলের মধ্যে একটা সেলও 'জীবিত' না হয়, কিংবা যদি মাত্র একটা সেল জীবিত হয়, কিংবা চারটে বা চারটের বেশি সেল 'জীবিত' হয়, তাহলে ওটার 'মৃত্যু' হবে।

খেলার শুরুতে দৈব-চয়নের মাধ্যমে বানিয়ে নেয়া হয় জীবিত ও মৃত সেল। খেলা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে চলতে থাকে, সময় এগোয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে, প্রতি প্রজন্মে সেল জীবিত হচ্ছে বা মারা যাচ্ছে।

যদি একটা সেলের গা ঘেঁষে দুটো বা তিনটে সেল থাকে, এসব প্রতিবেশীর সাহায্য পেয়ে বেঁচে থাকবে সেটা, আর যদি কাছাকাছি মাত্র একটা সেল থাকে বা কোনো সেল না থাকে, নিঃসঙ্গতায় ভুগে মারা যাবে; ঠিক একইভাবে ওই সেলের প্রতিবেশীর সংখ্যা যদি চারটে বা চারটের বেশি হয়, ভিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মারা যাবে।

যেহেতু জীবিত সেলের প্রতিনিধিত্ব করছে কালো চতুষ্কোন বা চতুর্ভুজ, প্রতিটি

BanglaBook.org

নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ডিসপ্লেতে একরঙা প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে।

খেলাটার ভিত বা ধারণা বেশ সহজই, কিন্তু বাস্তবে খেলতে গিয়ে দেখা যায় নানা ধরনের অসংখ্য প্যাটার্ন সম্ভব, ইঙ্গিতবহুল ফলাফল সহ। একটা প্যাটার্নে দেখা গেল নির্দিষ্ট কয়েক প্রজন্ম পর চতুর্ভুজগুলো একদিকে কাত হয়ে রয়েছে।

আরেক ধরনের প্যাটার্ন যেন বারবার শিউরে উঠছে বা কাঁপছে।

কিছু প্যাটার্ন একই রকম, ওগুলোর কোনো পরিবর্তন নেই।

কিছু প্যাটার্ন পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, বোর্ডের ওপর আকৃতি বদল করছে জ্যান্ত প্রাণীর মতো। এই পরিবর্তন চলতেই থাকে, যতক্ষণ না সমস্ত সেল মারা যায়, কিংবা প্যাটার্নগুলো সব নির্ধারিত হয়ে যায়, যখন আর কোনো নড়াচড়া থাকছে না।

যেহেতু **লাইফ গেইম**-এর ধারণা থেকে পদ্ধতিটা উন্নত করা হয়েছে, গবেষকদের মনে হলো তাঁরা যেন তাঁদের কমপিউটারের ভেতর প্রাণের লক্ষণ বা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন।

প্রাণের প্রথম বৈশিষ্ট্য বা সংজ্ঞা হলো, ওটা নিজের জন্ম দিতে পারে, পুনরুৎপাদনে সক্ষম।

লাইফ গেইমে যেই মাত্র নিজেকে বহুগুণ করার প্যাটার্ন আবিষ্কৃত হলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে গবেষকরা তাঁদের দক্ষতা যোগ করলেন তার মধ্যে, এই আশায় যে পৃথিবীর বুকে প্রাণের উদ্ভব কীভাবে শুরু হলো এবং কীভাবে তার ক্রমবিকাশ ঘটল সেটা এবার হয়তো জানা যাবে।

একই সুতোয় গাঁথা এত সব ঘটনা যে মালাটা তৈরি করল সেটাই কমপিউটারে কৃত্রিম প্রাণ তৈরির প্রজেক্টে কাজ করতে পথ দেখাল ফুতামি হাইডিউকিকে, যাঁর মেডিসিনের ওপর পড়াশোনা আছে।

সন্দেহ নেই সেন্টারে যোগ দেয়ার পেছনে মাইক্রোবায়োলজিস্ট প্রফেসর অ্যামানোরও একই রকম একটা কারণ আছে। বিজ্ঞান এমন পর্যায়ে পৌঁছে থেমে গেছে, রুটিন আর সিস্টেমের মাঝখানের দেয়ালগুলো ভাঙতে না পারলে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন শক্তিশালী আইডিয়ার আদান-প্রদান না ঘটাতে পারলে, তাঁর সামনে এগোবার আশা খুব কম।

ঠিক জায়গামতো ফাস্ট ফরওয়ার্ডিং বন্ধ করে প্লে বোতামে চাপ দিলেন প্রফেসর অ্যামানো।

'এই নাও। এখন এটা লুপ রিসার্চের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করবে

পরদায় এখন হাইডিউকির ছবি। বাবার তারুণ্যভরা চেহারা দেখে বুকের ভেতর একটা টান টান অনুভূতি হলো কাউরুর-এই ছবি তোলা হয়েছে তাঁর বিয়ের পরপরই। চুল তখনও ঘন, তাঁর গোটা অস্তিত্ব থেকে উৎসাহ আর আত্মবিশ্বাস যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। পোশাকের ভেতর থেকে তাঁর সবল পেশির আভাসও পাওয়া

BanglaBook.org

যাচ্ছে।

চিন্তা করতে গিয়ে মনে পড়ল এই প্রথম একটা ভিডিও দেখছে কাউরু, যাতে ওর জন্মের আগের হাইডিউকি রয়েছেন। এরকম কিছু দেখবে বলে ভাবেনি সে, তাই যতটা অবাক হচ্ছে, খুশিও তারচেয়ে কম হচ্ছে না।

ছবি বদলে গেল। টিভির পরদা এখন কাউরুকে নিয়ে গেছে আমেরিকার বিশাল এক মরুভূমির মাঝখানে, একটা সুপারকন্ডাক্টিং সুপার অ্যাকসেলারেইটার-এ, ডায়ামিটারে সেটা ত্রিশ মাইল–বহুকাল আগে পরিত্যক্ত একটা প্রজেক্টের প্রশাখায়। রিং বা বৃত্ত আকৃতির প্রকাণ্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটি, একসময় ছিল বাতিল গুদাম, এখন ভর্তি হয়ে আছে নিবিড় সমান্তরাল রেখায় সাজানো [ম্যাসিভলি প্যারালাল] নিরেটদর্শন অগুণতি সুপার-কমপিউটারে।

সংখ্যাটা এককথায় অবিশ্বাস্য।

মরু বালুর নীচে ছয় লাখ চল্লিশ হাজার সুপারকমপিউটার রাখা হয়েছে–সত্যি সত্যি হতভম্ব করার মতো একটা দৃশ্য, দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না কাউরুর। কী সাংঘাতিক!

ছবিটা আবার হঠাৎ বদলে গেল। এবার টোকিওর একটা বহুতল ভবন দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা আবার পাতালে নেমেছে, এখন সেটা পরিত্যক্ত একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ের টানেলে চলে এসেছে, যে টানেল অসংখ্য শাখায় মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এখানেও ৬৪০,০০০ সুপার কমপিউটার রাখা হয়েছে। পাতাল, যেখানে আর্দ্রতা কম আর তাপমাত্রা বছরজুড়ে প্রায় একই রকম থাকে, কমপিউটারের জন্যে আদর্শ জায়গা।

এই জাপান-আমেরিকান যৌথ সুপারকমপিউটার সংগ্রহ–সব মিলিয়ে ১.২৮ মিলিয়ন–লূপ প্রজেক্টকে সহায়তা করার জন্যে।

টিভির পরদায় আবার ফিরে এলেন হাইডিউকি। লূপকে চালানোর হার্ডঅয়ার দেখানোর পর এবার সফটঅয়্যার ব্যাখ্যা করা দরকার।

একটা কমপিউটার পরদার দিকে হাত তুললেন হাইডিউকি, বাছাই করা শব্দ সহযোগে বিবরণ দিচ্ছেন তিনি, ওদিকে প্রতীকচিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে সেলুলার বিভাজনের প্রক্রিয়া। যে হাইডিউকিকে দ্রুত কথা বলতে দেখে অভ্যস্ত কাউরু, জানে কথা বলার সময় নানারকম অঙ্গভঙ্গি করেন তিনি, কিন্তু ভিডিও টেপে সেই হাইডিউকিকে খুঁজে পাচ্ছে না সে–ইনি শান্ত, চেহারায় ভাব-গাম্ভীর্য, যিনি ক্যামেরার দিকে ভুলেও একবার তাকাচ্ছেন না, কথা বলছেন সবিনয় মৃদুকণ্ঠে, তবে তাতে তাঁকে মোটেও আত্মবিশ্বাস হারানো একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

কাউরু বুঝে ফেলেছে কী বিষয়ে কথা বলছেন ওর বাবা। যদিও এই গবেষণা শুরু হওয়ার পর প্রায় বিশ বছর পার হয়ে গেছে, তারপরও বেশ সহজেই সব বুঝতে পারছে সে। কিন্তু ওঁদের মেথোডলজি কি ছিল? এবারই প্রথম প্রজেক্টের

BanglaBook.org

বিশদ বিবরণে চোখ বুলাল কাউরু, ওর মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগছে।

হাত তুলে যে টিভি মনিটর দেখালেন হাইডিউকি, তাতে কোনো একটি জীব বা প্রাণীসত্তার সেল পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া দেখানো হচ্ছে। ওটার পাশে ওই একই প্রক্রিয়া কৃত্রিম উপায়ে অনুকরণ করা হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে প্রতীকচিহ্নের মাধ্যমে।

একটা প্রাকৃতিক সেল, আরেকটা মানুষের তৈরি সেল, পাশাপাশি। একসময় সেল দুটো প্রায় একই আকৃতি পাবে। সত্যিকার সেল পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি প্রতীকচিহ্নে অনুবাদ করা হবে, তারপর সেটা প্রকাশ করা হবে কমপিউটার সিম্যুলেশনে। বিভিন্ন অ্যালগরিদমের সাহায্য নিয়ে, একটি প্রাণীসত্তার আকৃতি ফুটল কমপিউটারের মনিটরে

লূপ প্রজেক্টের পেছনে আইডিয়াটা ছিল, জাপান-আমেরিকান যৌথ আয়োজনে কমপিউটারের ভার্চুয়াল স্পেসে প্রাণ সৃষ্টি করা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ডিএনএ ধারণ করবে–রূপান্তর, পরজীবিতা ও রাহিত্য প্রক্রিয়ার সহায়তা নিয়ে, যাতে করে একটা মূল জীবমণ্ডল তৈরি হয় পৃথিবীর বুকে প্রাণের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ অনুকরণ করার জন্যে।

ভিডিওটেপ থামিয়ে কাউরুর দিকে তাকালেন প্রফেসর অ্যামানো।

'যেটুকু দেখলে তা নিয়ে তুমি কোনো প্রশ্ন করতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই,' বলল কাউরু। 'ঠিক কোন ক্ষেত্রে এই গবেষণা অবদান রাখবে বলে ধারণা করা হয়েছিল?'

কিছু প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরেই বিরক্ত করছে ওকে। ফান্ড আসছে কোত্থেকে? এই গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল বাস্তবে কোন কাজে ব্যবহার করা হবে? যতটুকু দেখেছে তা থেকে বলে দেয়া যায়, বাজেটটা এত বড় যে সরকারী অনুদানে কুলাবে না। পৃথিবীর বুকে প্রাণের রহস্য উন্মোচন, কিংবা বিবর্তনের মেকানিজম জানা অবশ্যই বিদ্যাবিষয়ক [অ্যাকাডেমিক] কৌতূহল মেটাবে, তবে এটা কারও জন্যে টাকা বানাবে কিনা সন্দেহ আছে ওর।

'আসলে অনেক দূরের কথা ভাবা হয়েছিল। আমরা জানতাম এর ফলাফল প্রথমে সীমিত পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু আমরা যখন মাঠটা খুলে দেব, তারপর কি ধরনের উত্তরণ ঘটবে বা কি বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার হবে তা আগে থেকে আন্দাজ করাও মুশকিল। সম্ভাব্য প্রয়োগের ক্ষেত্র আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য। উদাহরণ হিসেবে বলছি–শারীরবৃত্তি এবং ওষুধ-পত্র; আরও ধরো অনুজীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা... আর শুধু বিজ্ঞানই নয়: আমরা আশা করছিলাম স্টক এক্সচেঞ্জের দরপতন থেকে শুরু করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পর্যন্ত যত সমস্যা আছে, সব এই গবেষণার ফলাফল থেকে সমাধানের পথ বের করে আনতে পারব।'

হেসে উঠে বিরতি নিচ্ছেন প্রফেসর।

আসলে লূপ রিসার্চের সুফল এখনই অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাচ্ছে। এটা

BanglaBook.org

জানা সম্ভব হয়েছে ঠিক কোন সময়ে পৃথিবীর পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান বিষয়ক ভারসাম্য ধ্বংস হয়ে যাবে, তা ঠেকানোর রণকৌশল ভালো একটা মান অর্জন করবে ধরে নিয়েই। যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে মস্তিষ্কের ভেতর সচেতনতা ঠিক কোন সময়ে এসে সৃষ্টি হয়, এই শিক্ষায় ওষুধ-পত্রের ক্ষেত্রে অবদান বিশাল, জানা গেছে বেশ কিছু গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসা ঠিক কি হওয়া উচিত।

ভিডিওর বাকি অংশ প্রায় সবটাই নিয়ম-পদ্ধতি নিয়ে। হাইডিউকি ডায়াগ্রাম এঁকে ব্যাখ্যা করছেন সংপ্লব [chaos] থিয়রি, ননলিনিয়্যারিটি, এল-সিস্টেমস, জেনেটিক অ্যালগরিদম ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রোগ্রামটা কি কি শিখল, কীভাবে শিখল এবং কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

একটা উদাহরণ। ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে সেলুলার বিভাজনের টুকরো টুকরো ছবি দেখানো হচ্ছে। কিছু সেল বিভক্ত এবং পুনঃবিভক্ত হতে হতে একসময় একটা প্রাণীসত্তার রূপ নিল, ছন্দবদ্ধ কম্পন তুলে পরদার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, যেন ফাস্ট-ফরওয়ার্ড দেয়া আছে। নেটওয়ার্কটা তীব্রবেগে বিস্তৃত হচ্ছে, অনেকটা চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তবহা নাড়ীতে ক্যানসার সেল বাড়ার মতো। যদিও কাউরু জানে যে এটা একটা যান্ত্রিক অনুকরণ [মেকানিকাল সিম্যুলেশন] মাত্র, তারপরও যথেষ্ট জ্যান্ত লাগল ওর চোখে।

প্রজেক্টের ধরন এবং গবেষণার নিয়ম-পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেয়ার পর, এক্সপেরিমেন্ট কীভাবে এগোচ্ছে দর্শকদের সেটার বাস্তবচিত্র দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ হলো ভিডিও।

সন্দেহ নেই, উৎসাহিত করার ভালো একটা চেষ্টা।

প্রাণের সূচনা এবং বিবর্তন নিয়ে কমপিউটার সিম্যুলেশন তৈরি করা নতুন কিছু নয়: এটা কয়েক জায়গায় কয়েক বার করা হয়েছে। কাউরুকে যেটা অবাক করেছে সেটা হলো এই প্রজেক্টের পরিধি আর স্তরবিন্যাস: খুঁটিনাটি সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, প্রোগ্রামে ঢোকানো হয়েছে অসংখ্য প্যারামিটার। কাউরু আন্দাজ করল এরকম কিছু করার এটাই বোধহয় প্রথম চেষ্টা।

এই এক্সপেরিমেন্ট যেটা করতে পেরেছে, তা হলো, প্রাণের সূচনা ঘটার পর থেকে পরবর্তী প্রায় চার শ কোটি বছরকে সহজে নাগাল পাওয়া যায় এমন একটা ডিজিটাল সময়সীমার ভেতর বন্দি করে ফেলেছে। কোটি কোটি বছরকে কমপিউটারের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত করে কমবেশি মাত্র দশ বছরে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, তারপরও ভার্চুয়াল স্পেসে বাস্তব দুনিয়ার বহুমাত্রিক জটিলতা অনুকরণ করা গেছে নিখুঁতভাবে।

এই গবেষণার ভবিষ্যত সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করছে কাউরু।

'কতদূর যেতে পেরেছিল লুপ?' প্রফেসর অ্যামানোকে জিজ্ঞেস করল সে, ভিডিওটেপটা রিওয়াইন্ড করছেন তিনি।

BanglaBook.org

'ফুতামি-সেনসে তোমাকে কিছু বলেননি?'

কাউরু জবাব দিল, 'তিনি শুধু বলেছেন প্যাটার্নটা ক্যানসারাস হয়ে ওঠে, আর কিছু না।'

বিচলিত দেখাচ্ছে প্রফেসরকে। 'মোটামুটি সেরকমই।'

'যা যা ঘটেছে তার একটা ক্রম জানতে চাইছি আমি।'

প্রফেসর হাসতে গিয়েও হাসলেন না।

'আমার ধারণা ব্যাপারটা তুমিও বোঝ—সময় যদি তুমি দিতেও পার, ওগুলো দেখে শেষ করতে পারবে না, তার অনেক আগেই তুমি মারা যাবে।'

ইচ্ছে করেই বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাউরু।

খানিক ইতস্তত করে অ্যামানো বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা অন্য কোথাও বসে কফি খাওয়ার ফাঁকে এটা নিয়ে কথা বলতে পারি। আমি আসলে তোমার বাবার অবস্থা সম্পর্কে আরও কিছু শুনতে চাইছি।'

কাউরুকে নিয়ে অন্য একটা কামরায় ঢুকলেন প্রফেসর, আকার এবং বসার আয়োজন দেখে মনে হলো এখানে মিটিং হয়, কনফারেন্স রুম। দেয়ালে বড় একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ টাঙানো।

টেবিলে পরস্পরের মুখোমুখি বসল দুজন। কোত্থেকে যেন হাজির হলো সেই রিসেপশনিস্ট মহিলা, ট্রে করে ওদের জন্যে দু'কাপ কফি এনেছে।

বেশ গরম কফি। ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে কাউরু। কিন্তু লক্ষ্য করল প্রফেসর অ্যামানো কাপটা দু'হাতে ধরে মুখের সামনে তুলছেন।

এই কনফারেন্স রুমেও কোনো জানালা নেই, তবে এয়ার কন্ডিশনিং বেশ উঁচুতে দেয়া আছে। এ পর্যন্ত যা কিছু শুনেছে কাউরু, সে সব মাথার ভেতর নাড়াচাড়া করতে এত বেশি ব্যস্ত ও, রিসার্চ সেন্টারের ঠাণ্ডা পরিবেশ খেয়ালই করেনি। প্রফেসরকে ওভাবে কাপের উত্তাপ গ্রহণ করতে দেখে, এতক্ষণে কাউরু লক্ষ করল ঠাণ্ডায় ওর নিজের হাতের রোম দাঁড়িয়ে গেছে।

কফিতে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ভার্চুয়াল দুনিয়ার ইতিহাস বলে যাচ্ছেন হাইডিউকির সহকর্মী, প্রফেসর অ্যামানো।

তাঁর বলার ভঙ্গি, যেন এক বৃদ্ধ বই থেকে গল্প পড়ে শোনাচ্ছেন ওকে। গল্পের আঙ্গিকে সিম্যুলেশন বর্ণনা, বিষয়টার ভেতর ঢোকার সবাসরি পথ এটাই। যাই হোক, ধরনটা কাউরুর জটিল লাগছে না। হতে পারে ব্যাপারটা অনুকরণ মাত্র, তবু এও প্রাণ, কাজেই এটার ইতিহাসে গল্পসুলভ উপাদান থাকাটা স্বাভাবিক।

বোধহয় সেজন্যেই খুশি মনে আর আরামের সঙ্গে প্রফেসর অ্যামানোর বর্ণনার ভেতর বুঁদ হয়ে থাকতে পারল কাউরু। দুনিয়ার ইতিহাস নতুন করে আবার একবার ঝালিয়ে নেয়া বিরাট একটা মজাই। তবে শুধু একেবারে শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত।

BanglaBook.org

বারো

'...কিন্তু, এমনকি আমরা আরএনএ [RNA] ঢোকানোর পরও, যার অর্থ হলো নিজেকে অনুকরণ [replicate] করার সামর্থ্য অর্জন, কিছু সময় স্বাভাবিক, অর্থাৎ চরম বিশৃংখলায় ভরা একটা জগৎই রয়ে গেল ওটা। তাতে আমাদের কিছু সহকর্মীর মন খারাপ হলো, তাঁরা ভাবলেন কিছুই ওটা বদলাবে না।

'কিন্তু কিছু সহকর্মী আশাবাদী ছিলেন। এটা তো সত্যি, প্রায় এই একই লাইন ধরে সত্যিকার প্রাণ বিকশিত হয়েছে। আদিম প্রাণ শুরু হয়েছিল নিঃসঙ্গ কোষ [single-cell] প্রাণ হিসেবে, এবং তারপর ওভাবেই থেকে যায় তিন শ কোটি বছর, পরিবর্তন প্রায় না ঘটার মতো, বিবর্তনের কোনো লক্ষণই ছিল না।

'একদিন, ঠিক আমরা যেমনটি আশা করেছিলাম, জটিল প্রাণবৈচিত্র্য দেখা দিতে শুরু করল–সত্যিকার জগতে ঠিক যখন ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোসন ঘটে। আমাদের কাছে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যার করার মতো কোনো উত্তর নেই ঠিক ওই মুহূর্তে কি কারণে বহুবিচিত্র প্রাণের উদ্ভব ঘটল।

'চূড়ান্ত রকমের সহজ প্রাণের এই প্রকার, নিঃসঙ্গ-কোষ প্রাণের মতো, বানাতে শুরু করল বহু-কোষী প্রাণীসত্তা, এমন একটা নির্মাণকৌশলের মধ্যে দিয়ে, যা কিনা বলা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে হুবহু এভাবেই কাজ করেছে।

'তখন যে প্রাণের উদ্ভব ঘটল সেটা হয়ে উঠল প্রাকৃতিক দুনিয়ার জন্যে একটা মডেল প্যাটার্ন, পরে যেটা পরিণত হবে। কিছু প্রাণ একই প্রকার থেকে গেল, প্রকৃতির নিয়মেই অস্তিত্ব হারাল তারা। কিছু প্রাণ বিবর্তনের মাধ্যমে আরও জটিল প্রকারের হওয়ার সক্ষমতা অর্জন।

'শাখা-প্রশাখা ছড়াতে শুরু করল পারিবারিক বৃক্ষ, বিস্ময়কর ঘটনা হিসেবে হাজির হলো পরজীবিতা এবং একত্র-বাস, এমন প্রাণের উদ্ভব ঘটতে লাগল যেগুলোর নড়াচড়ার ভঙ্গি বিহ্বল করে দেয়। যে-সব জিনিস পোকামাকড়ের মতো নড়েচড়ে, পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াতে শুরু করল তারা। সাগরের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোতে পারছে এমন সব জিনিস। যে-সব জিনিস বাতাস চিরে পাখির মতো উড়তে পারছে।

'এবং কিছু জিনিস, যেগুলো স্থির থাকছে, বিবর্তনের আশা ছেড়ে দিয়েছে, চিরকাল নিঃসঙ্গ সেল হিসেবেই থেকে গেল, ওগুলো সংঘবদ্ধ ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মতো হয়ে উঠবে। আর আছে এমন জিনিস, ছবি হিসেবে বিশাল প্রতিনিধিত্ব আছে, কিন্তু সেগুলো নড়েনিঃ আকৃতি পেয়েছে দুনিয়ার বুকে গজিয়ে ওঠা গাছের মতো।

BanglaBook.org

'অবশ্যই প্রতিটি জীবিত জিনিসের মধ্যে তথ্য আছে, জিনের সঙ্গে সংযুক্ত, পুনরুৎপাদিত হলেই তাতে নির্দিষ্ট মাত্রায় ত্রুটি দেখা দেয়, এটাই হলো ভিন্ন ভিন্ন রূপ-বিবর্তনের ফলঃ কিছু ইতিবাচক দিকে যাবে, কিছু স্থির হয়ে থাকবে, কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ন্যাচারাল সিলেকশন-এর ভালো একটা প্রতিরূপ তৈরি করেছি আমরা, অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিযোগিতা।

'এই প্রক্রিয়া দেখতে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ করে তাজ্জব বনে গেলাম সবাই-যা কিনা শুধুমাত্র লিঙ্গ হতে পারে। বাস্তব দুনিয়াতেও এটা একটা রহস্য যে প্রজাতিগুলো নারী ও পুরুষে বিভক্ত হলো কেন। আমাদের জগতেও শাখা বিস্তারের ঘটনা ঘটল, যেটাকে নারী ও পুরুষকে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ না করলে ব্যাখ্যা করা যায় না।

'কিছু সরল প্রাণীসত্তা এখনও নিজ প্রজাতির আরেকটার সঙ্গে মিলিত না হয়েও পুনরুৎপাদন করতে পারছে, তবে জটিল জীবকে সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে এখন নিজ প্রজাতির কারও সঙ্গে মিলিত হতে হচ্ছে। আমরা যেমন আগাম বলেছিলাম, লিঙ্গভেদ একবার প্রকাশ পেলে, পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় জিনে থাকা তথ্য আরও সক্রিয়ভাবে জোট বাঁধবে, তাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হবে, বিবর্তন পাবে দ্রুতগতি।

'প্লিজ ভুল বুঝো না। এসব আমি সত্যি সত্যি দেখিনি-বয়স্ক অন্যান্য সহকর্মীরা আলাপ করেছেন, আমি ছিলাম শ্রোতা ও সাক্ষি। তবে সত্যি ভারি উত্তেজনাকর, তাই না? এই আইডিয়াটার কথা বলছি, কৃত্রিম প্রাণীসত্তা একটা কমপিউটারের ভেতর যৌনমিলনে অংশ নিচ্ছে, দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার না?

'ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোসনকে লাফ দেয়ার মুহূর্ত হিসেবে ধরে নিলে-জটিল প্যাটার্ন নিয়ে, কি বিস্ময়করভাবে, বদলে গেল জীবন। এই মুহূর্তে আবির্ভূত হলো ডাইনোসরের মতো দেখতে প্রাণীসত্তা, পরবর্তী মুহূর্তে সেগুলোর বিলুপ্তি ঘটল।

'এরপর যে প্রাণীসত্তা এল, সেগুলো পূর্বপুরুষের ভেতর পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে তথ্য জমা করল, সময় নিল যতক্ষণ না সেগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিণত হয়, এবং শুধু তারপরই ভাগ হলো। আমি নিশ্চিত তুমি জানো কি নিয়ে কথা বলছি আমিঃ স্ত ন্যপায়ী।

'কিছু সময় এভাবেই সব চলতে লাগল, যতক্ষণ না মানবজাতির পূর্বপুরুষদের মতো দেখতে একটা শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল এই দৃশ্যটা আমি বানিয়েছি, তারপর খেয়াল করে দেখেছি! যদি পার কল্পনা করো তুমি।

'প্রথমে ওগুলো ওরাংওটাংয়ের মতো চলাফেরা করত। তারপর, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ত্রুটি-বিচ্যুতি মেরামতের মধ্যে দীর্ঘ একটা সময় কাটাবার পর ওদের হাঁটাচলা সাবলীল ও সুষ্ঠু হয়ে উঠল, প্রথমদিকে যে আড়ষ্ট ভাবটা ছিল তা আর থাকল না।

BanglaBook.org

'এই পর্যায়ে জেনেটিক ইনফরমেশনের পরিমাণ কল্পনার সীমাকে ছাড়িয়ে যায়, তার কিছু সময় পরই এমন একটা প্রাণীর দেখা পাওয়া গেল যাকে আমরা অবশ্যই মানবজাতি বলে আন্দাজ করে নিতে পারি।

'এটা পরিষ্কার যে এই প্রাণীসত্তা নিজের সম্পর্কে সচেতন ছিল. জানত তাদের বুদ্ধিমত্তা আছে। পরিষ্কার, কারণ, এই শ্রেণীর প্রাণীসত্তা এমন আচরণ করেছে, যেন পরস্পরকে ইঙ্গিত বা সংকেত দিচ্ছে তারা।

'ডিজিটাল সংকেত বিনিময় করে, শূন্য আর এক ব্যবহার করে, এই শ্রেণীর প্রাণীসত্তা ক্রমশ আরও বেশি তথ্য নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। ফল হিসেবে ওদের সারভাইভাল রেট বেড়ে গেল। এতেও কোনো ভুল নেই: ওরা ভাষা আয়ত্ত করেছে।

'বিনিময় করা থোকা থোকা শূন্য আর এক বিশ্লেষণ করে ওদের ভাষা হিসেবে লেনদেন করা তথ্য অনুবাদ করতে পেরেছি আমরা। লূপের ভেতর থাকা অস্তিত্ব অবশ্যই নিজেদেরকে বাইনারি কোডে মিথস্ক্রিয়া করার বিষয়-বস্তু হিসেবে বিবেচনা করেনি। ওদের সচেতনতা সম্পর্কে বলা যায়, তোমার-আমার মতো একই জটিল ভাষা ব্যবহার করছে ওরা।

'ওদের ভাষা ভাঙার পর, আমরা যাতে মেশিন ট্রানস্লেইশন ব্যবহার করে সেটাকে আরও স্পষ্ট আর বোধগম্য করতে পারি, আরও মজার একটা দুনিয়া হয়ে উঠল ওটা—জানালেন ওঁরা। ডিসেপ্লেতে তুমি যে-কোনো দৃশ্যকে ত্রিমাত্রিক ছবি হিসেবে বেছে নিতে পার, দেখতে পাবে তুমিও একটা মুভির চরিত্র হয়ে গেছ।

'এই আর্টিফিশাল লাইফ ফর্ম ওদের নিজেদের ইতিহাস তৈরি শুরু করল। দলবেঁধে হাজির হলো একই চেহারা নিয়ে, রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, জড়িয়ে পড়ছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। নিজেদের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, ডিজাইন করছে নিজেদের দুনিয়ার, এসব যেন সত্যি তাদের নিজস্ব। বলা হলো, এটা দেখা মানে খোদ মানবজাতির ইতিহাস দেখা।

'ওদের ইতিহাস যত এগোচ্ছে, বিনিময় করা তথ্যপ্রবাহের লেভেলও তত উঁচু হচ্ছে, কাজেই এরপর সময় আরও ধীরে বইতে শুরু করল। কমপিউটারের প্রসেসিং সক্ষমতারও একটা সীমা আছে।

'পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথম তিন শ কোটি বছরের ইতিহাস কাভার করতে কমপিউটারের লাগল মাত্র ছ'মাস। তবে জীবনের উত্থান ঘটতে শুরু করার পর সময়ের গতি কমে গেল, বিশেষ করে ওটা যখন বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে মানুষের সঙ্গে একই লেভেলে উঠে এল। শেষদিকে, লূপকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে নিতে, কমপিউটারের সময় লাগল দুই থেকে তিন বছর।

'লূপ, ভার্চুয়াল জগৎ হিসেবে, রিসার্চ সেন্টারের স্টাফ আর গবেষকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত এবং সহজেই বোধগম্য ছিল। কিন্তু এটা চূড়ান্ত রকমের অসম্ভব একটা ব্যাপার যে লূপের ভেতর অনুভবক্ষম যে অস্তিত্বের অস্তিত্ব আছে তাদের

BanglaBook.org

পক্ষে স্রষ্টা অর্থাৎ আমাদেরকে চিনতে পারা। আমাদের কাছে ঈশ্বর যেমন, ওদের কাছে আমরাও তেমনি–একদম কিচ্ছু জানে না। যতদিন ওরা লূপের ভেতর থাকবে, জানতে পারবে না ওদের জগৎটা কীভাবে চলছে। এসব অনুধাবন-উপলব্ধির একমাত্র উপায় নিজেদের জগৎ থেকে ওদের বেরিয়ে আসা।

'ওদের সভ্যতার বিকাশটা ভারি চমৎকার। ওদের শহরে আনন্দ-ফুর্তি করার আলাদা এলাকা আছে, সেখানে নিওন সাইন জ্বলে, রঙ আর শব্দে ভেসে যায় সবাই। লাফ দিয়ে উঠে আসছে সম্ভাব্য সব ধরনের গণমাধ্যম, নাটকীয়ভাবে প্রশস্ত হচ্ছে তথ্যের বিস্তার, এবং মৌখিক ও সঙ্গীত শিল্পের আনন্দে ভরপুর জীবন যাপন করছে জনগণ।

'এ পর্যায় পর্যন্ত ওদের জীবন আমাদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। মোৎসার্ট কিংবা দা ভিঞ্চির মতো শিল্পী আছে ওদের, বাস্তব জগতের মতো তাঁরাও সেই একই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছেন, নিজেদের সংস্কৃতিতে যোগ করেছেন নতুন প্রাণস্পন্দন।

'ওদের দুনিয়া ভারি সুন্দর, কিন্তু একই সঙ্গে বাতাসে ভেসে বেড়ায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কাও। আমাদের কিছু স্টাফ উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল, কিছু স্টাফ সারাক্ষণ ফিসফাস করত–ওই কেয়ামত আসছে। সবখানে এমন সব লক্ষণ ফুটে উঠল, যেন অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

'এবং ওদের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হলো। লূপ, গোটা প্রাণীজগৎ, হয়ে উঠল ক্যানসারাস...'

এখানে দম নেয়ার জন্যে একটু থামলেন প্রফেসর অ্যামানো, কফির কাপটা ধীরে ধীরে মুখের সামনে তুললেন। ওটা খালি, তা তাঁর জানাও আছে, ভঙ্গিটা শুধু হাত দুটোকে নিয়ে কিছু করার জন্যে। তিনি যদি ধূমপায়ী হতেন, এখন তিনি একটা সিগারেট ধরাতেন।

'কী বলতে চাইছেন, ক্যানসারাস হয়ে উঠল মানে?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যামানো, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে নিজের সামনে উঁচু করলেন হাত দুটো।

'লূপ জীবমণ্ডলকে দখল করে নেয় অভিন্ন জিন। বিভিন্নতা আর বৈচিত্র্য হারিয়ে বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হয় ওটা।'

সিলিংয়ের দিকে তাকাল কাউরু, এটা তার একটা অভ্যাস। প্রফেসর যা বললেন সেটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে সে।

আলট্রা-ফাস্ট সুপার কমপিউটার সিস্টেমের ভেতর ত্রিমাত্রিক ভার্চুয়াল স্পেস সৃষ্টি করে ওরা, এমন একটা দুনিয়া বাস্তবে যেটার অস্তিত্ব নেই, সেই স্পেস বা জায়গাটার নাম দেয়া হয় লূপ।

জায়গাটা যথেষ্ট বড়, ওটার ভেতরে যে প্রাণীসত্তা আছে সেগুলোর কথা মনে

BanglaBook.org

রেখে বলা যায় একটা অনন্ত মহাবিশ্ব। পদার্থবিদ্যা অনুমোদন করে প্রকৃতির এমন সব বৈশিষ্ট্যসহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে কিনা, সেদিকটা দেখেছেন গবেষক আর পরীক্ষকরা, ওই জগৎটাও ঠিক যাতে হুবহু আদি পৃথিবীর মতো হয়। গাণিতিক অর্থে, এই দুনিয়াটাও সত্যিকার দুনিয়ার মতো একই ফর্মুলা আর থিয়রির সমর্থন পেয়ে গড়ে উঠেছে। শুধু মহাকর্ষের গতি আর ফুটন্ত পানির তাপমাত্রাই নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো পর্যন্ত বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে।

কার্বন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, সোডিয়াম, অক্সিজেন, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ১১১-টা মৌল পদার্থের বাকিগুলো জমা করা হয়েছিল, যেখানে যেটার যেটুকু লাগা দরকার নিয়ম-কানুন তৈরি করে দেয়া হয়েছে, দান করা হয়েছে যার যা বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা, যাতে করে মহাবিশ্ব থেকে যেভাবে বাস্তব পৃথিবী তৈরি হয়েছিল সেভাবে কৃত্রিম একটা দুনিয়া তৈরি করা যায়: দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম [H_2] আর একটা অক্সিজেন অ্যাটম [O] একত্রিত হয়ে একটা ওয়াটার মলিকিউল [H_2O] সৃষ্টি করবে, এবং তা একটা নাইট্রোজেন মলিকিউলের [N_2] সঙ্গে রিয়্যাক্ট করবে অ্যামোনিয়া [NH3] তৈরি করার জন্যে।

দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম এবং একটা অক্সিজেন অ্যাটম এক হলে কেন পানি তৈরি হবে, মূলত এর কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না: নিয়মটা স্রেফ ওভাবে ঠিক করে দেয়া আছে। তাহলেই প্রশ্ন করতে হয়, নিয়মটা কে ঠিক করল? আপনি যদি একটা নাম বলতে চান, সেটা হবে, সৃষ্টিকর্তা।

লূপের ভেতর বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ সেভাবেই এগিয়েছে, যেভাবে বাস্তব দুনিয়াতে এগিয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়–আদিম আরএনএ লাইফ ফর্ম জন্ম হওয়ার মধ্যে দিয়ে। কিংবা, এভাবেও বলা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মসংক্রান্ত দিক থেকে লূপ যেহেতু বাস্তব দুনিয়ার নিখুঁত মডেল ছিল, তাই বাস্তব পৃথিবীর বিবর্তন আগেই যে পথ ধরে এগিয়েছে লূপের বিবর্তন সেটাকে অনুসরণ না করে পারেনি।

লূপের অন্যতম একটা লক্ষ্য ছিল বিবর্তনের প্রকৃত পদ্ধতি ও ধারাটা গবেষকরা যেন খুঁজে পান। লূপের বিবর্তন যদি বাস্তব দুনিয়ার বিবর্তনের পথ অনুসরণ করে থাকে, তাহলে লূপ বিবর্তনের ফলাফল বাস্তব দুনিয়ার ভবিষ্যত সম্পর্কে আগাম ধারণা দিতে পারবে, এ-ব্যাপারে একটা ভালো ছবি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

অকস্মাৎ কাউরুর শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। লূপ পৃথিবীর ভবিষ্যত বলে দিয়েছে দুনিয়ার সমস্ত প্রাণ ক্যানসারাস হয়ে উঠবে

দুনিয়ার কী হাল?

এই মুহূর্তে ঠিক তাই ঘটছে।

ক্যানসার সেল মানুষ বাছাই করে পুনরুৎপাদিত হয় না, ওদের কোনো লিঙ্গ নেই, এবং ওরা অমর। এই মুহূর্তে সারা দুনিয়ায় মাত্র কয়েক মিলিয়ন ভুক্তভোগী

BanglaBook.org

খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু এই ঝুঁকি সব সময় আছে যে সংখ্যাটা এক ঝটকায় বেড়ে গেল এমএইচসি ভাইরাসে কোনো রূপান্তর কিংবা ওগুলোর জন্মহারে বিস্ফোরণ ঘটায়। লুপে যা ঘটেছে, এখানেও ঠিক তাই ঘটবে। ব্যাপারটা কি শুধুই কোইন্সিডেন্স ছিল? নাকি আসলে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল লূপ?

কাউরুর সামনে বসে লূপের ফলাফল এবং বাস্তবতার মধ্যে এরকম কোনো বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ থাকার কথা স্বীকার করতে যাচ্ছেন না প্রফেসর অ্যামানো। তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কজন মানুষই বা এরকম একটা উদ্ভট গল্প বিশ্বাস করবে?

ভয় আর বিস্ময় লুকিয়ে রেখে কাউরু জানতে চাইল, 'এর কারণ কী? লূপের লাইফ ফর্ম ক্যানসারাস হয়ে উঠল কেন?'

প্রফেসর জবাব দিলেন কাটা কাটা সুরে। 'এটা সহজ। রিং ভাইরাস হাজির হলো। তবে এই উপস্থিতি এমন একটা উপায়ে, আমরা স্রেফ বুঝি না, ঠিক যেন ম্যাজিক।'

'আপনি বলতে চাইছেন একটা মাত্র ভাইরাস লূপের সমস্ত প্যাটার্নকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়?'

'হ্যাঁ। এটা বিশ্বাস না করতে পারার কোনো কারণ নেই। যখন কিনা দুনিয়ার একদিকে একটা প্রজাপতি ডানা ঝাপটালে অপরদিকের আবহাওয়ায় তার প্রভাব পড়ে।'

বাটারফ্লাই ইফেক্ট, হুম, ভাবল কাউরু। এটা তাহলে ততটা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয় যে রিং ভাইরাস লূপ জগতের নিয়তি বদলে দিতে পারে ও যেটা বুঝতে পারছে না, ওটা হাজির হলো কেন?

'রিং ভাইরাসের আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো থিয়রি আছে?'

'থিয়রি?'

'এই যেমন ধরুন, স্টাফ কেউ প্রোগ্রামে এটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল?'

'উঁহুঁ। সিকিউরিটিতে কোনো ত্রুটি ছিল না।'

'ওটা হয়তো কোনো ধরনের কমপিউটার ভাইরাস।'

কিছু একটা বিরক্ত করছে প্রফেসর অ্যামানোকে। কাউরুর মনে হলো গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন তিনি

'মাফ করবেন, প্রফেসর অ্যামানো। পুরোনো স্টাফ এমন কেউ আছেন, যার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারব?'

ম্লান একটু হাসলেন প্রফেসর। 'শুধু আমি বেঁচে আছি,' বললেন তিনি, তারপর তাড়াতাড়ি নিজের মুখে একটা হাত তুললেন। হাইডিউকি ফুতামি এখনও মারা যাননি। তাতে মন খারাপ করতে রাজি নয় কাউরু, তবে তিক্তস্বরে হেসে উঠল।

প্রফেসর তাড়াতাড়ি বললেন, 'প্রজেক্টের একেবারে শেষদিকে আমার অংশগ্রহণ

BanglaBook.org

ছিল খুব সীমিত। গোটা প্রজেক্টের জনক যিনি, সেই ক্রিস্টোফ এলিয়টের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতে তুমি, কিন্তু তাঁর কোনো খোঁজ নেই, নিজেকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন তিনি...' কাউরুর দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যামানো, বলে যাচ্ছেন, 'ওহ্, এক ভদ্রলোককে চিনি বটে, যার এই প্রজেক্টের সঙ্গে বেশ ভালোই ঘনিষ্ঠতা ছিল। একজন আমেরিকান গবেষক। একটু অদ্ভুত কিসিমের মানুষ, টিমওয়র্কে তাঁর সমস্যা ছিল।'

'আপনি তাঁর নাম জানেন?'

'জানি, তবে...এক মিনিট, একটু দেখে নিই,' বলে চেয়ার ছাড়লেন প্রফেসর, পা চালিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মিনিট পর আবার যখন ফিরলেন তিনি, তাঁর হাতে একটা ফাইল ফোল্ডার দেখল কাউরু।

চেয়ারে বসে ওটার পাতা ওল্টাচ্ছেন অ্যামানো। 'আহ্, এই তো পেয়েছি,' বিড়বিড় করলেন, মাথা না তুলেই কাউরুর দিকে তাকালেন। 'ভদ্রলোকের নাম রথম্যান। কেনেথ রথম্যান। পেটে ছিল আর কি, মুখে ছিল না।'

নামটা মুখস্থ করছে কাউরু।

ওর মনে পড়ছে এই ভদ্রলোক ওর বাবার একজন পুরোনো বন্ধু। পাঁচ বছর আগে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি: ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে টোকিও বে দেখতে পাওয়া যায়, ওদের পরিবারের সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিজের একটা ছবি তুলেছিলেন কেনেথ রথম্যান।

ঠিক মনে করতে পারছে না কাউরু, খুব সম্ভবত একটা কনফারেন্স উপলক্ষ্যে কদিনের জন্যে জাপানে এসেছিলেন তিনি, বাবা তাঁকে হোটেলে উঠতে না দিয়ে ওই কটা দিন নিজেদের বাড়িতে রাখেন।

সে-সব দিনের কিছু ব্যাপার কাউরুর মনে গভীর দাগ কেটে রেখেছে। রথম্যানের চেহারা একটু একটু স্মরণ করতে পারছে ও। মুখটা সরু, তাতে ছাগলদাড়ি; হাতে আর গলায় পরা সোনার চেইন চকচক করত; বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনো বিতর্কে যুক্তি দেখানোর ভঙ্গিটা ছিল তীক্ষ্ণ, তবে বাঁকা হাসিটুকু সবসময় লেপ্টে থাকত ঠোঁটের কোনে: পৃথিবীর ভবিষ্যত সম্পর্কে আশার আলো শোনানোর সময় তাঁর চেহারায় একটা অন্য রকম আলো ফুটে উঠত।

কাউরুকে লক্ষ করছেন প্রফেসর অ্যামানো।

'এই ভদ্রলোক সম্পর্কে ফুতামি-সেনসে তোমাকে কিছু বলেছেন?'

'হ্যাঁ। বাবার বন্ধু তিনি। তাঁর সঙ্গে আমারও একবার দেখা হয়েছে, পাঁচ বছর আগে। ভালো করে শুধু তাঁর দাড়িটার কথাই মনে আছে এখন তিনি কোথায়?'

'এই ফাইল বলছে, ক্যামব্রিজ থেকে লস অ্যালামস ল্যাবরেটরিতে চলে গেছেন ভদ্রলোক। ওটা নিউ মেক্সিকোয়। গেছেন অনেকদিন আগে, দশ বছর। এখনও

BanglaBook.org

ওখানে আছেন কিনা কে বলবে।'

নিউ মেক্সিকো।

নামটা শোনামাত্র মাথার ভেতর যেন বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেলো কাউরু। তাড়াহুড়ো করে চেয়ার ছাড়ল সে, কামরার চারদিকে চোখ বুলাল, তারপর সোজা হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ওয়ার্ল্ড ম্যাপটার সামনে।

লস অ্যালামস। নিউ মেক্সিকো।

জায়গাটার ওপর আঙুল রাখল কাউরু।

নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা, উটাহ আর কলোরাডো, এই চারটে রাজ্য যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই ফোর কর্নার থেকে খুব একটা দূরে নয় ওটা, যেখানে ওদের বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান আছে।

দশ বছর আগে ওখানে চলে গেছেন কেনেথ রথম্যান। কাউরু ভোলেনি, এমএইচসি ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম লোকটাকে পাওয়া গিয়েছিল নিউ মেক্সিকোয়। কোইন্সিডেন্স একের পর এক স্তূপ হচ্ছে...

মানচিত্রের সামনে থেকে ফিরে এসে ধীরে ধীরে চেয়ারে বসল কাউরু। চোখ বুজল, শক্ত করল পাতা। একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছে ওর, গুরুত্বপূর্ণ কোনো সূত্র লুকানো আছে ওখানে।

মুখ তুলল কাউরু, চোখ খুলল, এক মুহূর্ত দেখল প্রফেসরকে।

'তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব?'

মাথা নাড়লেন অ্যামানো।

'সত্যি আমার সন্দেহ আছে।'

'কি কারণে?'

ধীরে ধীরে উত্তর দিচ্ছেন প্রফেসর।

'তাঁর সম্পর্কে আমি শেষ খবর পেয়েছি ছ'মাস আগে। যা শুনেছি তাতে আমার মাথা ঘুরে গেছে। কিন্তু তারপর অনেক চেষ্টা করেও আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। জানি না...'

'মাথা ঘুরে গেল কেন?'

'এমএইচসি ভাইরাস সম্পর্কে কি নাকি ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, আর তার চাবিটা আছে রাইয়োজি টাকাইয়ামার কাছে...পাগল করে দেয়ার মতো, তাই না?' কাউরুর দিকে তাকিয়ে নার্ভাস একটু হাসলেন প্রফেসর।

নড়েচড়ে বসল কাউরু।

'টাকাইয়ামা? ধরে নিচ্ছি কারও নাম? কার?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যামানো।

'তোমাকে সংক্ষেপে একটু বলি, আশা করি তা থেকে ব্যাপারটা তুমি বুঝে নিতে পারবে। লূপের ক্যানসারাইজেশন ঘটে একটা অজানা ভাইরাসের আবির্ভাবের

BanglaBook.org

মধ্যে দিয়ে, এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু ঘটনা ঘটার কারণে সে-সব ঘটনার মাঝখানে ছিল তিনটে আর্টিফিশাল লাইফ ফর্ম: একটার নাম টাকাইয়ামা, একটার নাম আসাকাওয়া, একটার নাম য়ামামুরা। অবশেষে এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসা হয়েছিল যে প্রাণের এই তিনটে প্রকার লূপকে ক্যানসারাস করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।'

'আর্টিফিশাল লাইফ ফর্মের নাম আছে?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে মিস্টার কেনেথ রথম্যান গায়েব হয়ে গেছেন, টাকাইয়ামা নামটা ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি?'

'হ্যাঁ ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি আমি...যা দিনকাল পড়েছে, তাছাড়া বয়সও তো কম হয়নি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর আমি ধরে নিই তিনিও বোধহয় ক্যানসারের হাতে ধরা পড়েছেন।' হাত দুটো উঁচু করলেন প্রফেসর অ্যামানো। 'বিশেষ করে তাঁর বেলায় সেটাই হবার কথা।'

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কাউরু, ওর মনে হচ্ছে প্রফেসর সম্ভবত আরও কিছু বলবেন।

'ওয়েন'স রক বলে দুর্গম একটা শহরে নিজস্ব ল্যাব আছে তাঁর। অসুস্থতা পেয়ে বসলে বা গুরুতর কিছু ঘটলে একা থাকার মতো আদর্শ জায়গা, সবার নাগালের বাইরে থাকা যায়, আবার কারও মনে কোনো সন্দেহও জাগে না।'

'ওয়েন'স রক?'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর অ্যামানো।

'হ্যাঁ–ওয়েন'স রক, নিউ মেক্সিকো আসলে ভুতুড়ে একটা শহর, বুঝলে, অন্ত ত আমার তাই ধারণা।'

চেয়ার ছেড়ে আবার মানচিত্রের সামনে ফিরে গেল কাউরু, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আঙুল রাখল।

ওয়েন'স রক, নিউ মেক্সিকো।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো কাউরুর, রথম্যান যেন ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন ওখানে, নিজের ল্যাবে।

আঙুলটা এখনও মানচিত্রে, ঘাড় ফিরিয়ে প্রফেসর অ্যামানোর দিকে তাকাল কাউরু। 'টাকাইয়ামা আর আসাকাওয়া, ওগুলোকে নিয়ে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, আপনি সবগুলো দেখেছেন–পুরো সিরিজ?'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর অ্যামানা

'না। আমার ধারণা খুব কম স্টাফই ওগুলো দেখেছে। মেমোরি জমা আছে আমেরিকায়, এখানে নয়।'

এটা শুনে কাউরুর আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

BanglaBook.org

'আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে...ওটা দেখার?'

'একটু হয়তো সময় লাগবে, তবে অসম্ভব বলতে পারি না। যদিও আমি মনে করি তুমি আসলে নিজের সময় নষ্ট করছ মাত্র,' জবাব দিলেন অ্যামানো।

কাউরুর আঙুল এখনও মানচিত্রের ওপর।

তেরো

অনেকদিন পর আবার বাড়ির ঝুল-বারান্দায় বেরিয়েছে কাউরু, রাতের আকাশে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে দূরে। চোখ নামিয়ে পানির দিকে তাকাল। খাঁড়ির কালো পানিতে খুচরো একটা ঢেউও দেখা যাচ্ছে না। রাতটা আজ গরম, এক ফোঁটা বাতাস নেই। দর দর করে ঘামছে সে।

আজ রাতে আকাশটাকে অন্যরকম দেখছে কাউরু–আসলে আজ বিকেলে প্রফেসর অ্যামানো লূপ সম্পর্কে ওকে যা বলেছেন তা শোনার পর থেকে সবকিছু অন্য দৃষ্টিতে না দেখে পারছে না। ছেলেবেলায়, বিশ্বকে বোঝার আকাঙ্ক্ষা এতটা তীব্র ছিল, অনুভব থেকে জন্ম নেয়া অন্ধবিশ্বাস তৈরি হয় ওর মনে: মিটমিট করা তারাগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মানেটা নিশ্চয় বুঝতে পারবে।

মহাবিশ্বের শেষে কী আছে? এ-ধরনের কাঁচা প্রশ্ন জাগত মনে।

এই মুহূর্তে সাজানো-গোছানো বিশ্বের দিকে তাকিয়ে ওর কল্পনা শক্তি ধারণা দিতে পারছে না, মহাবিশ্বের বাইরে কি থাকতে পারে।

নিজেকে লূপের একজন বাসিন্দা বলে কল্পনা করতে চাইল কাউরু। নিজেকে সে এমন একটা অস্তিত্ব বলে ভাবল, যার সময় আর বিস্তৃতি [স্পেস] সম্পর্কে ধারণা আছে; সেক্ষেত্রে ওই বিশ্বকে সে কীভাবে ব্যাখ্যা করত?

বেশিরভাগ সম্ভাবনা, তার বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে বলে ভাবত সে। সময়ের পরিবর্তনশীল প্যাসেজের সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে লূপ। প্রোগ্রামটা শুরু হওয়ার আগে কিছুই ছিল না ওখানে। সিলিকন চিপস-এর একটা পাহাড়, হ্যাঁ, তা ছিল; কিন্তু ছিল না সময়, ছিল না স্থান বা বিস্তৃতি। কিন্তু যে মুহূর্তে রিসার্চ সেন্টারের স্টাফ প্রোগ্রামটা শুরু করল, একটা বিস্তৃতি তৈরি হতে লাগল বিস্ফোরণের গতি নিয়ে।

বিগ ব্যাঙ

পাতালে ঠাঁই পাওয়া নিবিড় সমান্তরাল রেখায় সাজানো সুপার- কমপিউটারের ভেতর লূপের বিস্তৃতি অস্তিত্ব পায়নি, ঠিক যেমন সিনেমায় থাকা একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিসত্যি ওই পরদার ভেতর নেই। ওই স্পেস, বিস্তৃতি, শূন্যতা–যাই বলা

BanglaBook.org

হোক, না কমপিউটারের ভেতরে আছে, না কমপিউটারের বাইরে আছে। ওটা স্পেস বলে শুধু সেই অস্তিত্বের অভিজ্ঞতায় ধরা দেবে যে অস্তিত্ব ওটাকে স্পেস বলে চিনতে পারবে। প্রাণের প্রকার [লাইফ ফর্ম] যখন আবির্ভূত হলো, ওগুলোর ভেতর যখন সচেতনতা জন্মাল, ওই স্পেস নিশ্চয়ই প্রসারিত হয়েছে–যেন সেই চোখের সামনে থেকে পালাচ্ছে, যে চোখ ওটাকে চেনার জন্যে খুঁজছে।

চোখ তুলে আবার সত্যিকার আকাশের দিকে তাকাল কাউরু। যে বিশ্বের দিকে সে তাকিয়ে আছে সেটা প্রতি মুহূর্তে অসম্ভব দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে। হঠাৎ করে ওর মাথায় একটা চিন্তা খেলল: ব্যাপারটা হয়তো এরকমই সাদামাঠা যে স্রেফ পার্থিব ডিএনএ এবং সেটার সনাক্ত-করতে-পারার ক্ষমতাগুলো থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে স্পেস। এই সম্ভাবনা কাউরু বাতিল করে দিতে পারল না যে বাস্তব মহাবিশ্ব লূপের মতোই একটা 'ধরে নেয়া' বা কাল্পনিক স্পেস।

এই ব্যাখ্যা কি অসুবিধেজনক কোনো সমস্যা তৈরি করছে?

না, তা করছে না। আসলে, কাউরু অনুভব করল, বাস্তব দুনিয়াটাকে হাইপোথেটিকাল ধরে নিলেই বোধহয় সত্যের কাছাকাছি থাকা হয়। হয়তো প্রাচীন চিন্তাধারাই–বৌদ্ধদের যেমন ধারণা, আকার-প্রকার ফাঁকা; কিংবা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র–বাস্তবতাকে ধরতে ভালো ভূমিকা পালন করেছে।

যদি কেউ ধরে নেয় যে মহাবিশ্ব স্রেফ একটা ভার্চুয়াল বিস্তৃতি, তাহলে সেখানে এই সম্ভাবনা থাকে যে সেটার ওপর নজর রাখা হচ্ছে বিস্তৃতির মধ্যে খোলা একটা জানালা দিয়ে, ঠিক মানুষ যেভাবে উঁকি দিয়ে দেখতে সক্ষম হচ্ছে লূপ দুনিয়াকে। সময় আর বিস্তৃতি ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারলে, নির্দিষ্ট একটা জায়গার নির্দিষ্ট একটা মুহূর্তের ছবি মনিটরে উন্মোচিত হবে ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

কাউরু ওর এক হাতের ওপর অপর হাতটা রাখল, তারপর সেটা বুকে সরিয়ে আনল, পেটে রাখল, আরও নীচে নামাল।

ব্যাপারটা এরকম নাকি যে আমি শুধু চিন্তা করি আমার একটা শরীর আছে, যেখানে আসলে সত্যিসত্যি কিছু নেই?

কিন্তু ওর শরীরে নাভীর খানিক নীচে ছোট্ট একটা অঙ্গ রয়েছে, এবং ওর ভেতর যে আকাঙ্ক্ষা আছে তা ওটা থেকে উৎসারিত হয়। ওগুলো বাস্তবতাবিবর্জিত. এটা কাউরু বিশ্বাস করতে পারছে না।

ওটা যখন স্পর্শ করল, আঙুল বুলাল, রাইকোর কথা মনে পড়ল ওর রাইকোকে পেতে ইচ্ছে করল।

ওর পেছনে কাঁচ লাগানো দরজা, সেটার পেছনে কেউ নেই টেলিভিশনে একটু আগে যা চলছিল এখন তা আর চলছে না। ওর মা সম্ভবত নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ঠেলে দিয়েছেন, মগ্ন হয়ে আছেন নেটিভ আমেরিকান মিথে।

পেছনদিকে তাকাল কাউরু, তারপর নিজের অঙ্গটিকে সেই জানালার দিকে

BanglaBook.org

টাওয়ার হওয়ার অনুমতি দিল, যে জানালা মহাশূন্যের কোথাও হয়তো থাকতে পারে; অনুমতি দিয়েছে এটা যেন নিজ অস্তিত্ব পেতে অটল থাকে।

রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে কাউরুর: *মাংস একটা কাল্পনিক বস্তু হতে পারে না। রাইকোর শরীর কোনোমতেই স্রেফ একটা বস্তুহীন কাহিনি নয়।*

চৌদ্দ

চারপাশে এক ধরনের আড়ষ্ট অন্ধকার। ওকে এই মাত্র জানানো হয়েছে এমন দুটো বাস্তবতা বিবেচনায় নিল কাউরু। দুটোই চরম দুঃসংবাদ, যেগুলো মেনে নিতে সময় লাগছে ওর।

এগুলো আসছে বলে জানত, কিন্তু এখন আসার পর অস্বাভাবিক শক্ত হয়ে গেছে শরীর, বাবার দিকে তাকিয়ে ভয় পাচ্ছে তিনি না ধরে ফেলেন।

কয়েক মিনিট আগে এই হাসপাতালেই, রিয়োজির কামরায় ছিল কাউরু। টেস্ট করার জন্যে যেইমাত্র রিয়োজিকে কামরা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাইকোর সঙ্গে উন্মত্ত শারীরিক খেলায় মেতে উঠল সে।

পরে ওখান থেকে বেরিয়ে বাবাকে দেখতে এখানে এসেছে কাউরু। আসার পর যা শুনল, মনে হলো হাসপাতালের মতো একটা স্পর্শকাতর জায়গায় যৌনক্ষুধা মেটানোর শাস্তি পাচ্ছে সে।

রাইকোর গায়ের গন্ধ এখনও ওর নাকে লেগে রয়েছে, এখনও নিজের শরীরের এখানে-সেখানে ওই অপরূপ নারীর কোমল স্পর্শ অনুভব করছে। গভীর কোষীয় স্তরে এখনও ওর উত্তেজনা স্তিমিত হয়নি। অনুরাগের রেশ রয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাবার ঘরে চলে আসার জন্যে নিজের ওপর ক্ষোভ হচ্ছে এখন তার।

গত কদিনে ওর বাবা যেন আরও শুকিয়ে গেছেন—বুকের ওপর চাদরটা এত অল্প ফুলে আছে যে ওদিকে তাকালেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাউরু স্মরণ করতে পারে ওই পেশিবহুল বুকে দু'হাত দিয়ে যত জোরে পারা যায় ঘুসি মারত সে, তার বাবা এতটুকু নড়তেন না বা আওয়াজ করতেন না।

অত্যন্ত শক্তিশালী একটা শরীরের অধিকারী ছিলেন হাইডিউকি, একজন বিজ্ঞানীকে যেটা সাধারণত মানায় না। এখন চাদরের দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যায় ওটার নীচে কঙ্কাল শোয়ানো আছে।

কাজেই এটা শুনে আর বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে এখন নিশ্চিতভাবে জানা

BanglaBook.org

গেছে ক্যানসার সত্যি তাঁর ফুসফুসে ছড়িয়েছে। কিন্তু তারপরও এই খবর শুনতে চায়নি কাউরু–চিন্তাটা কতদিন হলো মাথা থেকে সরিয়ে রেখেছিল ও! এর তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওর, কার ওপর জানে না।

'শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকো না কোথাও বসো!' দাঁড়িয়ে থাকা কাউরুর মধ্যে রাগ, কিন্তু হাইডিউকির গলার আওয়াজ আজ খুব নরম। এতক্ষণে কাউরু সচেতন হলো, খারাপ খবর দুটো শোনার পর থেকে দাঁড়িয়ে আছে সে

বাবার কথা শুনে একটা টুলে বসল কাউরু। হঠাৎ করেই ওর রাগ পড়ে আসছে, নিঃস্ব লাগছে নিজেকে।

'তুমি কি অপারেশন করছ?' নিজের গলাই ফাঁপা লাগল কানে।

হাইডিউকির উত্তর তৈরি করাই ছিল। 'না, আর নয়।'

কাউরুরও একই মত। ফুসফুস থেকে ক্যানসার কেটে ফেলে দিলেও বাবার জীবনকে লম্বা করা যাবে না। শেষ পরিণতি অত্যন্ত পরিষ্কার বরং ভয় আছে অপারেশনে তাঁর আয়ু কমে যেতে পারে।

'হ্যাঁ।' বাবার দৃঢ়তার জবাব দিল কাউরু।

'তবে আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। এই ব্যাপারটা সত্যি খুব জঘন্য হয়ে উঠেছে!' খানিক আগে প্রফেসর সাইকি যে খবরটা দিয়ে গেছেন, সেটার কথা বলছেন হাইডিউকি।

দ্বিতীয় দুঃসংবাদ হলো জাপান ও আমেরিকায় একই সময়ে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পশুর ওপর চালানো একটা এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল। এর আগে পর্যন্ত মনে করা হত মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস শুধু মানুষকে আক্রমণ করে: একমাত্র মানুষ আক্রান্ত হতে পারে, এবং এর প্রভাবে শুধু মানুষের দেহকোষে ক্যানসার হতে পারে। কিন্তু সবেমাত্র শেষ হওয়া পরীক্ষায় দেখা গেছে সেটা ঠিক নয়, ইঁদুর আর গিনিপিগও এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

এটা এখনও পরিষ্কার নয় যে ভাইরাসের ভেতর কোনো রকম রূপান্তর ঘটার ফলে এরকম হচ্ছে কিনা। এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে ভাইরাসটা প্রথম থেকেই মানুষ ছাড়া অন্য প্রজাতির প্রাণীদেরও সংক্রমিত করতে পারত, কিন্তু এতদিন বিজ্ঞানীদের চোখে সেটা ধরে পড়েনি। এখন উদ্বেগের ব্যাপার হলো, মানুষের সংস্পর্শে আসে এমন সব পশুপাখির জীবন হুমকির মুখে পড়ে গেল।

কুকুর, বিড়াল ছাড়াও আরও অনেক ছোট আকৃতির প্রাণী ওই ভাইরাসের বাহক হবে। তা যদি ঘটে, তাহলে যে গতিতে ছড়িয়েছে, এখন তারচেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে ছড়াবে এই ভাইরাস।

বাস্তব দুনিয়ার ঘটনাপ্রবাহ আরও বেশি নির্দয় সাদৃশ্য নিয়ে লূপের শেষ পর্যায়কে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণ করছে ওখানে সব ধরনের লাইফ-ফর্ম প্যাটার্নকে ক্যানসারের শিকার করা হয়েছে।

BanglaBook.org

এক্ষেত্রেও মিলটা যদি কাজ করে, পৃথিবীর বুকে সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এমএইচসি ভাইরাস তার হামলা বন্ধ করবে না।

এমনকি কাউরু যদি রাইকোর কাছ থেকে ভাইরাসটা নাও পেয়ে থাকে, ওর শরীরে ঠিকই অনুপ্রবেশ করবে ওটা—হয় এ পথে, নাহয় ও পথে। এটা এড়াবার কোনো উপায় নেই।

অন্তত এভাবেই রাইকোর সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা যুক্তিসিদ্ধ করতে চেষ্টা চালায় কাউরু। তবে যে কেয়ামত ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সেটা কল্পনা করার দরজায় তালা মেরে দিয়েছে ও।

ওর বাবার গলা ভেসে এল যেন অনেক দূর কোথাও থেকে।

'হাহ?'

'কি হে, তুমি আমার কথা শুনছ না?'

'দুঃখিত।'

ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন হাইডিউকি। 'অ্যামানোর সঙ্গে তুমি কথা বলেছ, ঠিক? কেমন বুঝলে বলো আমাকে।'

প্রশ্নটা অস্পষ্ট লাগল কাউরুর।

'তাঁর কিছু কথা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালেন হাইডিউকি। 'সেটাই প্রত্যাশিত।'

'বাবা, এটা কি সত্যি মানুষ এইমাত্র খেয়াল করছে যে বাস্তবতা দেখতে লাগছে লূপ যেভাবে তৈরি করেছে?'

'লূপ প্রজেক্ট শুরু হয়েছিল আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে, টিকেছে সতের বছর। আমি যোগ দেয়ার পাঁচ বছর পর প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে যায়। সেটা বিশ বছর আগের কথা। ওই জগৎ আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। কথাটা সত্যি, লূপের ওভাবে শেষ হওয়া নিয়ে আমি মাত্র গত কদিন থেকে উদ্বেগ বোধ করছি।'

বাবার এই বক্তব্য পুরোপুরি অবিশ্বাস্য লাগল কাউরুর।

দশ বছর আগে, হাইডিউকি যখন লূপ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, কাউরুকে বলতে রাজি হচ্ছেন না প্রজেক্টটা কীভাবে শুরু হলো, তার পেছনের কারণটা কী ছিল?

লূপ ওভাবে শেষ হওয়াটাই তো সেই কারণ, নাকি? ভার্চুয়াল স্পেসের ভেতর প্রাণের সমস্ত প্রকার হারাচ্ছে বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা, হয়ে উঠছে কর্কটাক্রান্ত, ছুটছে বিলুপ্তির পথে—এটা দশ বছর বয়সী একটা ছেলেকে বলার মতো গল্প নয়।

সন্দেহ নেই হাইডিউকি চাননি তাঁর ছেলে ওই গল্প বাস্তব জগতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুক, তার পর থেকে সমস্ত জিনিস কীভাবে শেষ হয় বুঝতে পেরে অস্বাস্থ্যকার একটা ভীতিতে ভুগুক।

হাইডিউকি মনে করতেন সব ছেলেমেয়ে রোদ ঝলমলে সোনালি ভবিষ্যত

BanglaBook.org

দেখতে পাবে, আর সেজন্যেই তিনি তাঁর ছেলেকে লূপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন। তারমানে লূপ এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে তাঁর মনের কানাচে কোথাও একটা উদ্বেগ প্রথম থেকেই ছিল!

'বাবা, লূপ ক্যানসারাস হয়ে ওঠার পেছনে কারণ...

'কারণ রিং ভাইরাসের আবির্ভাব।'

'এমন হতে পারে, প্রোগ্রামে কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে ওটা?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না হাইডিউকি। চিন্তা করছেন।

'কেন এ-কথা বলছ?'

'কারণ কেউ বলতে পারছে না ভাইরাসটা এল কীভাবে। এমনি এমনি ওটা আসতে পারে না। কাজেই, ওটা যদি ভেতরে না জন্মে থাকে, তাহলে কি এটা ভাবাই স্বাভাবিক নয় যে বাইরের কোথাও থেকে এসেছে?'

'হুম।'

'আমি ঠিক বলছি না?'

'প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাওয়ার পর তাতে যদি কেউ কিছু প্রবেশ করাতে শুরু করে, গোটা এক্সপেরিমেন্ট বাতিল হয়ে যেত। সিকিউরিটি ছিল ত্রুটিবিহীন, এ ব্যাপারে আপস করা হয়নি।'

এই পর্যায়ে সেই ভদ্রলোকের নাম বলল কাউরু। 'তুমি কেনেথ রথম্যানকে তো চেনো, ঠিক?'

এখনও মুখ সিধে করে বিছানায় শুয়ে আছেন হাইডিউকি, চোখ ঘুরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'কেন, ওর কিছু হয়েছে নাকি?' কর্কশ, ঘরঘরে গলায় জানতে চাইলেন। ভাবছেন, আরেকটা মৃত্যু?

'তুমি জানো তিনি এখন কোথায় আছেন?'

'শুনেছিলাম নিউ মেক্সিকোতে আছে, কৃত্রিম প্রাণ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, হঠাৎ তুমি...'

'হ্যাঁ, একসময় ধরে নেয়া হয়েছিল লস অ্যালমসের ল্যাবে চলে গেছেন তিনি। কিন্তু এখন কোথায় আছেন কেউ জানে না। আর, নিখোঁজ হবার ঠিক আগে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলে গেছেন।'

'মানে? কী বলে গেছে?'

'বলে গেছেন এমএইচসি ভাইরাস রহস্য তিনি ভেদ করেছেন, আর চাবিটা আছে টাকাইয়ামার কাছে।'

'টাকাইয়ামা...'

কাউরু জানতে চাইল, 'বাবা, লূপে টাকাইয়ামাকে নিয়ে যে দৃশ্য আছে, তুমি সেটা দেখেছ?'

প্রশ্নটা আবার হাইডিউকিকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিল। শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে

BanglaBook.org

পড়েছেন, কিছু একটার খোঁজে মরিয়া হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে তাঁর দৃষ্টি। কি যেন স্মরণ করতে চাইছেন।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে একটা ধাক্কা খেয়েছেন হাইডিউকি। এটা স্বাভাবিক যে কয়েকটা বড় ধরনের সার্জারি আর ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের পর তাঁর স্মৃতিশক্তি অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেছে। স্মৃতির অন্ধকার গহ্বরে তল্লাসি চালিয়েও যা খুঁজছেন তা না পাওয়ায় নিজের ওপর রাগ হচ্ছে তাঁর।

'মনে হয় না দেখেছি...'

প্রসঙ্গ বদলে বাবার মনটা শান্ত করতে চাইল কাউরু। 'ওহ্, বাবা, আরেকটা কথা এমএইচসি ভাইরাসের সিকোয়েন্স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে, ঠিক?'

'দুদিন আগে ওটার একটা প্রিন্টআউট নিয়ে এসেছিল সাইকি।'

'হ্যাঁ, এই সংখ্যাগুলো একবার দেখো।'

প্রিন্টআউটটা বাবাকে দেখাল কাউরু, প্রতিটি জিনের সর্বমোট বেইস চিহ্নিত করে রেখেছে মার্কার দিয়ে।

'কী জানতে চাইছ তুমি?'

'বেইস নম্বরগুলো দেখো।'

৩০৭২–৩৯৩,২১৬–১২,২৮৮–৭৮৬,৪৩২–২৪,৫৭৬– ৪৯,১৫২ –১৯৬,৬০৮ –৬১৪৪–৯৮,৩০৪।

যেভাবে সাজানো আছে ন'টা সংখ্যা সেভাবে পড়লেন হাইডিউকি, কিন্তু কাউরুর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকালেন তা দেখে মনে হলো না বিশেষ কিছু তাঁর চোখে ধরা পড়েছে।

ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করল কাউরু। 'Get this, Dad. All nine of these numbers equal two to the nth power times three.'

শুনে আবার সংখ্যাগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন হাইডিউকি। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'Nice catch! '

তাঁর চোখে পুরোনো সেই আলো ফিরে এলো, তবে তা মুহূর্তের জন্যে মাত্র। তবে কাউরুর নজর এড়ায়নি। ওর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, ভাবল, কতদিন বাবা এভাবে তার প্রশংসা করেনি?

'এটাকে তুমি কোইন্সিডেন্স বলে মনে করো?'

'তা হওয়ার কথা নয়। নটা সংখ্যার সবগুলো–তার মধ্যে কিছু আবার ছয় অঙ্কের–এভাবে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? খুবই কম। যখনই এরকম কোনো অস্বাভাবিক কম সম্ভাব্যতা দেখা যায়, তার একটা অর্থ থাকে। কথাটা তুমিই আমাকে বলেছিলে, দশ বছর আগের এক রাতে।'

দুর্বল একটু হাসি ফুটল হাইডিউকির ঠোঁটে।

সেই রাতের ঘটনাগুলো বার বার স্মরণ করছে কাউরু। সেটাও এরকম একটা

BanglaBook.org

গরম দিন ছিল। ওর কচি মনে অফুরন্ত আনন্দ ছড়াচ্ছিল উত্তর আমেরিকার মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়ার স্বপ্নটা। তারপর কত কিছু ঘটে গেছে, কত মন খারাপ করা ঘটনার মধ্যে পার হচ্ছে ওদের সবার জীবন, কিন্তু তবু ওখানে যাওয়ার সেই আকাঙ্ক্ষাটা আগের মতোই তাজা আছে ওর ভেতর। এখনও ওই জায়গা প্রচণ্ড আকর্ষণ করে ওকে।

হাইডিউকি আর কাউরু যখন ওদের একসঙ্গে কাটানো অতীত রোমন্থনে মগ্ন, কামরার বাইরে করিডরে অকস্মাৎ হইচই আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল।

দুই কি তিনজন লোক ছুটে গেল দরজার সামনে দিয়ে, ইমার্জেন্সি এলাকা থেকে দূরে হাসপাতালের এই অংশে সেটা স্বাভাবিক নয়। কাউরুর মনে একটা সতর্কতা জাগল, কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে সে।

নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল, মিশে আছে কর্তৃত্বের সুরে নির্দেশ দেয়া কিছু পুরুষকণ্ঠের মধ্যে। মেয়েলি গলাটা চেনা চেনা লাগল কাউরুর। শুধু চিৎকার না, কাঁদছে সে।

তারপর চিনতে পারল কাউরু, ওটা রাইকোর গলা।

'মাফ করো,' বলল কাউরু, বাবার দিকে একবার তাকিয়ে টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে করিডরে বেরোল কাউরু। ছুটন্ত এক তরুণীকে দেখতে পেল, গার্ডের ইউনিফর্ম পরা দুজন লোকের পিছু নিয়ে ওর কাছ থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে।

তরুণীর গায়ে সাধারণ একটা হলুদ ড্রেস, পেছনের চেইনটা সবটুকু তোলা নয়। খুব বেশিক্ষণ হয়নি ওই ড্রেসের চেইন নিজের হাতে খুলেছিল কাউরু। ওটার ওপর সাদা ওই ঘাড় ওর খুব চেনা।

ও রাইকো।

রাইকোর পায়ে মোজা নেই, শুধু স্যান্ডেল দেখতে পাচ্ছে কাউরু; আরেকবার তাকাতে খেয়াল করল, মাত্র ওই একটা পায়েই স্যান্ডেল পরে আছে সে। ফলে তার হাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা কাঁধ বারবার উঁচু-নিচু হচ্ছে। সন্দেহ নেই খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে আছে রাইকো, তা না হলে অসুস্থ ছেলেকে কামরায় একা রেখে বেরোত না।

জরুরি পরিস্থিতি ভেবে পিছু নিল কাউরু, রাইকোর নাম ধরে ডাকছে।

রাইকোর কানে বোধহয় কিছু ঢুকছে না, ঢুকলেও ঘাড় ফিরিয়ে পেছনদিকে তাকাত। গার্ডদের সঙ্গে একটা বাঁক ঘুরল সে, দরজা পার হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুল, এলিভেটরের পাশে।

শুনবে কি, নিজেই তো সারাক্ষণ চিৎকার করছে রাইকো। কিন্তু কি বলে চিৎকার করছে সেটা ধরতে পারছে না কাউরু, শুধু মনে হলো যেন কারও ধরে

BanglaBook.org

ডাকছে। সবার চেঁচামেচির মধ্যে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না কার বা কি নাম।

'রাইকো!'

ওদের পিছু নিয়ে ছুটছে কাউরু। এক টানে সিঁড়ির দরজা খুলে ফেলল, লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ভারী মাল-পত্তর তোলা ও নামানোর জন্যে এখানে একটা ফ্রেইট এলিভেটর আছে।

আরও একটু পেছনে ইমার্জেন্সি সিঁড়ির দিকে যাওয়ার ফায়ারপ্রুফ দরজা। গুরুতর কোনো পরিস্থিতিতে দুদিক থেকেই খোলা যায় ওই দরজা, তবে বিনা অনুমতিতে ঢুকলে সেটা ধরা পড়বে সিকিউরিটি মনিটরে, ছুটে চলে আসবে গার্ডরা। তবে, অবশ্যই, ডিজাইনটা এমনভাবে করা হয়েছে যে লাফ দিয়ে কেউ মরতে চাইলে সেটা যাতে ঠেকানো যায়।

রাইকো আর গার্ড দুজন ইমার্জেন্সি সিঁড়ির দরজা খুলল, তাদের কাঁধের ওপর দিয়ে বাচ্চাটাকে দেখতে পেল কাউরু। সিঁড়ির বাইরের দিকে দেয়ালে একটা জানালা আছে, লাল ত্রিভুজ দিয়ে চিহ্নিত করা: ভেতর কিংবা বার, দুদিক থেকেই খোলা যায় ওই জানালা, জরুরি পরিস্থিতিতে ভেতরে ঢোকার জন্যে দমকল বাহিনীর কর্মীরা যাতে ব্যবহার করতে পারে।

এই মুহূর্তে জানালাটা খোলা। আর, শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, ওই জানালার গোবরাটে বসে রয়েছে রিয়োজি।

চোখে ব্যঙ্গ নিয়ে আতঙ্কিত বড়দের দিকে তাকিয়ে আছে বাচ্চা ছেলেটা। সে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পা দুটো ঝুলিয়ে রেখেছে, মন চাইলেই লাথি মারছে বাতাসে। চোখে-মুখে এতটুকু ভয় নেই।

রিয়োজিকে ওখানে দেখা মাত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গার্ডরা। নরম সুরে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছে তারা।

'ঠাণ্ডা হও।'

'শান্ত হও।'

'এ কাজ করো না।'

'ওখান থেকে নেমে এসো।'

'রিয়ো!' ফুপিয়ে উঠল রাইকো, তাকিয়ে আছে ছেলের দিকে নয়, ওর মাথার ওপর সরু চৌকো সিলিংয়ের দিকে।

রিয়োজি মনে হলো বুঝতে পেরেছে ওর মার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউরু। ওদের চোখ এক হলো। তারপর কোটরের ভেতর চোখ দুটো ঘোরাল রিয়োজি, ফলে এখন শুধু চোখের সাদা অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, তারপর পেছন দিকে হেলান দিল। কাউরুর শেষ মুহূর্তের দৃষ্টি রিয়োজির চোখে যা দেখতে পেল, তখন আর তা বেঁচে নেই।

এক সেকেন্ড পর, পেছনে ডুবন্ত সূর্য, নিজেকে সেদিকে ফেলে দিল রিয়োজি। আধ সেকেন্ডের মধ্যে চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

পনের

আলোড়িত পানিতে হাত ডুবিয়ে বাথটাবের পাশে বসে রয়েছে কাউরু, তাপমাত্রায় সঙ্গতি আনছে, গোসল করতে গিয়ে যাতে পুড়ে না যায়।

বাথটাবে শোয়ার পর চাবি ঘুরিয়ে পানির কল বন্ধ করে দিল। একটু পর একদম নীরব হয়ে গেল বাথরুম। ছুটির দুপুর না হওয়া সত্ত্বেও এভাবে গোসল করাটা ওর জন্যে স্বাভাবিক নয়।

চোখ বুজল, খাড়া করল কান। তারপর ভাঁজ করা হাঁটু বুকের কাছে তুলে ভ্রূণের আকৃতি নিল। এরকম একটা অনুভূতি হলো ওর: পানি ওর হৃদ্‌স্পন্দন লুফে নেয়ায় খুচরো ঢেউ তৈরি হচ্ছে বাথটাবে।

মনটাকে খালি করতে চাইছে কাউরু, কিন্তু পারছে না। একই দৃশ্য বার বার ফিরে আসছে।

রিয়োজি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি সিঁড়িঘরের জানালা থেকে লাফ দিয়ে মারা যাওয়ার পর প্রায় এক সপ্তা পেরিয়ে গেছে।

সাহায্য করো আমাকে। সাহায্য করো রিয়োজিকে।

কাউরুর চোখের সামনে রিয়োজি নিজের কচি জীবনটার ইতি টেনেছে, ওর মার আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করে।

রিয়োজির লাফ দেয়াটা কাউরুকে মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। ঘটনাটা ঘটার ঠিক আগের ও পরের মুহূর্তগুলো, পেছন দিকে হেলান দেয়ার সময় রিয়োজির চোখে ফাঁকা দৃষ্টি, রাইকোর আর্তনাদ। অতি ক্ষুদ্র বিবরণসহ সব ছবি আর সব শব্দ গেঁথে গেছে ওর মগজে। রোজ রাতে, মাফ নেই, ওর স্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসছে দৃশ্যটা।

লাফ দেয়ার পরপরই কাউরু, রাইকো এবং বাকি সবাই রিয়োজিকে দেখার জন্যে জানালার দিকে ছুটেছিল। নীচে তাকিয়ে অস্বাভাবিক বাঁকাচোরা একটা ভঙ্গিতে পাকা মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখল তারা ওকে। রক্তের কয়েকটা ধারা, সবগুলো একই দিকে যাচ্ছে–দিগন্তের কাছে থাকা সূর্যের আলোয় ওগুলোর লালচে-কালো রঙ চকচক করছে।

ওখানে দাঁড়িয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল রাইকো। ওকে তুলে নিল কাউরু। রিয়োজিকে ইমার্জেন্সিতে পাঠাবার ব্যবস্থা করল ও, তবে চোখে দেখেই বুঝে নিয়েছে ডাক্তারদের আর কিছু করার নেই। বারোতলা থেকে কংক্রিটের ওপর পড়লে বেঁচে থাকার আশা বলতে গেলে শূন্য।

আবার কখনও কাউরু রিয়োজির রক্তের দাগটুকু শুধু দেখতে পায় ওর স্বপ্নে। হাসপাতালের পাকা চত্বরের এক ধারে ওই দাগ এখনও লেগে আছে। বাচ্চাটার

BanglaBook.org

জীবন শেষ হয়ে গেলেও, সেটা ওই হাঁটাহাঁটির পথের ওপর একটা অদৃশ্য ছায়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। কাউরু ওটার কাছাকাছি হতে পারে না।

রিয়োজির আত্মহত্যা আবেগতাড়িত। তবে এর মধ্যে বিবেচনা করার মতো কিছু ব্যাপারও আছে। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর, সোজা চলে গেছে ইমার্জেন্সি সিঁড়িঘরের জানালায়। ওর নিশ্চয়ই জানা ছিল একমাত্র ওখানকার জানালাগুলোই ভেতর থেকে খোলা যায় সন্দেহ নেই বেশ আগে থেকেই ওগুলোর ওপর নজর রাখছিল সে

আত্মহত্যার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সিনটেগ্রাম নেয়া শেষ করেছিল, শুরু হতে যাচ্ছিল চার নম্বর কেমোথেরাপি। আবার সেই অসহ্য ভোগান্তি শুরু হতে যাচ্ছে, এই চিন্তা নিশ্চয়ই ওকে আতঙ্কিত করেছে। সেই আতঙ্ক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে ওকে। ওর এই যুদ্ধ এমন একটা শত্রুর বিরুদ্ধে যার সঙ্গে জিততে পারবে না ও। দুদিন আগে হোক বা পরে, থেমে যাবে ওর জীবন, এবং তার আগে পর্যন্ত শুধু নরকতুল্য যন্ত্রণাভোগ।

কোনটা ভালো, বোঝার জন্যে নিশ্চয়ই দুটো বিকল্পের মধ্যে তুলনা করে দেখেছে রিয়োজি–আয়ু সামান্য একটু বাড়িয়ে নিতে গিয়ে নিজের জন্যে আরও যন্ত্রণা ডেকে আনবে, নাকি জীবনটাকে কেটে ছোট করে ওই যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে দেবে শরীরটাকে?

কাউরুর ধারণা, রিয়োজি অবশ্যই আরও একটা ব্যাপার বিবেচনা করেছে–ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে হওয়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছে মা।

এমএইচসি ভাইরাস ক্ষতবিক্ষত করছে ওর শরীরকে, এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে রিয়োজি। ওর এই অনুভূতিটা ভালোই বুঝতে পারছে কাউরু। এই ব্যাপারটা ছুঁয়ে গেছে ওকে–এমন একটা বিপর্যয়, ওর ঘাড়ে এসে চাপতে খুব বেশি সময় নেবে না। এই শত্রুর সঙ্গে কাউরুকেও লড়তে হবে। রিয়োজির আচরণ বোঝে ও। তবে তারমানে এই নয় যে ওকেও ওভাবে জীবনের ইতি টানতে হবে।

যে শত্রু তোমার শরীর আর তারুণ্যকে ধ্বংস করতে চায় তার সঙ্গে লড়তে হলে তোমার সমস্ত বুদ্ধিমত্তাকে এক করতে হবে।

এটা ওর বাবার কথা। মৃত্যুকে যদি ফাঁকি দিতে চায়, যুদ্ধ করতে হবে ওকে। শুধু যুদ্ধ করলে হবে না, সেই যুদ্ধে জিততেও হবে। আর সেই যুদ্ধ লড়ার জন্যে ওর কাছে শুধু একটা অস্ত্রই আছে।

বাবা যেমন বলেছেন: ওর বুদ্ধিমত্তা।

বাথটাবের আরও গভীরে ডুবে গেল কাউরু। পানি এখন ওর কানের লতি স্পর্শ করছে।

আমার কি সে ধরনের শক্তি আছে?

এ নিয়ে যত ভাবছে ততই আশ্চর্য লাগছে ব্যাপারটা। এমএইচসি ভাইরাসের সঙ্গে জড়িত এত সব ঘটনা ওর কাছাকাছি কোথাও থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে

BanglaBook.org

আসছে, চলে আসছে ওর শরীরের ওপর, যেন পৃথিবীকে বাঁচানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে।

নিজেকে তুমি খুব বড় করে দেখছ।

পানির তাপ আর সহ্য করা যাচ্ছে না, বাথটাব ছেড়ে বেরিয়ে এল কাউরু। তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে।

পৃথিবীকে রক্ষা করা, এই চিন্তার মধ্যে রোমাঞ্চকর একটা নেশা আছে। ওকে যদি হিরোর মতো দেখায়, কিছু মনে করবে না কাউরু– রক্ষাকর্তা সাজতে তার খারাপ লাগবে না। তবে প্রথমে একটা ব্যক্তিগত কাজ সারতে হবে ওকে। সেটা বৈশ্বিক কিছু নয়, মাপে স্থানীয়। চলতি সপ্তায় আজ প্রথমবারের মতো রাইকোর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আছে ওর।

গা থেকে পানি ও ঘাম মুছে, মাথায় চিরনি চালিয়ে, নতুন টি-শার্ট আর জিনস পরল কাউরু।

রিয়োজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর রাইকোকে আর দেখেনি কাউরু। সেই থেকে ওর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে রাজি হয়নি রাইকো। অবশেষে আজ সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাব দিয়েছে রাইকো।

এটাই একমাত্র সুযোগ হতে যাচ্ছে কাউরুর। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে শুধু আজকের রাতটাই কেবল ওর হাতে আছে: কি কারণে রাইকো ওর হৃদয়ের দরজা কাউরুর জন্যে বন্ধ করে দিয়েছে?

ষোলো

জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় চূড়ায় রাইকোর কন্ডো। জমকালো একটা দালান, তিনতলা, বাইরেটা লাল ইঁট।

ভেতরে ঢুকে রাইকোর কামরার নম্বর লেখা বোতামে চাপ দিল কাউরু, সাড়া পাওয়ার আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যান্ত হলো স্পিকার, কানে ঢুকল রাইকোর নরম গলা, 'চলে এসো।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

হাসপাতালে রিয়োজির জন্যে প্রাইভেট কামরা ভাড়া নিয়েছে দেখে কাউরু আগেই আন্দাজ করেছিল, রাইকোর আর্থিক কোনো সমস্যা নেই। কার্পেট মোড়া করিডর ধরে এলিভেটরের দিকে যাওয়ার সময় আজ উপলব্ধি করল ওর অনুমান ভুল হয়নি।

না, কাউরু কখনও জানতে চেষ্টা করেনি এত টাকা কোত্থেকে আসছে। ও

BanglaBook.org

জানতে চায়নি, রাইকোও যেচে পড়ে ওকে কিছু বলেনি। তবে এরকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছে রাইকো, সমাজে সফল একজন ব্যক্তি ছিলেন ওর স্বামী। তুলনায় ওর চেয়ে তাঁর বয়স বেশি ছিল, ক'বছর আগে ক্যানসারে মারা গেছেন।

চারতলার একটা কোনে রাইকোর অ্যাপার্টমেন্ট। বেল তখনও বাজায়নি কাউরু, খুলে গেল দরজা। দরজার ফুটোয় চোখ রাখছিল রাইকো, জানত কাউরুর পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?

এক সপ্তা হতে চলেছে ওকে দেখেনি কাউরু। দরজা সামান্য একটু খুলে মাথাটা বের করল রাইকো।

দুজন মুখোমুখি।

রাইকোর সব চুল কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে পেছনে জড়ো করা, আটকে রাখা হয়েছে ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে। কপালের পাশে দু'চারটে সাদা চুল দেখতে পেল কাউরু।

'ভেতরে এসো,' গলার আওয়াজ যেন ওর ভেতরই ফিরে যাচ্ছে।

'অনেক দিন পর দেখা হলো।'

কাউরুকে নিজের লিভিং রুমে নিয়ে এল রাইকো। একটা কাউচে বসল কাউরু। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না। কাউরু অস্বস্তি বোধ করছে। ও জানে না কি কারণে ওর সঙ্গে এরকম ঠাণ্ডা ব্যবহার করা হচ্ছে। আর, তা না জানায়, ভেবে পাচ্ছে না কি ওর বলা উচিত বা কীভাবে শুরু করবে।

কাউরুর সামনে বরফ দেয়া এক গ্লাস বার্লি চা রাখল রাইকো, তারপর ওর মুখোমুখি বসল। নীরবতা ভাঙছে না।

'তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল,' বলে হাত বাড়াল কাউরু।

কিন্তু ওর স্পর্শ এড়িয়ে গেল রাইকো, দুজনের মাঝখানে দূরত্ব বাড়াতে সোফায় ভেতর প্রায় ডুব দিল।

এই একই ব্যাপার ঘটেছে রিয়োজির অন্তিম অনুষ্ঠানেও। একমাত্র সন্তান হারানোর শোক আর বেদনায় সে-ই শুধু রাইকোকে সান্ত্বনা দিতে পারবে, সাহস করে এরকম ভেবেছিল কাউরু। কালো কাপড়ে মোড়া ওর কাঁধে একটা হাত রাখতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু ঝাঁকি খেয়ে সরে গেছে রাইকো।

হতে পারে মেয়েদের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, তবু এরকম আচরণ পুনরাবৃত্তি হলে কাউরুরও ধরতে না পারার কথা নয় কি বার্তা বহন করছে সেটা। কিন্তু এই জেদি প্রত্যাখ্যান কি কারণে, এটা ওর একদম মাথায় ঢুকছে না। একদিন ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্ক ছিল, পরদিন ওর স্পর্শে রাইকো কুঁকড়ে উঠছে।

নিজেকে শক্ত আলিঙ্গনে জড়াল রাইকো, হাত দিয়ে বাহু দুটো ডলছে, যেন ঠাণ্ডা লাগছে ওর। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনিং কমানো আছে, কামরাটা মোটেও ঠাণ্ডা নয়। কাউরুর তো আসলে গরমই লাগছে।

BanglaBook.org

কামরার সাজসজ্জা দেখছে কাউরু, ভাবছে কি করলে বুঝতে পারবে রাইকোর মনের ব্যথাটা ঠিক কোথায়, আশা করছে সে যদি শুধু সন্তান হারানোর কষ্টে ওকে দূরে সরিয়ে রেখে থাকে তাহলে তার মন ভালো করে দেয়ার একটা উপায় এখনও পেয়ে যেতে পারে ও।

এমন কিছু বলতে চাইছে কাউরু, রাইকোকে সেটা যেন সাহস যোগায়, নরম করে ওর হৃদয়কে।

কিন্তু একমাত্র যে বাক্যটি ওর মনে এল সেটা শুনতে এত দুর্বল আর বানোয়াট লাগছে যে নিজেই বিব্রত বোধ করল। 'আরে, একটু হাসো তো!' ওর জীবন বিপণ্ন হলেও ওকে দিয়ে এই কথা উচ্চারণ করানো যাবে না। কাজেই আলাপ শুরু করার কোনো উপায় করা যাচ্ছে না।

'কিছু না বলে ওখানে তুমি কতক্ষণ বসে থাকবে?' কথাটা ঠাণ্ডা সুরে বলল রাইকো, মেঝের দিকে তাকিয়ে।

কাউরুকে এটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল। রাইকোর আচরণেই বোবা হয়ে বসে আছে ও, অথচ সেই রাইকোই এখন চুপ করে থাকার জন্যে তিরস্কার করছে ওকে। আর, মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকার মানে কি?

'আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি,' অবশেষে বলতে পারল কাউরু।

'তুমি...'

মাথাটা দু'হাতে ধরল রাইকো, ওর গোটা শরীর কেঁপে উঠল। কাঁদছে ও, একটু পর পর ফোঁপানোর আওয়াজ পাচ্ছে কাউরু।

'তোমার কষ্ট দেখতে আমার ভালো লাগেনি। আমি তোমাকে শান্তি দিতে চেয়েছি, কিন্তু কীভাবে কী করতে হয় আমার জানা নেই।'

গুঙিয়ে উঠে ওর দিকে তাকাল রাইকো, কামড়ে ধরেছে নীচের ঠোঁট। চোখ দুটো এখন লালচে, গাল দুটো ভেজা ভেজা।

'তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই আমি খুশি হতাম।'

ধাক্কা খেলো কাউরু:

'তারমানে এখন তুমি আমাকে ঘৃণা করো?'

তা সম্ভবই নয়, চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল কাউরুর। রাইকো সত্যি যদি ওকে ঘৃণা করত, ওর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হত না। এখনকার এই আড়ষ্ট পরিস্থিতি এড়াবার সহজ উপায় খোলা ছিল তার সামনে—বাকিগুলোর মতো ওর শেষ ফোনটাও ধরত না।

সেই সহজ উপায়টা কাজে লাগায়নি রাইকো। এই আলাপ সে চেয়েছে, শর্ত দিয়েছে সময়সীমা মাত্র একঘণ্টা। নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে কিছু একটা নিয়ে কথা বলতে চায়। জরুরি, নাকি শুধু গুরুত্বপূর্ণ?

'ও জানত।' হঠাৎ করে রাইকোর গলা চমকে ওঠার মতো শান্ত।

BanglaBook.org

'কী?'

'আমার আর তোমার ব্যাপারটা।'

'মানে, আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি?'

'প্রেম? ও, আচ্ছা, প্রেম তাহলে এরকম দেখতে?' রাইকোর মুখে নিজেকে বিদ্রূপ করা হাসি।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে কাউরুর, হতচকিত দেখাচ্ছে ওকে। *প্রেমে পড়লে তাহলে কী রকম দেখায়!*

'কী জানত রিয়োজি?'

'তুমি আর আমি ওই কামরায় যা করছিলাম।'

রাইকো আর কিছু বলতে পারল না।

কষ্ট করে একটা ঢোক গিলল কাউরু, বলল, 'না, তা ওর জানার কথা নয়। কী করে জানবে?'

'বুদ্ধিমান ছেলে। যেভাবেই হোক ধরে ফেলেছিল। বোকামির চূড়ান্ত করেছি আমরা। কীভাবে পারলাম...কীভাবে ওরকম কিছু করতে পারলাম?' অনুশোচনা আর রাগে ওর বুক যেন ভেঙে যাবে।

'কিন্তু...'

'রিয়োজি ওর নোটবুকে লিখে রেখে গেছে।'

'হাহ্?'

'কি লিখেছে জানো তুমি?'

আবার ঢোক গিলল কাউরু, শক্ত করল নিজেকে।

কথাটা বলার আগে রাইকোও ঢোক গিলল। 'লিখেছে–"আমি থাকছি না, কাজেই তোমরা দুজন যত খুশি চালিয়ে যেতে পারবে"।'

উহ্, না।

রিয়োজিকে স্মরণ করল কাউরু–হাসছে, দাঁড়িয়ে আছে সুইমিং পুলের কিনারায়, ব্লু সুইম ক্যাপ মাথার পেছনে নামানো, চোখে গগলস, কোমরে ডোরাকাটা কাপড়ের ঢোলা শর্টস, কথাগুলো বারবার আওড়াচ্ছে: *আমি থাকছি না, কাজেই তোমরা দুজন যত খুশি চালিয়ে যেতে পারবে...আমি থাকছি না, কাজেই তোমরা দুজন যত খুশি...*

যথেষ্ট সাবধান ছিল ওরা। পরস্পরের সঙ্গে শুধু তখনই দেখা করত যখন কমপক্ষে দু'ঘণ্টার জন্যে টেস্ট করতে নিয়ে যাওয়া হত রিয়োজিকে। তাছাড়াও, মূল কাজটা শেষ করতে দশ মিনিটের বেশি সময়ও নিত না। দুজনের চাহিদা মতো সন্তুষ্ঠি আসার পর, বাকি সময়টুকু কেঁদে ফেলার উপক্রম করে কাটাত, চোখে অলস বিষণ্ণতা কিংবা অনুশোচনা নিয়ে পরস্পরকে অপলক দেখত। মাঝে মধ্যে রাইকোর চোখের পানিতে চুমো খেয়ে ফিসফিস করত কাউরু, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

BanglaBook.org

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া মানুষের মতো একটা বিশেষ ছন্দে আগুপিছু দোল খাচ্ছে রাইকো, যেন রিয়োজির সুইসাইড নোট পড়ার পর ওর বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। দৃষ্টি স্থির, চোখে পলক নেই।

তারপর আবার কাঁদতে শুরু করল।

ওকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিচ্ছে কাউরু। এছাড়া করারও কিছু নেই ওর। একসময় নিজেই থামবে রাইকো, পুরো কান্নাটা শেষ হলে।

ব্যাপারটা রিয়োজির দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করতে চাইছে কাউরু: তার টেস্টের সময়টা ফাঁকা দেখতে পেয়ে সুযোগ নিচ্ছে মা– যে সময়টা সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রণায় ভোগে সে–নিজের আনন্দে গা ভাসাতে। রিয়োজির হিসেবে এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা।

তার পাশে থেকে মারও তো এই যুদ্ধটা লড়ার কথা, কিন্তু তা না করে, তাকে একা লড়তে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে মজা করছে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে তার মোহ কেটে গিয়েছিল।

বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে লড়াই করার ইচ্ছেটা সে হারিয়ে ফেলেছিল। কাউরুর ধারণা ছিল রিয়োজির আত্মহত্যা অসুস্থতার কাছে এক ধরনের আত্মসমর্পণ, কিন্তু এখানেও আবার বাস্তবতা অন্য রকম হয়ে দেখা দিচ্ছে।

এর আগে পর্যন্ত রিয়োজির মৃত্যুতে, তুলনায়, খুব অল্প শোকই অনুভব করেছে কাউরু, কারণ জানে ওর নিয়তির বিধান অনুসারে আর কদিন পর এমনিতেই মারা যেত বেচারি।

কাউরু ভাবল, তার নিজের সময় হতে আর খুব বেশি দেরি আছে বলে মনে হয় না, কাজেই সে যদি তখন অবশিষ্ট সময়কে নিজে ছোট করে আনতে চায়, হয়তো সেটা এভাবে ছোট করাটাই ভালো হবে।

এই চিন্তা এক ধরনের স্বস্তি দিল ওকে।

কিন্তু মার আচরণ যদি রিয়োজিকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিয়ে থাকে...হঠাৎ করে রিয়োজির চিন্তাধারা যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে আরও বেশি জটিল লাগল কাউরুর।

সন্দেহ নেই রিয়োজিরও এই একই অনুভূতি হয়েছিল। প্রাইভেট একটা রুমের জন্যে অতিরিক্ত টাকা গুণেছে রাইকো, ছেলে একদিন সুস্থ হয়ে স্কুলে ফিরে যাবে ধরে নিয়ে তাকে পড়ানোর জন্যে প্রাইভেট টিউটর রেখেছে, এবং যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই চেষ্টা করেছে ছেলে যেন জীবনের প্রতি উৎসাহ ধরে রাখে

যখন তুমি জানো যে কেউ একজন মারা যাচ্ছে, তোমার ভালোবাসা তখন সেই ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয় তুমি তার পাশে থেকে যুদ্ধ করতে চাইছ। রিয়োজিকে তার মা দেখাতে চেয়েছিল একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাশে থাকবে সে, কিন্তু বাস্তবে তা না থেকে ওকে ওর পথে একা ছেড়ে দিয়েছিল।

BanglaBook.org

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল রিয়োজি! আর এখন সেটা উপলব্ধি করতে পেরে অনুতাপে ভুগছে রাইকো, জানে সে-ই তার ছেলেকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে

নিজের এই উন্মত্ততা কাউরুর দিকে তাক করল রাইকো, এই অপরাধে যে তার সঙ্গী ছিল। কাউরু এখন বুঝতে পারছে ও যখন রাইকোর কাঁধে হাত রাখতে গেল, কেন পালিয়েছিল সে। রিয়োজির স্মৃতি ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে রাইকো চেয়েছে কাউরু তাকে যেন মুহূর্তের জন্যেও ছুঁতে না পারে।

কাউরুর এখন চিন্তা করার জন্যে সময় দরকার। বয়স এখনও কম ওর, এরকম পরিস্থিতিতে কি করতে হয় জানা নেই। ব্যাপারটা অনেক সহজ হত ও যদি সম্পর্কটা ভেঙে দিতে চাইত। কিন্তু সেটা করার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। এই সংকটে যা কিছুই ভেঙেচুরে গিয়ে থাকুক, কোনো একটা উপায়ে মেরামত করে নিতে মরিয়া সে।

'তুমি আমাকে কিছুটা সময় দিতে পার?' নিজের অনুভূতির প্রতি সৎ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাউরু কিছু সময় অপেক্ষা করতে চায়, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক করবে তাদের কি করা উচিত।

'না।' সবেগে মাথা নাড়ল রাইকো।

'কিন্তু কি করব আমি জানি না।'

'আমিও জানি না। আর তাই...'

এখানেই সমাধান নিহিত। ওদের সম্পর্ক চিরকালের জন্যে শেষ করার জন্যে আজ ওকে এখানে ডেকে পাঠায়নি রাইকো। স্বীকার করল, সে-ও হাবুডুবু খাচ্ছে, জানে না কি করতে হবে। সিদ্ধান্তটা একা নিতে পারছে না।

মাত্র এক ঘণ্টা থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে এসেছে কাউরু, কিন্তু জানালার বাইরে এখনই হেমন্তের সূর্যকে অস্ত যেতে দেখছে ওরা। তখন বর্ষাকাল, গ্রীষ্মের প্রথমদিক, রাইকোকে যখন চিনতে শুরু করেছিল কাউরু। ওদের দুজনের একসঙ্গে থাকা হয়েছে মাত্র তিন মাস। তবে কাউরুর মনে হচ্ছে যেন কত যুগ।

সেদিন সন্ধ্যায় ওদের বেশিরভাগ সময় নীরবতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। মাঝে-মধ্যে যখন দুজনের কেউই বুঝতে পারেনি এরপর কি বলতে হবে, এরকম বিরতিগুলো দশ মিনিট কিংবা তারও বেশি লম্বা হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও রাইকো একবার বলেনি কাউরু তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

কাউরুর মনে হলো রাইকোর এই আচরণে অস্বাভাবিক কি যেন একটা আছে। বেশ কয়েকবার কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারেনি সে, একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছে নিজেকে।

'রাইকো, আমার কাছে কি যেন গোপন করছ তুমি। ঠিক না?'

কাউরুর এই কথা রাইকোকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। মুখ তুলে ওর দিকে

BanglaBook.org

তাকাল সে। তার মুখের ভাব যেন চ্যালেঞ্জ করছে কাউরুকে।

'আমি বোধহয় প্রেগন্যান্ট।'

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল কাউরু।

'তুমি প্রেগন্যান্ট?'

'হ্যাঁ।'

চোখাচোখি হলো ওদের, কাউরু বুঝল রাইকো সত্যিকথা বলছে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের ফলে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে বিদ্যুতের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা স্রেফ মাথায় নিতে পারছে না ও। তারমানে জন্ম এবং মৃত্যু হাসপাতালের ওই ছোট্ট কামরাটায় প্রায় আক্ষরিক অর্থেই পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতো মারছিল? জগতের নির্দয় প্রহসন কাউরুর হৃদয়কে তিক্ততায় ভরে তুলল। চোখে ধরা পড়ে না এরকম একটা অশুভশক্তির উপস্থিতি অনুভব করছে ও।

'ও, আচ্ছা

খুব জোরে বাতাস নিয়ে ফুসফুস ভরল কাউরু।

'তুমি বলো আমার কি করা উচিত?' প্রশ্ন করল রাইকো।

'আমি চাই ওকে তুমি আসতে দেবে।'

কথাটা বলার সময় সামনের দিকে ঝুঁকল কাউরু। এই সম্পর্কটা যখন শুরু করেছিল, লোভ কিংবা ঝোঁকের মাথায় শুধুই একটা খেলা হিসেবে নেয়নি ও। ওদের মেলামেশার কারণে যদি একটা বাচ্চা চলে আসে, তাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছে কাউরু—ও চায় ওরা একসঙ্গে থাকবে।

'কী বলছ তুমি?'

হাত বাড়াল রাইকো, পত্র-পত্রিকা রাখার র‍্যাক থেকে সেদিনের খবরের কাগজটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল কাউরুর দিকে। আজ সকালের সংস্করণ।

কাগজটার দিকে না তাকিয়েও কাউরু জানে রাইকো ওকে কি বলতে চাইছে। লেখাটা আজ সকালে ও-ও পড়েছে

আমেরিকা, আরিজোনা রাজ্যের খবর। খবরের সঙ্গে মরুভূমিতে জন্মায় এরকম কিছু গাছের ছবি ছাপা হয়েছে।

ফ্ল্যাগস্টাফ আর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান, এই দু'জায়গার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে হাইওয়ে ১৮০, সেটার পাশে হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেছে ওই গাছ আর ঝোপ খবরে বলা হয়েছে, খয়েরি মাটিতে খাটো হয়ে জন্মানো ওই গাছ আর ঝোপগুলোর কাণ্ড থেকে শুরু করে পাতার ডগা পর্যন্ত অদ্ভুত আকৃতির নকশা নিয়ে ফুলে আছে।

সচরাচর দেখা না গেলেও, অস্বাভাবিক বিকাশ ও বিকৃতির জন্যে সাধারণত কিছু প্লান্ট ভাইরাসকে দায়ী করা হয়। কিন্তু এই নমুনাগুলো ভাইরাল ইনফেকশনের এমন একটা মাত্রা ইঙ্গিত করছে, আগে যা কখনও শোনা যায়নি। কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা আর পাতার মূল আকৃতি একেবারে বদলে দিয়েছে।

BanglaBook.org

সমস্ত লক্ষণ একটা ভাইরাসের দিকে আঙুল তুলছে। আসলে, কেউ কেউ এরকমও ভাবছেন যে কালপ্রিট এমএইচসি ভাইরাসের একটা রূপান্তরিত সংস্করণ হওয়াও অসম্ভব নয়। পৃথিবী জুড়ে মানুষের জীবন ছিন্নভিন্ন করেও সাধ মেটেনি, তারপর পশু-পাখিদের দিকে হাত বাড়িয়েছে, এখন আবার ধরেছে গাছপালাকে।

এই কিম্ভূতকিমাকার গাছ সংকেত দিচ্ছে পৃথিবী ধ্বংস হতে আর বেশি দেরি নেই। কেয়ামত এল বলে, এরকম একটা সুর তুলে শেষ হয়েছে রিপোর্টটা।

রাইকো বাহক, শুধু এখনও অসুস্থ হয়ে পড়েনি। সম্ভাবনা খুবই বেশি যে তার পেটের বাচ্চা ক্যানসার ভাইরাসসহ জন্ম নেবে। তার ওপর, চিন্তা করার আরও একটা বিষয় হলো, যে-দুনিয়ার সমস্ত জীবিত প্রাণকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে একটা ভাইরাস, সেখানে ওই বাচ্চার জন্ম দেয়া উচিত হবে কিনা।

আমি চাই ওকে তুমি আসতে দেবে, কাউরুর জন্যে এটা বলা খুব সহজ, খেপে গিয়ে মেজাজ দেখাল রাইকো।

'আমাকে তুমি বলো, এই দুনিয়ার কোন জায়গাটায় আশা করার মতো কিছু আছে?'

লূপে কি ঘটেছে? শেষদিকে রিং ভাইরাস এসে সমস্ত লাইফ ফর্ম প্যাটার্নকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে, সব কটাকে বাধ্য করছে বিলুপ্ত হতে। রাইকোর কঠিন প্রশ্নের এটাই তো স্বাভাবিক উত্তর, তাই না?

এখানেও ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। অনুকরণ বা অনুসরণ, যাই বলা হোক, বাস্তবতা এখন লূপের দেখানো পথ ধরতে যাচ্ছে।

কিন্তু এই উত্তর উচ্চারণ করতে রাজি নয় কাউরু।

'আমি শুধু চাই তুমি কিছুটা সময় দাও আমাকে, ঠিক আছে?'

প্রার্থনা করতে বাধ্য হলো কাউরু। এখনই কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না ও। এটা জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপার।

রাইকো নিজের অবস্থার ব্যাখ্যা দিল।

'ভাবছ সিদ্ধান্তে আসতে দেরি করলে আমাদের সামনে একটা পথ খুলে যাবে? এটা আমাকে ক্লান্ত আর অসুস্থ করে তুলেছে। সত্যি বলছি আমি অ্যাবরশন চাই না। এটা তুমি বুঝতে পারছ না? ও যেন আমার হারানো ছেলের জায়গাটা পূরণ করতে আসছে। অবশ্যই ওকে আমি আনতে চাই, বড় করতে চাই, রক্ষা করতে চাই। কিন্তু তা আমি স্রেফ পারি না, কারণ আমি জানি আমার এই শিশুও প্রথমটার মতো একই ভাগ্য নিয়ে আসতে পারে। পৃথিবীতে জন্মাবে শুধুই যন্ত্রণা ভোগ করার জন্যে, একটু বয়স হতেই মারা যাবার জন্যে। হেলপ মি, প্লিজ। কি করা উচিত আমি জানি না!'

রাইকোর পাশে বসতে চাইছে কাউরু, চাইছে রাইকো তার আবেদন ওর কানের কাছে মুখ তুলে বলুক। চাইছে ওকে জড়িয়ে ধরে রাখে, আশার কথা শুনিয়ে

BanglaBook.org

ওর মন থেকে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর করে দেয়। কিন্তু ভয় পাচ্ছে এত তাড়াতাড়ি তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ইচ্ছেটাকে দমন করতে হিমসিম খেয়ে গেল সে।

'তুমি তাহলে অ্যাবরশনের কথা ভাবছ না?' এই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে চাইছে কাউরু।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রাইকো।

'আমার সেই শক্তিও নেই।'

শিশুটিকে রাইকো ফেলে দিতে চায় না, এখনও, কিন্তু তারমানে এটা বোঝায় না যে ওকে পৃথিবীতে গ্রহণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চোখ দেখে যতটা পারা যায় রাইকোর আত্মার ভেতর তল্লাসি চালাচ্ছে কাউরু, মনে হলো তার চাহনিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের ছাপ পড়েছে। শিশুটিকে সে ফেলবে না, তবে ওর জন্মও দেবে না।

এর একটাই অর্থ...রাইকো কি বিকল্প উপায় হিসেবে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে?

কাউরুর এখন শুধু একটাই চাওয়া। ওর পৃথিবীতে রাইকো যেন বেঁচে থাকে। রাইকোকে ওর চাই।

ওর এই চাওয়া পূরণ করতে হলে রাইকোকে বিশ্বাস করাতে হবে বাস করার জন্যে এই পৃথিবী মোটেও খারাপ জায়গা নয়, প্রমাণ করতে হবে বেঁচে থাকা তুলনাহীন একটা মজা।

এটা সত্যি এবং প্রযোজ্য–ওর নিজের জন্যে, রাইকোর জন্যে, ওদের না জন্মানো সন্তানের জন্যে এবং বাকি সবার জন্যে। পৃথিবী একটা ভালো জায়গা। যত মজা সব এখানেই।

কিন্তু তার আগে কাউরুকে নিজের জীবনের মূল্য বুঝতে হবে। পৃথিবী বসবাসের উপযোগী, এটা অন্যদের কীভাবে বিশ্বাস করাবে, সে নিজেই যদি দুনিয়াকে ক্যানসারাইজেশন, জেনেটিক বিভিন্নতার সংকট আর বিলুপ্তির আশঙ্কার মধ্যে ফেলে রেখে চলে যেতে চায়?

ওর কাছে আমার প্রমাণ করতে হবে, ও যাতে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে না পারে।

একটাই উপায় আছে: পৃথিবীর গতিধারা বদলে দিতে হবে ওকে।

কী রকম সময় লাগতে পারে? দু'মাস? তিন মাস? রাইকোর পেট ফুলে ওঠার আগেই যদি সব ব্যবস্থা করা না যায়, একশ ভাগ সম্ভাবনা মৃত্যুকে বেছে নেবে সে। তাহলে মাত্র তিনমাস সময় পাচ্ছে সে; রাইকোর স্নায়ু তার বেশি ওকে শক্ত থাকতে দেবে না।

'তুমি আমাকে তিন মাস সময় দাও, প্লিজ। আমি তোমাকে আমার ওপর

BanglaBook.org

বিশ্বাস রাখতে অনুরোধ করছি।'

'তিন মাস?!' দুর্বল চিৎকার বেরিয়ে এল রাইকোর গলা থেকে। 'সম্ভব নয়, আমি পারব না। আমার শরীরে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, আমি জানি।'

'ঠিক আছে, তাহলে দু'মাস।'

চোখে রাগ নিয়ে ওর দিকে তাকাল রাইকো।

'আমি কোনো কথা দিতে পারছি না,' অবশেষে বলল সে।

'না। কথা দিতে হবে। পরবর্তী দু'মাস তুমি আত্মহত্যা করতে পারবে না, তা সে যাই ঘটুক না কেন।'

হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে রাইকোর দিকে ঝুঁকল কাউরু। ওর আকস্মিক আবেগ লক্ষ করে প্রথমে সিঁটিয়ে গেল রাইকো, তবে তারপর চেহারায় স্বস্তি ফুটল, আশ্চর্য একটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চোখ-মুখ।

ভাব দেখে মনে হলো সে বোধহয় দ্বিধায় ভুগতে রাজি নয় আর, যেকোনো একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। একবার দিক নির্ণয় করতে পারলে, তার ভোগান্তি কমবে, অন্তত কিছুটা হলেও।

কাউরু ভাবল, আপাতত ওর সঙ্গে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করা দরকার। শারীরিক অর্থে প্রত্যাখ্যান করে তাকে অসম্মান করা হয়েছে, সেই আঘাতটা সামলে নেয়ার জন্যে হলেও। দু'মাস ঠিক আছে।

'ঠিক আছে, দু'মাস,' বিড়বিড় করল রাইকো।

'হ্যাঁ। আজ থেকে দু'মাস পর আবার আমরা দেখা করব। তার আগে পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে, যাই ঘটুক না কেন।'

'শুধু বেঁচে থাকতে হবে?'

'তোমার হার্ট যদি সচল থাকে, ফুসফুস যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালিয়ে যায়, আর মাঝে-মধ্যে তুমি যদি আমার কথা এক-আধটু স্মরণ করো, সেটাই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

রাইকোর ক্ষীণ একটু হাসি দেখার সুযোগ হলো কাউরুর।

'শেষ অংশটার কথা আমি কিছু জানি না।'

এটাই সেদিন রাইকোর প্রথম স্বাভাবিক আর উজ্জ্বল হওয়া। কাউরুকে এটা খুব শান্তি আর স্বস্তি এনে দিল।

কাউরুর যেটা দরকার, কোনো প্রশ্ন না তুলেই ওকে বিশ্বাস করুক রাইকো। সে যদি খোঁজ নিতে শুরু করে–ধরা যাক, রাইকো যদি জিজ্ঞেস করে, ও যা করতে যাচ্ছে সেটা করতে পারা নিয়ে ওর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে কিনা, কাউরু তাকে সন্তুষ্ট করার মতো উত্তর দিতে পারবে না।

কাউরু শুধু জানে, বলা উচিত উপলব্ধি করে, ওর হাতে বেশ কটা সূত্র আছে। যে ফ্যাক্ট-এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নিঃ ভাইরাসের প্রতিটি জিনের বেইস সংখ্যা

BanglaBook.org

বেরিয়ে আসছে $2n \times 3$।

ঘটনা হলো–স্রেফ একটা অনুমান–কাউরুর নিজেরই কাছেপিঠে কোথাও থেকে ওই ভাইরাসের উৎপত্তি ঘটেছে। ওটার সৃষ্টিরহস্য যদি আবিষ্কার করা যায়, তাহলে হয়তো ওটাকে ধ্বংস করার পথও বের হয়ে আসবে।

হাতে দু'মাস সময় আছে। এর ওপর নিজের ও রাইকোর জীবন নির্ভর করছে, এই জ্ঞানের বোঝা মাথায় নিয়ে সমস্যাটার মুখোমুখি হতে হবে ওকে।

সতের

এলিভেটরে চড়ে ঊনত্রিশ তলায় ওঠার সময় কাউরুর কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। বায়ুর চাপ কমবেশি হলেও শরীরে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না, সেভাবেই এলিভেটরের ডিজাইন করা হয়েছে; কিন্তু তারপরও কানের ভেতর চাপ অনুভব করছে ও, যা আগে কখনও অনুভব করেনি। একই সঙ্গে পুরোনো একটা ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে।

রিয়োজির শরীর কংক্রিটে পড়ার সময় হাড় ভাঙার যে কড় কড় শব্দ হয়েছিল, সেগুলো এখনও কাউরুর কানে লেগে আছে।

বাচ্চাটাকে সত্যি সত্যি কংক্রিটের চাতালে পড়তে দেখেনি ও, যতদূর মনে করতে পারে দৌড়ে জানালার দিকে যাওয়ার সময় ওর পতনের শব্দ শুনেছিল। ব্যাপারটা এর বেশি কিছু নয়, শুধুই একটা ছাপ, অথচ শব্দটার স্মৃতি মুছে যেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

এই মুহূর্তে, ওকে নিয়ে এলিভেটর যখন ওপরে উঠছে, কিছু একটা সেই স্মৃতিকে উসকে দিয়েছে, ফলে চোখের সামনে এমন সব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে কাউরু, আগে যেগুলো কখনও সত্যি সত্যি দেখেনি ও।

বিষণ্ন মনে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলল কাউরু, বলল, 'আমি ফিরেছি।'

সাড়া নেই।

তা নিয়ে কিছু না ভেবে জুতো খুলল কাউরু, দরজার পাশে কেবিনেটে রাখল ওগুলো। আবার যখন মুখ তুলে তাকাল, ওর মা ম্যাচিকো যেন বাতাস থেকে চোখের সামনে উদয় হলেন।

'আমার সঙ্গে একটু এদিকে আসবে?'

কাউরু কিছু বলার সময় পেল না, খপ করে ছেলের হাত ধরে নিজের কামরার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ম্যাচিকো। যেন কিছু একটা আবিষ্কারের উত্তেজনায় তাঁর চোখ দুটো চকচক করছে।

BanglaBook.org

'কী ব্যাপার, মা?'

কাউরু বাধা দিচ্ছে না, মার উৎসাহ দেখতে ওর ভালোই লাগছে।

বেশ অনেকদিন হলো মার ঘরে পা রাখেনি। একসময় কামরাটা পরিচ্ছন্ন ছিল, এখন গুদাম বললেই হয়–চারদিকে বই, পত্রিকা আর ফটোগ্রাফের আগোছাল স্তূপ। শুধু কামরা নয়, ওর মার চেহারার বদলে গেছে। আসলে, তাঁকে দেখে এখন একজন নতুন মানুষ বলে মনে হয়। যদিও ওরা একসঙ্গে বাস করে, কাউরু উপলব্ধি করল মার মুখের দিকে বহুবছর সত্যিকার অর্থে তাকানো হয়নি।

'কি ঘটছে বলবে আমাকে?' কাউরুর স্নায়ু এমনিতেই ক্ষয়ে আছে। মাত্র কদিন আগে আত্মহত্যা করেছে রিয়োজি, কাজেই মার মানসিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত ও–অথচ মাকে সময় দিতে পারে না।

তবে ভাগ্যগুণে কাউরুর উদ্বেগ খেয়াল করছেন না ম্যাচিকো।

'আমি চাই এটা তুমি দেখো।'

কাউরুর হাতে একটা ম্যাগাজিন ধরিয়ে দিলেন তিনি। নাম –*ফ্যানট্যাসটিক ওয়ার্ল্ড;* ইংরেজিতে লেখা।

'কী দেখব?' বিরক্ত হয়ে বলল কাউরু, পত্রিকার নাম দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ও।

ছেলের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিয়ে দ্রুত হাতে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন ম্যাচিকো। সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা খুলে আবার সেটা ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে–স্বভাবের বাইরে গিয়ে একটু জোরেই।

'এই লেখাটা পড়ো।'

মার কথা মতো পড়ল কাউরু। লেখার শিরোনাম, **'মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরা: শেষ পর্যায়ের ক্যানসার থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ'।**

ওই ওরকম আরেকটা। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝল কাউরু। বেশ কিছুদিন থেকে ওর মা তাঁর সমস্ত মেধা আর শ্রম ঢেলে দিচ্ছেন ক্যানসার চিকিৎসার বৈপ্লবিক কোনো পন্থার খোঁজে। তবে সেটা তিনি খুঁজছেন আধুনিক ওষুধ-পত্রকে একপাশে সরিয়ে রেখে–অতিকথা, রূপকথা আর লোককাহিনির কাল্পনিক জগতে।

গাঁজাখুরি গল্প বলে এটাকে বাতিল করে দেয়া কাউরুর পক্ষে খুব সহজ। কিন্তু ইনি ওর মা, ব্যাপারটা বিরক্তিকর হলেও ওকে সহ্য করতে হবে। লেখাটা পড়তে শুরু করল।

কয়েক বছর আগে পোর্টল্যান্ডের [ওরেগান, ফ্র্যাঙ্ক বোর, অবসর নেয়া সার্ভেয়ার, এমএইচসি ভাইরাসে আক্রান্ত হন, তাঁর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ক্যানসার, ডাক্তাররা জানিয়ে দেন আর মাত্র তিন মাস বাঁচবেন তিনি।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক বোর ডাক্তারদের চিকিৎসা পদ্ধতি বাতিল করে দেন, তার বদলে তিনি কোথাও বেড়াতে চলে যান। তাঁর ভ্রমণের অংশ হিসেবে একটা নামবিহীন

BanglaBook.org

নির্দিষ্ট জায়গায় দু'সপ্তা ছিলেন ভদ্রলোক। অবশেষে এক মাস পর তিনি যখন ফিরে এলেন, পরীক্ষা করার পর অবিশ্বাসে মাথা নাড়তে লাগলেন তাঁর ডাক্তার। কারণ, অপারেশনের অযোগ্য রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন. তাঁর শরীরের কোথাও ক্যানসারের চিহ্নমাত্র নেই।

রোগীর বয়স ৫৭ বছর; তাঁর শরীর থেকে সেল সংগ্রহ করা হলো, পরীক্ষা করে দেখা হবে কতবার কোষীয় বিভাজন ঘটছে। যে ফলাফল পাওয়া গেল, ওই বয়সে যেটা স্বাভাবিক, তারচেয়ে কয়েক গুণ বেশি।

অন্য ভাষায়, ফ্র্যাঞ্জ বোর ওই অচিহ্নিত জায়গা থেকে উপহার হিসেবে দুটো জিনিস পেয়েছেন: এক হলো, তাঁর মৃত্যুদণ্ডের রায় বাতিল করা হয়েছে, এবং দুই [দুটো এক জিনিস নয়] –লঞ্জেভেটি।

কিন্তু ফ্র্যাঞ্জ, যিনি একা বসবাস করতেন, এই জাদু বা মিরাকল কোত্থেকে পেলেন তা কাউকে বলার আগেই একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এখন সবাই মরিয়া হয়ে জানতে চেষ্টা করছে কোথায় তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে কি তিনি করেছিলেন।

এরপর পড়ার মতো আর তেমন কিছু নেই। নাছোড় এক রিপোর্টার জানতে পেরেছিলেন, বোরকে যখন বলা হলো তিনি মারা যাচ্ছেন, লস অ্যাঞ্জেলসে যাওয়ার জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন তিনি। তবে লস অ্যাঞ্জেলসের কোথায় যেতে চাইছিলেন সে-ব্যাপারে কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি।

লেখাটার এই হলো সারমর্ম।

ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ম্যাচিকো, ছেলের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছেন। অলৌকিক উপায়ে আরোগ্য লাভ, এরকম আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। তবে কাউরু জানে, মা ওর কাছ থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করছেন। ধীরে ধীরে মুখ তুলল ও, চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে।

'কী মনে হলো তোমার?' জানতে চাইলেন ম্যাচিকো।

বোর সম্ভবত পোর্টল্যান্ড থেকে প্লেনে চড়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে, হতে পারে তিনি হয়তো আরিজোনা-নিউ মেক্সিকো মরুভূমির দিকে যাচ্ছিলেন। এটা মেলে।

'জানি তুমি কি বলতে চাইছ: বহুকাল ধরে আমি যে লঞ্জেভেটি জোনের কথা বলে আসছি, ফ্র্যাঞ্জ বোর সেখানে গিয়েছিলেন।'

ম্যাচিকো মাথা ঝাঁকানোর ঝামেলায় গেলেন না। তিনি তাঁর জ্বলন্ত চোখ জোড়া নিয়ে সামনের দিকে আরেকটু ঝুঁকলেন। দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে, এ-ব্যাপারে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই।

'আরও একটা প্রমাণ আছে।'

BanglaBook.org

'আরও প্রমাণ? কী?'

'এটা দেখো।'

নিজের পেছন থেকে একটা বই এনে কাউরুর হাতে ধরিয়ে দিলেন ম্যাচিকো, মুখে গম্ভীর হাসি।

বইয়ের নাম, *নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ান ফোকলোর*। নামের নীচে প্রচ্ছদের ছবিতে সূর্য দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে পাহাড়চূড়ায় দাঁড়ানো এক লোক, সেই লোকের মুখে সূর্যের পুরো আলো এসে পড়েছে।

স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ লোকটার মাথা পালক দিয়ে সাজানো, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে কালচে হয়ে গেছে, রোদের মধ্যে তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা ইঙ্গিত দিচ্ছে সে সম্ভবত প্রার্থনা করছে।

বইটা দেখতে খুব পুরোনো, প্রচ্ছদ ঝাপসা, প্রচুর নাড়াচাড়া করায় পাতাগুলোর কিনারা নোংরা হয়ে গেছে।

প্রথমে বইটার সূচির ওপর চোখ বুলাল কাউরু। তিন পৃষ্ঠা জুড়ে চুয়াত্তরটা কাহিনির নাম। প্রতিটি কাহিনির নামে অন্তত একটা করে শব্দ আছে যার অর্থ ওর জানা নেই।

যেমন Hiagua শব্দটির উদাহরণ দেয়া যায়–এটা আগে কখনও কোথাও ওর চোখে পড়েনি, এবং এখন দেখামাত্র বুঝতে পারল কোনো ইংলিশ অভিধানেও এটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আরও কিছু পাতা ওল্টাল কাউরু। কিছু ফটোগ্রাফ দেখতে পেল। তীর-ধনুক নিয়ে মাটিতে এক হাঁটু গাড়া লোক রয়েছে একটা ছবিতে।

বই থেকে চোখ তুলে সরাসরি মার মুখে তাকাল কাউরু, একটা ব্যাখ্যা পেতে চাইছে।

'এটায় উত্তর আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের লোককাহিনি আছে।'

'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি জানতে চাইছি তুমি আমাকে এর আগে যে লেখাটা পড়ালে, তার সঙ্গে এটার সম্পর্ক কী?'

এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করলেন ম্যাচিকো। ছেলেকে তিনি কিছু একটা শেখাতে পারায় যে মজা পাচ্ছেন, সেটা তাঁর কায়িক ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে।

'আদিবাসী আমেরিকানদের ছিল নানা ধরনের অভিকথা, আমরা যেটাকে মিথ বলি, আর ছিল ঐতিহ্য। কিন্তু তাদের লিখিত কোনো ভাষা ছিল না, কাজেই ওগুলোর বেশিরভাগই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মুখে মুখে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।'

বইটা ফেরত নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন।

'এর মানে হলো, এই চুয়াত্তরটা কাহিনি সংগ্রহ এবং রেকর্ড করেছে অ-

BanglaBook.org

ইন্ডিয়ানরা। দেখো।' একটা পৃষ্ঠা দেখালেন ম্যাচিকো। 'দেখছ? প্রতিটি গল্প শুরু হবার আগে জানানো হয়েছে কে এটা সংগ্রহ করেছেন, কবে এবং কোথা থেকে। এও বলা আছে কোন উপজাতি এটা হস্তান্তর করেছে।

মার দেখানো লেখাটার ওপর চোখ বুলাল কাউরু।

"পাহাড়চূড়া কীভাবে সূর্যের নাগাল পেল"– সোপাঙ্কা গোষ্ঠী

এরপর সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয়েছে কীভাবে এক শ্বেতাঙ্গ লোক সোপাঙ্কা উপজাতির সঙ্গে যোগাযোগ করল, গল্পটা শুনল, তারপর লিখে রাখল। অবশেষে শুরু হয়েছে মূল গল্প, পাহাড়চূড়া কীভাবে সূর্যের নাগাল পেল।

প্রতিটি গল্পই ছোট, বেশিরভাগ এক কি দু'পাতার মধ্যে শেষ হয়েছে। একই ধরনের নামকরণ–একটা মাত্র শব্দে নয়, পুরো বাক্যে।

'কাউরু, আমি চাই তুমি এই গল্পটা পড়ো।'

ম্যাচিকো বইটা খুলেছেন চৌত্রিশ নম্বর গল্পে, অন্তত শিরোনামের ওপর ৩৪ সংখ্যাটা লেখা আছে।

শিরোনামটা কাউরুর মগজে আলো ফেলল।

আরেকটা কোইন্সিডেন্স।

শিরোনাম হলো: *"বহু চোখের নজরে থাকা।"*

শিরোনামে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, তবে তা না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এতে ইঙ্গিত দেয়া হয়নি কার ওপর নজর রাখা হচ্ছে, কিংবা কারাই বা তার ওপর নজর রাখছে।

পিছু হটল কাউরু, একটা চেয়ারের খোঁজে পেছনটা হাতড়াল, তারপর বসল। বসেই পড়তে শুরু করেছে। সচেতন না হলেও, ম্যাচিকোর জগতে ঢুকে পড়েছে ও।

BanglaBook.org

বহু চোখের নজরে থাকা

- টালিকিট উপজাতি

[১৮৬২ সাল। গণযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, একটা কাভার্ড ওয়্যাগান ট্রেন সাউথওয়েস্টার্ন মরুভূমি পার হচ্ছে, যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। একজন শ্বেতাঙ্গ প্রিস্ট, বেঞ্জামিন উইক্লিফ, বাকি সব ওয়্যাগান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, অবশেষে তাঁকে উদ্ধার করে টালিকিট উপজাতি। তাদের সঙ্গে তিনি বেশ কয়েক বছর ওখানে বসবাস করেন।

এক শান্ত সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ানরা একটা ক্যাম্পফায়ারকে ঘিরে জড়ো হলো, তাদের

মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের একজন সবাইকে আজ একটা গল্প শোনাবেন। প্রিস্ট উইক্লিফ কাছাকাছি ছিলেন, তিনিও গল্পটা শুনলেন। আগুনের কমলা শিখা রাতের আকাশ ছুঁতে চাইছে, তার সঙ্গে যোগ হওয়া প্রবীণ ইন্ডিয়ানের কথার মধ্যে একঘেয়ে একটা সুর প্রিস্টের মনে গভীর ছাপ ফেলল। সেদিনই সন্ধ্যায় গল্পটা তিনি রেকর্ড করেন।]

প্রাণ আছে এমন সমস্ত কিছু একই উৎস থেকে জন্মেছে, সে বহু বহু আগে। সাগর, আর নদী, আর ভূমি, আর চাঁদ-সূর্য, আর নক্ষত্র–ওগুলো সব মানুষ ও পশুর জন্মদাতা জনক-জননী, এবং তাদের সবাইকে পরম আদরে ভালোবাসে, তবে ওগুলো নিজেরাও নিজেদের চেয়ে বড় একটা মহাঅস্তিত্বের গর্ভে পরম আশ্রয় পেয়েছে। মানুষ অনুভব করে প্রাণ দিয়ে সমস্ত ভূমি ভরে ফেলতে হবে, কারণ ওই মহাঅস্তিত্বের হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ড সংযুক্ত। মানুষ যখন মন্দ কিছু করে, মহাঅস্তিত্ব তাঁর হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেন, আর তার ফলে মানুষের ওপর বিপদ আর বিপর্যয় নেমে আসে।

কোনো এক সময়, মহাঅস্তিত্বের রক্ত থেকে তৈরি ঝরনায় প্লাবিত আকাশ পথে যখন নক্ষত্ররা ভেসে যাচ্ছিল, একটা নক্ষত্র মানুষের রূপ নিয়ে ভূমিতে নেমে এলেন, নিজের নাম বললেন টালিকিট। একটা লেককে বিয়ে করলেন তিনি, নাম রাইনিয়ার।

তাঁদের ঘরে দুটো পুত্রসন্তান জন্ম নিল। মহাঅস্তিত্বের গর্ভে নিজ সন্তানদের নিয়ে সুখে জীবন কাটাচ্ছিলেন তাঁরা, আত্মার নির্দেশ কখনও অমান্য করেননি।

দুই ভাই শক্তিশালী হয়ে বড় হলো, সমস্ত কাজে মা-বাবাকে সাহায্য করছে ওরা। দুজনেই দক্ষ এবং সাহসী শিকারি, সব সময় মা-বাবার জন্যে শিকার ধরে আনে।

তারপর একদিন টালিকিটের পায়ে ব্যথা শুরু হলো। স্ত্রী আর ছেলেদের ডেকে কথাটা জানালেন তিনি। শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল তারা। কিন্তু ব্যথার কারণটা একা শুধু টালিকিটই জানতেন।

আকাশ থেকে ভূমিতে নেমে আসার সময়, টালিকিট বুঝতে পারেন যে ঝাঁক ঝাঁক চোখ তাঁর ওপর নজর রাখছে। মানুষের অনুমতি আছে সে পশু-পাখি ধরতে এবং সেগুলোকে খেতে পারে।

বড় পশু-পাখির অনুমতি আছে তারা ছোট পশু-পাখি ধরে খেতে পারবে। তাই বলে খুব বেশি খাওয়ার অনুমতি কারুরই নেই।

তাছাড়া, মারার পর খুব বেশি পশু-পাখি তারা মজুদ করতে পারবে না। যে-সব পশু-পাখিকে তারা মারবে, ওগুলোর প্রতি তাদের সমীহ আর সম্মান দেখাতে হবে, আচরণে হতে হবে কোমল ও বিনয়ী।

BanglaBook.org

এই সব নির্দেশ ঠিকমতো প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে মহাঅস্তিত্ব, যিনি কিনা সমগ্র প্রকৃতির পিতা, পাহাড়চূড়ায় প্রকাণ্ড একটা চোখ স্থাপন করলেন।

চোখ যেটা বসানো হলো সেটা প্রকাণ্ড হলেও, সংখ্যায় মাত্র একটা। একা হওয়ায় ওটার পক্ষে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি দিকে নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এক সময় দেখা গেল লোকজন ওই চোখকে ফাঁকি দিয়ে এমন সব কাজ হরদম করছে যেগুলো মহাঅস্তিত্বের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যায়।

তারপর মহাঅস্তিত্ব চোখ বসালেন সরাসরি প্রতিটি মানুষের শরীরে, যাতে তাঁর দৃষ্টির বাইরে তারা যেতে না পারে।

'এখন ওই চোখই আমাকে এত ব্যথা দিচ্ছে,' স্ত্রী আর সন্তানদের ব্যাখ্যা করলেন টালিকিট।

'কিন্তু, বাবা, আমার মনে হয় না মহাঅস্তিত্বের কোনো নির্দেশ তুমি সত্যি সত্যি অমান্য করেছ।'

'আমি জানি কাজটা আমি নিজের অজ্ঞাতেই করেছি,' বললেন টালিকিট। তারপর তিনি মারা গেলেন।

দুই ভাই আর ওদের মা খুব আঘাত পেলেন। সন্দেহ নেই, মহাঅস্তিত্বের সিদ্ধান্ত ওদের পছন্দ হয়নি।

সময় বয়ে যাচ্ছে। একদিন বড় ভাইয়ের কোমরে ব্যথা শুরু হলো। তারপর ছোট ভাই পিঠে কষ্ট পেতে লাগল। পরস্পরকে নিজেদের শরীর দেখাবার সময়, মুঠো আকারের 'চোখ' দেখতে পেল ওরা–একটা বড় ভাইয়ের কোমরে, একটা ছোট ভাইয়ের পিঠে। ওগুলো দেখে বিস্মিত হলো ওরা, মাকে ডেকে সাহায্য চাইল।

দেখি কি করা যায় বলে নদীপথ ধরে রওনা হলেন রাইনিয়ার, দেখা করলেন বনভূমির আত্মার সঙ্গে। ওখান থেকে তিনি শিখে এলেন ছেলেদের কীভাবে সাহায্য করতে হবে।

বনভূমির আত্মা তাঁকে এই কথাগুলো বলেছিলেন:

'পশ্চিমে যাও, তারপর একজন যোদ্ধা আসার অপেক্ষায় থাকো। ওই যোদ্ধার সত্যিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর, তুমি তার নির্দেশনা মেনে চলবে।'

কাজেই দুই ছেলেকে নিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হলেন রাইনিয়ার। একসময় পৌঁছুলেন সেখানে, অপেক্ষায় আছেন কখন সেই যোদ্ধা আসবেন। বড় ভাইয়ের কোমরের 'চোখ' আকারে আগের চেয়ে বড় হয়েছে, ওদিকে ছোট ভাইয়ের পিঠের 'চোখ' আগের চেয়ে বেশি পানি ঝরিয়ে কাঁদছে।

অবশেষে এক জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়ে হাজির হলেন একজন শক্তিশালী যোদ্ধা; তাঁর হাবভাব বেশ ভালো লাগল রাইনিয়ারের। ওদের দুই ভাইকে পথ দেখিয়ে একটা গিরিদুয়ারে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

BanglaBook.org

যাওয়ার পথে অনেক নদী পার হলো ওরা। প্রেইরি পিছিয়ে পড়ল, সামনে চলে এলো মরুভূমি। উত্তর থেকে বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণীতে ভাঙন দেখা দিল, ওগুলোকে ঘুরে দক্ষিণে যাওয়ার সময় বড় একটা পাহাড়ের সামনে পড়ল ওরা।

ওই পাহাড়ের মাথায় উঠে পশ্চিমে তাকাতে দেখতে পেল একটা পাহাড়চূড়া থেকে পানির ধারা নামছে, সেই ধারা উপত্যকার ভেতর দিয়ে বইতে বইতে একটা নদীতে পরিণত হয়েছে, তারপর সেই নদী পশ্চিমের বিশাল এক সাগরে গিয়ে মিশেছে।

এবার পুবদিকে তাকাল ওরা। ওই একই রকম আরেকটা নদী পুব সাগরে গিয়ে মিশেছে। ওরা ধনুক আকৃতির একটা শৈলশিরায় রয়েছে, পাহাড়ের দুদিকের উপত্যকাকে এক করেছে ওটা–দুই নদীর উৎসে, যে নদী দুটো সাগরে গিয়ে পড়েছে।

ওই শৈলশিরার সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছে জন্তুর পিঠ থেকে নামলেন যোদ্ধা। হেঁটে একটা জলপ্রপাতের নীচে পৌঁছুল ওরা, তারপর সেটার মাথায় উঠল। জলপ্রপাতের মাথার কাছে কালো একটা গুহা হাঁ করে আছে, ওই গুহার ভেতরই বাস করেন প্রাচীনতম।

প্রাচীনতম ওদের দুই ভাইকে স্বর্গ আর নরক কীভাবে তৈরি হলো সেই গল্প শোনালেন। অতীত সম্পর্কে এত বেশি জানেন তিনি, এ-সব যেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন। তাই বড় ভাই প্রাচীনতমকে তাঁর বয়স কত জানতে চাইল।

এই ছিল তাঁর উত্তর:

'আমার দিকে তাকিয়ে নিজেরাই তোমরা সিদ্ধান্ত নাও। তারপর কী মনে হয় বলো আমাকে।'

কিন্তু কোনো উত্তরই ওদের মাথায় ধরা দিল না, কাজেই তাঁকে ওরা কিছু বলতেও পারল না।

নিজের বয়স কত তা না বলে, প্রাচীনতম বললেন, 'সবকিছু জন্ম নেয়ার সময় থেকে আমি এখানে আছি।'

ওরা তখন প্রাচীনতমকে বলল, বড় ভাইয়ের কোমর আর ছোট ভাইয়ের পিঠ থেকে 'চোখ' দুটো তিনি যেন সরিয়ে নেন।

জবাবে তিনি বললেন, 'বেশ, ভালো। তবে আজকের দিন থেকে আমার বদলে এই জায়গার ওপর অবশ্যই তোমাদেরকে নজর রাখতে হবে।'

তারপর প্রাচীনতম অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ওই মুহূর্তে ওদের শরীর থেকে 'চোখ' দুটো খসে পড়ল, পাথুরে মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পরিণত হলো একজোড়া নুড়ি পাথরে।

দু'ভাই অমরত্ব পেল, সেই থেকে ওই ভূমির ওপর নজর রাখছে ওরা। পুব আর

BanglaBook.org

পশ্চিমে স্রোতস্বিনী নদী সাগরে গিয়ে পড়ায়, নজর রাখার জন্যে জায়গাটা আদর্শ।

যেই দেখলেন কাউরুর পড়া শেষ হয়ে এসেছে, অমনি ম্যাচিকো প্রশ্ন করলেন, 'গল্পটায় কি বলা হচ্ছে অবশ্যই তা তুমি বুঝতে পারছ, ঠিক?'

এ-ধরনের কাহিনি কখনোই গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না কাউরু। তাছাড়া, গল্প-টল্প বিশেষ পড়েও না সে। রূপকথা, অতিকথার মধ্যে বাস্তবতা খুব কম মনে হয় তার। যদিও বা দু'একটা পড়তে চেষ্টা করেছে, ওই কারণে মাথায় ঠিকমতো নিতে পারেনি।

এই গল্পটাও সেরকম। খুব তাড়াতাড়ি এগোল...ঠিক কি বোঝাতে চাইল, আসলে? শব্দগুলো শুনে মনে হলো ওগুলোর বিশেষ তাৎপর্য আছে, তবে করতে চাইলে যেকোনো মানে করা যায়।

কাউরুর মনে হলো, না, ও ঠিক বোঝেনি এই গল্পে কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

'বাকি সব গল্পও কি মোটামুটি এরকম?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, প্রায়।'

'ওই প্রাচীনতম। তাকে কি আমরা আক্ষরিক অর্থে একজন বৃদ্ধ মানুষ বলে ধরে নেব?'

কাউরু আন্দাজ করল, প্রাচীনতম শব্দটি সম্ভবত অন্যকিছুর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে, যেমন 'বহু চোখের নজরে থাকা' বাক্যটিও ব্যবহার করা হয়েছে কিছু একটার প্রতীক হিসেবে।

প্রাচীনতম শব্দটা কি লঞ্জেভেটি জোন-এর প্রতিনিধিত্ব করছে?

তাহলে বহু চোখের নজর কী জিনিস?

কাউরুর দৃষ্টিতে কিছু ধরা পড়ছে না।

'সমস্যাটা এখানে,' বললেন ম্যাচিকো, বইয়ের শেষে সংযুক্ত মানচিত্রের ভাঁজ খুললেন কাউরুর সামনে। উত্তর আমেরিকার মানচিত্র, তাতে প্রধান প্রধান রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের নাম লেখা আছে

'অতিকথা আর লোককাহিনি কি পুরোপুরি বানানো? কিছু পণ্ডিতের ধারণা, মানবজাতির অস্তিত্বের প্রায় শুরু থেকে ঐতিহাসিক যে-সব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোই মিথ-এর ভিত্তি। মিথ ধারণ করে একটা গোত্র, গোষ্ঠী বা উপজাতির অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা। মহাপাবনের রেশ, উদাহরণ হিসেবে, সারা পৃথিবীর সবখানে দেখতে পাই আমরা, এবং এটা এখন একটা সাধারণ জ্ঞান যে নূহ নবির নৌকা নিয়ে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, সেটাও বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে ছড়িয়েছে।

'কাজেই এসো ধরে নেয়া যাক, কাউরু, এইমাত্র যে গল্পটা তুমি পড়লে তাতে কিছুটা হলেও বাস্তবতা আছে। মানছ? এবার শোনো, টালিকিটরা হলো পশ্চিম

BanglaBook.org

ওকলাহামার ওকেওয়া গোত্রের লোকজন।' কড়ে আঙুল দিয়ে মানচিত্রের একটা জায়গা দেখালেন ম্যাচিকো, এখন যেখানে টালিকিট উপজাতি বসবাস করছে।

'গল্পে বলা হয়েছে দু'ভাই এখান থেকে পশ্চিম দিকে গেছে।' পৃষ্ঠার বাঁ দিকে আঙুল সরাচ্ছেন তিনি. তবে হঠাৎ থামলেন। 'কোনদিকে যাচ্ছিল ওরা? গল্প অনুসারে যে পাহাড়ের মাথায় ওরা চড়েছিল, সেটা দাঁড়িয়েছিল অবিচ্ছিন্ন বিশাল পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণমুখী ফাঁকে, একজোড়া নদীর উৎসমুখে–একটার প্রবাহ গিয়ে মিশেছে সুবিশাল পশ্চিম সাগরে, আরেকটার প্রবাহ মিলিত হয়েছে সুবিশাল পুব সাগরে। ভৌগোলিক অর্থে, ওটা রকিজ পাহাড়শ্রেণী হওয়ার কথা।'

মানচিত্রের উত্তর-দক্ষিণে আঁকা রেখা ধরে এগোল ম্যাচিকোর আঙুল। টালিকিট উপজাতি যেখানে বসবাস করে, ওটা তার সরাসরি উল্টোদিকে, আর সরাসরি ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, কমবেশি বারো হাজার ফুট উঁচু।

এর মানে হলো ম্যাচিকো যে জায়গাটা দেখাতে চাইছেন সেখানে প্রকাণ্ড একটা উপত্যকা আছে, যে উপত্যকা ধনুক আকৃতির একটা ভূমির বিস্তৃতিকে ধরে রেখেছে মরুভূমির ওপর।

ধনুক আকৃতির উত্থানের ওপর আঙুল দিয়ে একটা X আঁকলেন ম্যাচিকো, ওটার ঠিক বাঁ দিকে লিটল কলোরাডো নদীর সরু রেখা দেখা যাচ্ছে। ওটা গিয়ে পড়েছে কলোরাডো নদীতে।

কলোরাডো গিয়ে মিশেছে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে–অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরে। ওই জায়গার ঠিক ডানে দেখা যাবে রিয়ো গ্র্যান্ড নদীর উজানপ্রান্ত, যেটা গিয়ে পড়েছে মেক্সিকো উপসাগরে–তারমানে আটলান্টিক মহাসাগরে।

এই দুটো বড় নদীর উৎস পৃথিবীর দুটো বিশাল মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে, যে দুই মহাসাগর এই পর্যায়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উপক্রম করেছে, বাধা হয়ে রয়েছে শুধু এই পাহাড়শ্রেণী– কন্টিনেন্টাল ডিভাইড-এর অংশবিশেষ।

এটা ফোর কর্নার অঞ্চল। নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা, উটাহ আর কলোরাডো–এই চারটে রাজ্য এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। এটাই সেই সাইট, যেখানে নেগেটিভ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি ধরা পড়েছে। এখানেই লঞ্জেভেটি জোনস পাওয়া যেতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়েছে। এখানেই বিকৃত, ফুলে ওঠা গাছ আর ঝোপগুলো পাওয়া গেছে। আজ থেকে দশ বছর আগে কাউরু ওর গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি ম্যাপে ঠিক যেখানে একটা × চিহ্ন এঁকেছিল।

আচ্ছন্ন বোধ করজে কাউরু।

ও যদি ওই পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকায়, পাহাড়ের গা ঘেঁষে টগবগ করা বিপুল জলরাশি দেখতে পাবে, যে জলরাশি শেষ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়বে; ও যদি পুব দিকে তাকায় তাহলেও একই ধরনের একটা দৃশ্য দেখতে পাবে। ঝিলমিল করা পানির প্রবাহ অনুর্বর মরুভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে।

BanglaBook.org

ওই এলাকার পুরো প্রাকৃতিক দৃশ্য ওর মনের চোখে পরিষ্কার ধরা পড়ছে। কল্পনা করল, ধনুক আকৃতির সেই শৈলশিরার দুই প্রান্তে কাঁপা কাঁপা দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ওখানে কখনও যায়নি, তবে মানচিত্রে ওটার আঁকাবাঁকা রেখা দেখে পরিষ্কার কল্পনা করতে পারছে। তবে তা ওকে বিস্মিত করছে না। বিস্মিত করছে ওর নিজের অনুমান লক্ষ করে–যে লঞ্জেভেটি জোনস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আর সন্দেহ করেছিল সে, লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সেটা বাস্তব সত্য হয়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ওখানে কিছু একটা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

চিন্তাটা স্তম্ভিত করে দিল ওকে। কাউরু এখন আর গ্রাহ্য করে না ওই মিথ স্রেফ বানানো কোনো গল্প কিনা। গুরুত্বপূর্ণ হলো ও নিজে যে মিথ তৈরি করতে যাচ্ছে তাতে ওর নিজের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা কতটুকু যোগ করতে পারবে।

এটা ওর বাবা চান। রাইকো চাইছে। এখন ওর মাও চাইছেন।

ছেলের হাঁটুর ওপর হাত রেখে ম্যাচিকো মুখ খুললেন, কথা বলছেন ফিসফিস করে, তবে তা আশ্বাসে ভরপুর।

'তুমি আমার হয়ে ওখানে যাবে। যাবে না?'

কিন্তু অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো সম্পর্কে কাউরু নিশ্চিত নয়।

'তুমি পজিটিভ, মা, ফ্র্যাঞ্জ বোর এই জায়গাতেই গিয়েছিলেন?'

নিঃশব্দ হাসি ফুটল ম্যাচিকোর মুখে। 'লেখাটায় জানানো হয়েছে কী কাজ করতেন তিনি। মনে আছে তোমার, কী ছিলেন ভদ্রলোক?'

একটু চিন্তা করল কাউরু। 'সার্ভেয়ার ছিলেন তিনি...তাই না?' *কয়েক বছর আগে পোর্টল্যান্ডের [ওরেগান] ফ্র্যাঞ্জ বোর, অবসর নেয়া সার্ভেয়ার...*এভাবে শুরু হয়েছে লেখাটা, মনে পড়ছে কাউরুর

আবার হাসলেন ম্যাচিকো, বললেন, 'ওটা ছিল তাঁর দিনের কাজ, তবে সেই সঙ্গে তিনি আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটির সদস্যও ছিলেন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এটা তুমি জানো না।'

'কীভাবে জানব?'

'এই বইটা,' বললেন ম্যাচিকো, আবার হাতে নিলেন *নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ান ফোকলোর*, 'আসলে কয়েকজন মিলে সংগ্রহ করেছেন। বইয়ের একেবারে শেষদিকে বলা হয়েছে কোনটা কার গল্প।'

বইয়ের পেছনে ছ'জন সম্পাদকের একটা তালিকা দেয়া আছে, প্রতিটি নামের নীচে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি মোট কটা গল্পের সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। চৌত্রিশ নম্বর গল্পটা, 'বহু চোখের নজরে থাকা' সম্পাদনা করেছেন ফ্র্যাঞ্জ বোর নিজে।

'আই সি।'

BanglaBook.org

তাহলে দুরারোগ্য ক্যানসারে মারা যাওয়ার তিন মাস আগে ফ্র্যাঞ্জ বোর সাউথওয়েস্টার্ন মরুভূমির নির্দিষ্ট একটা জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিজের শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করার জন্যে।

মিরাকল তাঁকে সাহায্য করবে কি করবে না, তা নিয়ে তিনি সম্ভবত বিশেষ মাথা ঘামাননি–এমনও হতে পারে যে একজন ফোকলরিস্ট হিসেবে মারা যাওয়ার আগে ওখানে একবার বেড়াতে যাওয়ার সাধ হয়েছিল তাঁর। কিছু যদি না করতেন, জানা কথা মারা যেতেন তিনি, কাজেই গেলে তাঁর হারাবার কিছু ছিল কি? তাই গেলেন, এবং, কপালগুণে তিনি একটা জাদু বা মিরাকলের সাক্ষাৎ পেলেন।

'এই *"বহু চোখের নজরে থাকা"* গল্পটার নানা সংস্করণ প্রচলিত আছে বাজারে, এই সঙ্কলনে যেটা ছাপা হয়েছে সেটাই মূল কাহিনির সবচেয়ে কাছাকাছি। অন্য একটা সংস্করণে বলা হয়েছে বড় ভাই আর তার এক ছোটবোন প্রাচীনতমের সঙ্গে দেখা করে, এবং অমর হিসেবে তাঁর অনুমোদন সংগ্রহ করে।

আরেক সংস্করণে আছে, সন্তান প্রসব করার পর সুস্থ হতে সমস্যা হচ্ছিল রাইনিয়ারের, তাই প্রাচীনতমের সঙ্গে দেখা করেন টালিকিট, ওখান থেকে ফিরে আসেন ঝরনার পানি নিয়ে, যে পানি খেয়ে সুস্থ হন রাইনিয়ার। কিছু গল্পের নামকরণও করা হয়েছে আলাদা।

কিন্তু ওই জায়গার বর্ণনা সবগুলোতেই এক রকম। ঠিক এই এখানে। এই জায়গা রোগ সারানোর ক্ষমতা রাখে।'

মানচিত্রের ওপর কয়েকবার টোকা মারলেন ম্যাচিকো।

'সেজন্যেই ফ্র্যাঞ্জ বোর ওখানে গিয়েছিলেন।'

'ওই জায়গা...'

'কাউরু, মনে পড়ে, তুমি আমাকে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালিজ-এর ম্যাপ দেখিয়েছিলে? আরিজোনার মরুভূমি বা অন্য কোথাও দাগ কেটেছিলে। ওই ম্যাপটা আবার একবার আমাকে তুমি দেখাতে পার?'

কাউরু নিজেও নিশ্চিত হতে চায়। না তাকিয়েও বলে দিতে পারছে, ওটা সেই একই জায়গা, তবে তারপরও একবার চেক করে নিতে ইচ্ছে করছে। 'এক মিনিট,' বলে নিজের কামরায় চলে গেল।

বহু বছর ওই ম্যাপটা দেখেনি, কাউরুর ধারণা ছিল খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগবে। বুকশেলফ আর ডেস্কের দেরাজে তল্লাসি চালিয়ে কোনো লাভ হলো না। ছোট একটুকরো কাগজ–প্রবাদের সেই খড়ের ভেতর হারানো সুই। তবে এটা কোনো সমস্যা নয়। ওকে শুধু দশ বছর আগে থেকে ডেটাবেইস ব্যবহার করত সেটার অ্যাকসেস পেতে হবে, তারপর সেই একই ইনফরমেশন চেয়ে নিতে হবে।

কমপিউটার খুলল কাউরু, ভাবল কত পুরোনো মডেল এটা। দশ বছর আগে ঠিক এই স্ক্রিনেই গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালির ম্যাপ প্রথম দেখেছিল ও।

BanglaBook.org

মেমোরি সার্চ করছে কাউরু, সেই রাতে ঠিক যে পথ ধরে সার্চ করেছিল। প্রথমে অনলাইনের ডেটাবেইস ঢুকল। কিন্তু সার্চটা ঠিক কীভাবে করেছিল ও? প্রথমে ক্যাটাগরি, সায়েন্টেফিক এবং টেকনিক্যাল তথ্য। তারপর, গ্র্যাভিটি। ওটার ভেতর গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালিজ 'এরিয়া'-র নীচে 'ওয়ার্ল্ডওয়াইড' নির্বাচন করল

একটা তারিখ চাইছে কোন বছরের গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালিজ দরকার তার? দশ বছর আগের ম্যাপটাই চাইল কাউরু।

ডিসপ্লেতে একটা ম্যাপ চলে এল আগে যে জায়গাটা চেক করেছে সেটাকে এনলার্জ করল ও–উত্তর আমেরিকার মরুভূমি।

কাউরুর চোয়াল ঝুলে পড়ল। ওই এলাকার সমুন্নতি রেখাগুলোয় অ্যানমালিজের চিহ্নমাত্র নেই, প্রতিটি একরকম–বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি নেই। কী ব্যাপার? দশ বছর আগে, ও যখন ম্যাপটা দেখেছিল, নেগেটিভ সংখ্যাগুলো ওই পয়েন্টের দিকে যত এগিয়েছে ততই বেড়ে গিয়েছিল। কাঁটায় কাঁটায় ওই পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালিজ ছিল শূন্য।

কিন্তু ওর সামনে যে ম্যাপটা রয়েছে তাতে সে-ধরনের কিছু নেই। ওর মা-বাবাও ওটা দেখেছিলেন, কাউরুর কোনো সন্দেহ নেই। ওরা তিনজনই এই ম্যাপ লিভিং রুমের আলোর সামনে তুলে ধরেছিল, নিজেদের চোখে দেখেছিল মাধাকর্ষণ শক্তি যেখানে খুব কম সেখানে লঞ্জেভেটি জোনের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আবার শুরু করল কাউরু, দশ বছর আগের সেই একই পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করছে। দুবার নয়, বার বার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হলো না, প্রতিবার সাধারণভাবে সাজানো সমুন্নতি রেখা নিয়ে হাজির হচ্ছে প্রতিটি ম্যাপ, সঙ্গে সারি সারি অর্থহীন সংখ্যা।

দশ বছর আগে ম্যাপটা পাঠ করতে ভুল হয়নি কাউরুর। সেটা অসম্ভব। নিজের কথা বাদ দিলেও, ওর মা-বাবার স্মৃতিকে সন্দেহ করা যায় না। ওই ম্যাপ দেখেই তো হাইডিউকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উত্তর আমেরিকার মরুভূমিতে বেড়াতে নিয়ে যাবেন ছেলেকে। ডেস্কের দেরাজে এখনও সই করা চুক্তিপত্রটা রেখে দিয়েছে কাউরু।

দশ বছর আগে তাহলে ওই তথ্য কোত্থেকে এসেছিল?

কাউরুর কপালের পেছনটা ব্যথায় দব দব করছে। দশ বছর আগে ওর কমপিউটার কিসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল? চিন্তাটা যেন ওর মাথা থেকে সমস্ত রক্ত বের করে দিল।

কমপিউটার বন্ধ করে দিল কাউরু। চোখ বুজল স্মৃতির ঘরে থাকা মরুভূমির লঞ্জেভেটি জোন ঝাপসাভাবে আজ আবার উঠে এল ওর চোখের সামনে।

ওটার অস্তিত্ব না থেকে পারে না। আমি জানি।

BanglaBook.org

পৃথিবীর দেহরেখা ভঙ্গুর, একটু খোঁচা দিলে সব হুড়মুড় করে নেই হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ভঙ্গুরতার মধ্যেও আশ্বাস খুঁজে পেল কাউরু। ও যদি দশ বছর আগের সেই তথ্য এখন পেয়ে যেত, তাহলে হয়তো এখনকার এই অনুভূতি ওর হত না–সম্ভবত সিদ্ধান্তেও আসতে পারত না।

ধনুক আকৃতির একটা ছোট পাহাড় দেখতে পাচ্ছে কাউরু, স্বল্প ঢালু জমিন গ্রাস করেছে নদীগুলো! ও যেন আকাশে চষে বেড়ানো একটা ঈগলপাখি, জায়গাটার ওপর চক্কর মারছে। গভীর বাঁক নেয়া উপত্যকা, তাতে ঠাণ্ডা সবুজ গাছপালা কি সুন্দর ভর্তি হয়ে আছে।

এখনও হয়তো দুনিয়ার ওপর নজর রাখছেন প্রাচীনতম, তাঁর দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দুটো ঝরনা, গিয়ে মিশছে প্রশান্ত আর আটলান্টিকে–যে পানি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে মানবদেহের রক্ত কিংবা রঙবিহীন রসের মতো।

দুরোরোগ্য ব্যাধি এবং চিরযৌবনসহ অমরত্ব; মহাকর্ষের তারতম্য অনুসারে স্রোতের উত্থান-পতন; জীবন এবং মৃত্যু। সমস্ত পরস্পরবিরোধিতা এক হয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে মরুভূমির বালুতে। সবকিছু সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। প্রতিটি বিষয় ফিসফিস করে ওকে বলছে ওখানে ওর যাওয়া উচিত।

হঠাৎ দেখা গেল কাউরুর পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ম্যাচিকো। ঘুরে তাঁর দিকে তাকাল কাউরু, বলল, 'আমি যাব, মা।'

'কীভাবে যাবে?'

'বাবার মোটরবাইকটা আমি প্লেনে করে লস অ্যাঞ্জেলসে নিয়ে যাব, তারপর ওটায় চড়ে পৌছুব মরুভূমিতে।'

ম্যাচিকো ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গন্তব্য : দুনিয়ার কিনারা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এক

ওর রিয়ার-ভিউ মিরর অন্ধকারে ভরে গেল। পুব দিগন্ত ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হচ্ছে, তবে গোটা আকাশ এক করে দেখলে রাত এখনও নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছে। এই মুহূর্তে, একটা কাঠামো ছাড়া আর কিছু নয় কাউরু, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নতুন একটা ভোরের দিকে ছুটছে।

অল্প কয়েকটা সূত্র ওকে এই অভিযানে টেনে এনেছে, কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার একটা উপায় বের করার গুরুদায়িত্ব।

চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, ওকে ধাওয়া করতে হবে আলোর ক্ষীণ একটা রেখাকে।

আন্তঃরাজ্য মহাসড়কের যে অংশটা মোহাবে মরুভূমির ওপর দিয়ে গেছে তাতে রাতের বেলা যানবাহন খুব কম, কাজেই লম্বা একটা সময় রিয়ার-ভিউ মিররে না তাকালেও চলে ওর। তবে সামনের আকাশে ভোরের লক্ষণ যখন পরিষ্কার হতে শুরু করল, মাঝে-মধ্যেই আয়নাটার ওপর চোখ রাখছে।

আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নিজের রূপ মেলে ধরছে প্রকৃতি। যা দেখছে সবই ভালো লাগছে কাউরুর। সকালের আলোয় বিস্তৃত তামাটে মাটি চোখে পড়ল। মহাসড়কের দু'পাশেই পাহাড় আর পাহাড়, তবে বেশ দূরে, ওগুলোর কাঠামো আর দেহরেখাই শুধু দেখা যাচ্ছে।

এক্সএলআর, ৬০০সিসি সেকেন্ডহ্যান্ড বাইকের হ্যান্ডেল দুটো শক্ত হাতে ধরে আছে কাউরু, ওর বাবা যেটা দশ বছর আগে কিনেছিলেন।

চারদিক দেখার জন্যে মাথা ঘোরাল ও। দু'পাশের দৃশ্য তীব্রবেগে পেছন দিকে ছুটছে, আয়নায় নয়, সরাসরি নিজের চোখ দিয়ে দেখতে ভালো লাগছে ওর।

সেই দশ বছর বয়স থেকে এই মরুভূমিতে আসার স্বপ্ন দেখছে কাউরু। আজ আমেরিকায় সে; নিজের চোখে সেই মরু দেখার আশায় ছ'ঘণ্টা ধরে মোটরবাইট ছোটাচ্ছে।

কাল বিকেলের দিকে এক্সএলআর সংগ্রহ করেছে কাউরু। বিমানে তুলে দিয়ে আমেরিকায় আনিয়েছে ওটাকে। তারপর এই মরু পার হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে এটা-সেটা নানা জিনিস যোগাড় করে ব্যাগে ভরতে হয়েছে। সব কাজ শেষ করে

BanglaBook.org

লস অ্যাঞ্জেলস ছাড়তে দশটা বেজে গেল।

রাতটা কোনো হোটেলে কাটিয়ে পরদিন সকালে রওনা হওয়ার কথা ভেবেছিল একবার, কিন্তু ওর পুব দিকে পড়ে থাকা মরুভূমির বিশালতা কল্পনা করে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি। সেই মুহূর্তে স্রেফ বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। দুর্বার একটা আকর্ষণ আর কি।

রওনা হওয়ার সময় চারদিক গাঢ় অন্ধকার ছিল, সেই থেকে অন্ধকারেই কেটেছে ওর সময়। যদিও জানে মোহাবে মরু পার হচ্ছে, তবে এখন চোখ বুলাতে গিয়ে চারদিকে শুধু পাহাড়ী তৃণভূমি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সূর্য উঠে আসছে, সেই সঙ্গে উদ্ভাসিত হচ্ছে চারপাশ।

হঠাৎ ওই সময় রওনা হয়েছিল বলে কাউরু খুশি, খুশি কোথাও না থেমে সারারাত বাইক চালিয়ে আসায়। প্রকৃতির এই যে রূপবদল, এটা থেকে বঞ্চিত হওয়া চলে না।

এটা একটা প্রাপ্তি, তার সঙ্গে একটা দিনের অপচয় এড়ানোও কিছু কম পাওয়া নয়। হাতে আসলে সময় খুব বেশি নেই। আজ সেপ্টেম্বরের এক তারিখ: একটা কিছু জবাব নিয়ে দু'মাসের মধ্যে ফিরতে হবে ওকে, তা না হলে শুধু রাইকোর নয়, সদ্য পেটে আসা তার সন্তানের জীবনও হারিয়ে যাবে।

ফোর-স্ট্রোক ওএইচসি টু-সিলিন্ডার ইঞ্জিন থেকে উঠে আসা ভারি যান্ত্রিক গুঞ্জন আর কম্পন একটানা ছ'ঘণ্টা সহ্য করতে হয়েছে কাউরুকে। রাস্তা ভালো, কোথাও উঁচু-নিচু নয়, তারপরও বাইক চালানোর নিয়ম অমান্য করছে না ও–ভুলেও হাঁটু দুটোয় শিথিল ভাব আসতে দিচ্ছে না।

ওর বাবা ওকে বাইক চালানোর সঠিক টেকনিক শিখিয়েছেন। হাঁটুতে যখনই ঢিল দিত সে, দু'পাশে মেলে ধরার চেষ্টা করত, অমনি ওর উরুতে চাপড় মারতেন হাইডিউকি, চেঁচিয়ে উঠে রাগ করতেন ছেলেকে।

হাঁটু দুটো ট্যাংকের গায়ে সেঁটে রাখো, কচি।

তাই রেখেছে কাউরু, পুরোটা পথ। কাঁধ শিথিল, পাদানিতে আটকানো পা ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করছে। এমনকি রোগ ধরা পড়র পরও ছেলেকে মোটরসাইকেলে তুলে এখানে-সেখানে বেড়াতে নিয়ে গেছেন হাইডিউকি। ওই সময় পাওয়া বাবার পরামর্শ কাউরুর অন্তরে গেঁথে আছে।

ট্রিপ মিটারে দেখা যাচ্ছে তিন শ মাইল পার হয়েছে কাউরু। ওর মোটরসাইকেলের বিরাট গ্যাসট্যাংকে ত্রিশ লিটার ফুয়েল ভরা যায়, মহাসড়কে সাড়ে তিন শ মাইল অবশ্যাই পার হওয়া যায় তাতে।

তারমানে আবার ট্যাংক ভরার সময় হয়েছে, তা না হলে আরেকটু সামনে ফুয়েল শেষ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে। এই মহাসড়কের দু'শ মাইল বা তারও বেশি বিস্তৃতিতে কোনো গ্যাস স্টেশন নেই, কাজেই সাবধান হতে হবে

BanglaBook.org

ওকে।

ওর লাগেজে একটা গ্যাস ক্যান থাকলেও, সেটা খালি। ওর ইচ্ছে ছিল কোনো হোটেলে থেমে বিছানায় গা এলিয়ে দেবে, ইতিমধ্যে হয়তো খুব বেশি দূরে চলে আসা হয়েছে।

সামনের শহরে থেমে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেব, আপন মনে বিড়বিড় করল কাউরু। ও জানে নিজেকে থামতে বাধ্য না করলে বাবার এই বাইক গ্যাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবে সে।

থামতে হবে বলে কাউরু হতাশ। রাতকে সকালে বদলে যেতে দেখে ওর কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পৃথিবী লাটিমের মতো ঘুরছে; এখন ভাবছে, ও থামলে, ওকে ছাড়াই ঘুরতে থাকবে পৃথিবী, ফলে পিছিয়ে পড়তে হবে ওকে।

রোদ যখন সবকিছু আলোকিত করে তুলল, দূরে একটা শহর দেখতে পেল কাউরু। ওখানে নিশ্চয়ই গ্যাস স্টেশন আছে, আশা করা যায় কোথাও বসে কিছু খাওয়ার একটা জায়গাও পাওয়া যাবে।

দুপুরের খানিক পর একটা মোটেলে উঠল কাউরু, শাওয়ার নিয়েই শুয়ে পড়ল বিছানায়।

ঘুমোবার চেষ্টা করলেও, ইঞ্জিনের কম্পন এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত ওর শরীরটাকে খেঁতলেছে যে কোষ পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। অস্থিরতা আর অস্বস্তিতে ভুগছে ওর সমগ্র অস্তিত্ব। বিছানায় শুয়ে থাকা সত্ত্বেও মনে হলো বাইকের ওপর থেকে নামেনি। বিশেষ করে উরুর মাংস, যে অংশটা দিয়ে গ্যাস ট্যাংক চেপে ধরেছিল, মনে হচ্ছে ওর নয়।

কতক্ষণ বাইক চালিয়েছি আমি?

আঙুলের গিঁট গুণছে কাউরু। এলএ থেকে ছ'ঘণ্টা, তারপর সিট থেকে নেমে রেস্তোরাঁ না খোলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে ব্রেকফাস্ট করার জন্যে। ট্যাংক ভরেছে, তারপর আবার তিন ঘণ্টা বাইক চালিয়েছে। সব মিলিয়ে, তাহলে, ন'ঘণ্টা। এরকম আরও ন'ঘণ্টার একটা দৌড় ওকে পৌঁছে দেবে আলবাকারকি এলাকায়।

কাউরুর প্ল্যান হলো আলবাকারকির দিকে সরাসরি যাওয়ার আগে উত্তরদিকে বাঁক নেবে, একে একে যাবে সান্তা ফে, লস অ্যালামস আর কেনেথ রথম্যানের সর্বশেষ পাওয়া ঠিকানায়। অবশ্যই ওর শেষ গন্তব্য ফোর কর্নার এলাকা। কিন্তু তার আগে, ও ভেবেছে, জেনে নেয়া ভালো রথম্যানের কপালে কি ঘটেছে, এবং তাঁর শেষ কথাগুলোর মানে কি।

বিছানার পাশে রাখা রাকস্যাকটা টেনে নিল কাউরু, ভেতর হাত গলিয়ে বিলফোল্ড খুঁজছে। বিলফোল্ড থেকে একজোড়া ফটো বেরোল। প্রথমে ওগুলো

BanglaBook.org

খুঁটিয়ে দেখল। তারপর–এখনও বিছানায় শুয়ে–ফটোগুলো মাথার ওপর ধরে রেখে প্রিয় মুখ দুটোর সঙ্গে কথা বলছে কাউরু।

বলা বাহুল্য যে ওগুলো সাড়া দিল না।

জাপান ছাড়ার আগে বাবাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল কাউরু। এটা-সেটা আলাপ করার পর বাবাকে ওর আমেরিকা আসার কথা জানিয়েছে। কেন ওকে আসতে হবে, তাও ব্যাখ্যা করেছে।

সব শুনে হাইডিউকি বলেছেন, 'আই সি।'

কিছু বাদ না দিয়ে বাবাকে সব কথাই বলেছে কাউরু, এমনকি রাইকো পরিস্থিতিও গোপন করেনি। ও বিদেশে থাকার সময় বাবা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে: বাবাকে যদি আদৌ সব কথা বলতে হয়, দেশ ছাড়ার আগেই তা বলা দরকার।

রাইকো নামে এক নারীর গর্ভে তাঁর নাতি বেড়ে উঠছে, কথাটা শুনে মনের আনন্দে হেসে উঠলেন হাইডিউকি।

'তাহলে তো যেতেই হয়, কচি।' যেন সেই পুরোনো, স্বাস্থ্যবান হাইডিউকি ফিরে এলেন; মুখ ভরা দুষ্ট হাসি, জানতে চাইলেন রাইকো দেখতে কেমন। 'বেশ নধর, চোখজুড়ানো, ভালো একটা মেয়ে?'

'আমার চোখে দুনিয়ার সেরা,' উত্তর দিল কাউরু।

'এক মিনিটের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না!' আনন্দের আতিশয্যে কাঁপছেন হাইডিউকি। তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'আমি আমার নাতিকে দেখার জন্যে বাঁচতে চাই।'

এটা শুনে রাইকোর কথা বাবাকে বলায় নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল কাউরু।

রাইকোর ফটো থেকে চোখ সরিয়ে নিল কাউরু, আবার যত্ন করে রেখে দিল রাকস্যাকের ভেতরে–স্পর্শ দিয়ে, কাত না হয়ে। উন্মত্তের মতো লাফাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড। তার দিকে শুধু তাকালেই ওর নিঃসঙ্গতা বেড়ে যাচ্ছে।

মনটাকে সরিয়ে আনার জন্যে শুয়ে থেকেই কামরার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে কাউরু। দেয়ালে রঙচঙে পরদা। মাথার ওপর অলস ফ্যান। কিচেনে ফ্রিজটা যে শব্দ করছে, ফ্যানের শব্দ তারচেয়ে বেশি বিরক্ত করছে ওকে।

সমস্ত আসবাব আর জিনিস-পত্র পুরোনো, মোটেলটার মতোই। বিছানার নীচে কি যেন চরছে, শুনতে পাচ্ছে কাউরু, সম্ভবত তেলেপোকা। ঢোকার পরপরই কিচেনে একটা দেখেছিল। সেটাই হয়তো।

তেলেপোকা সাংঘাতিক, অন্তত কাউরুর কাছে। সম্ভবত ওগুলো দেখে অভ্যস্ত নয় বলে–ওদের ঊনত্রিশতলা কন্ডোয়, যেখান থেকে খাঁড়ি দেখা যায়, একটাও

BanglaBook.org

কখনও চোখে পড়েনি।

এই মোটেলে যখন উঠল, ভেবেছিল বিছানায় ওঠামাত্র ঘুম চলে আসবে চোখে–এতটা ক্লান্ত বোধ করছিল। যতটা না সারারাত বাইক চালিয়ে, তারচেয়ে সারাটা সকাল রোদের মধ্যে থেকে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে শরীরটা। কিন্তু যা কল্পনাতেও ছিল না, ঘুম ওকে ফাঁকি দিচ্ছে। হতে পারে খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে: জাপানের বাইরে এই প্রথম একটা মোটেলে উঠেছে সে।

অভিযানটা এরকম হওয়ার কথা ছিল না। দশ বছর আগে ছুটিতে বেড়ানোর যে স্বপ্নটা কাউরু দেখেছিল, তার সঙ্গে এর পার্থক্যটা দেখতে পেয়ে ওর চোখে পানি চলে এল।

ওর সমস্যা একটা নয়, অনেক। ওকে ওর মৃতপ্রায় বাবার প্রাণ বাঁচাতে হবে, রাইকোর জন্যে একটা উত্তর নিয়ে যেতে হবে, সন্তানের কাছে প্রমাণ করতে হবে এই পৃথিবী বসবাসের যোগ্য–যে সন্তান এখনও স্রেফ একটা কোষ, মাত্র বিভাজিত হতে শুরু করেছে।

কি কি লক্ষ্য পূরণ করতে হবে তার একটা তালিকা তৈরি করেছে কাউরু, শুধু নিজের সাহস বাড়ানোর জন্যে। উত্তেজিত বোধ করছে ও, আবেগে অধীর, ক্লান্তিতে নিস্তেজ, গোটা অস্তিত্বে কম্পন; এটা ওর একটা পবিত্র অভিযান, কাঁধে গুরুদায়িত্বের বোঝা, ভয়ে থরহরি কম্প; সবকিছু মিলে এরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে: যেন পিঁপড়ের একটা বাহিনী ওর শরীরের ভেতর চরে বেড়াচ্ছে। নিজের ভাবাবেগ যদি কমিয়ে আনতে না পারে, চোখে ঘুম আসবে না।

হঠাৎ মনে পড়ল U আকৃতির মোটেলের পাকা উঠানে একটা সুইমিং পুল দেখেছে। হয়তো ভালো একটা সাঁতার হালকা হতে সাহায্য করবে ওকে। বিছানা ছেড়ে কাপড় পাল্টে সুইম ট্রাঙ্ক পরল।

খালি পুলে ডাইভ দিল কাউরু, পানির তলা থেকে শরীরটাকে উল্টে আকাশের দিকে তাকাল।

এভাবে অকস্মাৎ বাতাস থেকে পানিতে চলে আসার অনুভূতিটা ভালো লাগছে ওর, এক মিডিয়াম থেকে অন্য একটায়। পানির নীচে থেকে আকাশ দেখা, একই সঙ্গে দুটো স্তরই উপভোগ করা যাচ্ছে! পানির ভেতর থেকে দেখছে বলে জ্বলন্ত সূর্য একদম বাঁকাচোরা।

পানির ওপর মাথা তুলে পুলের মাঝখানে স্থির হলো। পুলের তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মোটেলটা, বাকি একদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় বিস্তৃত মরুভূমি–বালি আর বালি। শরীরের বেশিরভাগ পানিতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও, জায়গাটাকে অসম্ভব কর্কশ আর নির্দয় লাগছে ওর।

পনের মিনিট পর পুল ছেড়ে নিজের কামরায় ফিরে এল কাউরু। শরীর বলছে এবার ঘুমোতে অসুবিধে হবে না।

BanglaBook.org

দুই

রোদ ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠছে। লম্বা আস্তিনসহ সুইটশার্ট আর চামড়ার দস্তানা পরেছে কাউরু, ওর জিনস বুটের ভেতর গোঁজা, নিরাবরণ ত্বক বলতে হেলমেটের নীচে ঘাড়। তা সত্ত্বেও বাইক ছোটাবার সময় অনুভব করল রোদ যেন সারা শরীরে অদৃশ্য গরম পানি ঢেলে দিচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে জানে কাউরু, কিন্তু রাস্তার ঠিকানা জানা নেই। *ওয়েন'স রক, নিউ মেক্সিকো, লস অ্যালামসের কিনারায়,* শুধু এইটুকু জানে ও। কে জানে যথেষ্ট কিনা। নাম বললে কেউ হয়তো চিনবে।

কেনেথ রথম্যান। আবার নাও চিনতে পারে।

রথম্যানের সর্বশেষ ঠিকানা জানার জন্যে জাপান ছাড়ার ঠিক আগে প্রফেসর অ্যামানোর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করেছিল কাউরু। তিনি ওকে বলেছেন, তাঁর জানামতে রথম্যান পুরোনো একটা বাড়িতে থাকেন, সেটাকে তিনি তাঁর কাজের জায়গা হিসেবেও ব্যবহার করেন।

প্রফেসর অ্যামানোর ধারণা, তাঁর বিশ্বাস এখনও ওই জায়গাতেই আছেন রথম্যান, তবে যেকোনো কারণেই হোক, ইচ্ছে করেই বন্ধু-বান্ধব বা আপনজনদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখেছেন।

তবে রথম্যান ওখানে না থাকলেও, বাড়িটা ওই একই অবস্থায় থাকার কথা। কাজেই কিছু না কিছু নতুন সূত্র অবশ্যই পাবে কাউরু।

মরুভূমির ওপর বিস্তৃত মহাসড়কে যানবাহন না থাকারই মতো, নিজের ইচ্ছে মাফিক গতিতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে কাউরু।

ঠিক সময়মতোই অ্যালবাকারকিতে পৌঁছুল।

ইন্টারস্টেইট টোয়েনটিফাইভ ধরে উত্তর দিকে বাঁক নিল, তারপর একটা স্টেইট রোডে ঢুকল, লস অ্যালামসের দিকে যাচ্ছে।

লস অ্যালামসের এদিকটাতেই হওয়ার কথা ওয়েন'স রক।

গন্তব্য থেকে খুব বেশি দূরে নয়, একটা গ্যাস স্টেশনে থামল কাউরু। গ্যাস নিতে নয়–ট্যাংকে প্রচুর আছে–দিক নির্দেশনা পেতে। স্টেইট রোডের প্রায় সব গ্যাস স্টেশনে যেমন দেখা গেছে, এটার সঙ্গেও টুকিটাকি জিনিসের একটা দোকান আছে, কাজেই নিদেনপক্ষে ওখানে একজন কেরানিকে পাওয়া যাবে; না থেমে যদি ছুটতে থাকে, আবার কারও সঙ্গে দেখা হবে কিনা বলা মুশকিল।

এখানে থেমেছেই যখন, ট্যাংকের ঢাকনি তুলল কাউরু, তারপর দোকানে ঢুকল বিল মেটাতে। মাঝ বয়সী, মুখে দাড়ি, এক লোক মুখ তুলে তাকাল–ওটাই তার হ্যালো।

BanglaBook.org

পুরো এক গ্যালনও নিতে পারেনি ট্যাংক, কাজেই খুব কম বিল দিতে হলো ওকে। তারপর জানতে চাইল, ওয়েন'স রক কোনদিকে?

উত্তরদিক দেখিয়ে লোকটা বলল, 'তিন মাইল।'

'ধন্যবাদ,' বলে দোকান থেকে বেরোবার জন্যে ঘুরতে যাবে কাউরু, লোকটা ওকে থামাল।

'ওখানে কি আপনার কাজ আছে?' কাউরুর দিকে ভ্রূ কুঁচকে, চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে লোকটা। তার প্রশ্নটা ভোঁতা টাইপের, সন্দেহ নেই, তবে উদ্দেশ্য খারাপ বলে মনে হলো না।

কাউরু ঠিক বুঝতে পারছে না কীভাবে উত্তর দেবে, শুধু বলল, 'ওখানে আমার এক পুরোনো বন্ধু থাকেন বলে জানি আমি।'

কাঁধ ঝাঁকানোর সময় লোকটার ঠোঁট যেন নিজে থেকেই কেঁপে উঠল। বলল, 'ওখানে কিছু নেই।'

কাউরু মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে চাইল, সে বুঝেছে, তারপর শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করল, 'ওখানে কিছু নেই।'

কথা না বলে কাউরুর দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

এখন ওর কি করা উচিত ভাবছে কাউরু। শুধু এক লোক ওখানে কিছু নেই বলায় নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে? না, প্রশ্নই ওঠে না, নিজে গিয়ে দেখতে হবে ওকে।

জোর করে একটু হাসল কাউরু। 'ধন্যবাদ,' বলে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। লোকটা আর কিছু বলল না।

আশপাশে কোথাও না আছে লোকজন, না আছে যানবাহন। রাস্তা যতদুর দেখা যায় খাঁ খাঁ করছে। উত্তর দিকে বাইক ছেড়ে কাউরু ভাবল, ওকে ছাড়া আজ আর কজন খদ্দের পেয়েছে ওই লোক?

সময় জানা দরকার। ঘড়ি দেখার জন্যে হ্যান্ডেল বার থেকে হাত তুলল কাউরু। কিন্তু বাধা হয়ে রয়েছে চামড়ার দস্তানা, হাতঘড়িটা দেখতে পাচ্ছে না। চিবুক দিয়ে ঠেলে দস্তানা সরাবার চেষ্টা করল, তা করতে গিয়ে পলকের জন্যে চোখ সরাতে হলো রাস্তা থেকে।

আবার যখন মুখ তুলল, দেখল ঝোপ-ঝাড় ঢাকা উঁচু একটা জায়গার পেছনে পুরোনো কিছু গাছ উত্তরমুখী মরুভূমির দিকে চলে গেছে সার বেঁধে। বেশিরভাগ ড্রাইভারের চোখে ওগুলো ধরা পড়বে না, কিন্তু কাউরুর চোখ খোঁজার মধ্যে রয়েছে। গ্যাস স্টেশন থেকে ঠিক তিন মাইল দূরে চলে এসেছে ও।

কাঁচা একটা রাস্তা দেখতে পেল, সারি বাঁধা গাছগুলোর সঙ্গে এগিয়েছে। সেদিকে যাচ্ছে কাউরু।

BanglaBook.org

কিছুদূর গিয়ে বাইক থামাল কাঁচা রাস্তায় ঢোকার মুখে। উপলব্ধি করল, দূর থেকে দেখে যেগুলোকে গাছ বলে মনে হয়েছিল সেগুলো আসলে কাঠের খাম্বা, ত্রিশ-চল্লিশ গজ পরপর একটা করে খাড়া করা হয়েছে। ওগুলোর কোনো কোনোটা থেকে কালো বৈদ্যুতিক তার ঝুলে আছে। পাওয়ার লাইন, দেখে মনে হচ্ছে বেশ অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি।

চোখ খোলা না রাখলে কাউরু জানতেই পারত না যে এখানে একটা রাস্তা আছে। বৈদ্যুতিক খাম্বার পাশে সরু একটা বিস্তৃতি, কিছুটা সমতল, আর শুধু এই বিস্তৃতিতেই কোনো ক্যাকটাস জন্মায়নি। এটা যে একটা রাস্তা, বা এককালে রাস্তা ছিল, এগুলোই তার প্রমাণ।

উত্তর দিকে দিগন্ত পর্যন্ত চোখ বুলাল কাউরু, ভাবছে বৈদ্যুতিক খাম্বাগুলোকে অনুসরণ করলে ওয়েন'স রক নামে গ্রামটায় পৌঁছুনো যাবে কিনা। একটা পাহাড়ের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে পথটা।

স্টেইট রোড থেকে ওয়েন'স রক দেখা যাচ্ছে না। তবে কাউরু অনুভব করল, এই পথ আর খাম্বা কিছু বলতে চাইছে ওকে।

ডাকছে নাকি?

অন্তত আমি তো আর হারিয়ে যাচ্ছি না, খাম্বা অনুসরণ করলেই আবার স্টেইট রোডে ফিরে আসতে পারব, ভাবল ও।

আবার হ্যান্ডেলবার দুটো শক্ত করে ধরল কাউরু, বাম দিকে ঘুরিয়ে নিল বাইক, তারপর মরুভূমির মাঝখান দিয়ে ছুটল। আমেরিকায় আসার পর এই প্রথম পাকা রাস্তা ছাড়ল ওর বাহন।

তিন

সামনের পথ খানিকটা ডেবে আছে, সেটাকে এগিয়ে আসতে দেখছে কাউরু, তবে তেমন বড় মনে হচ্ছে না। কিন্তু ওটার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাইক যে লাফটা দিল সেটা আশা করেনি ও। আরেকটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিল, দুর্ঘটনা এড়াতে পারল স্রেফ দক্ষতার কারণে।

সতর্ক না হওয়ায় নিজেকে তিরস্কার করল কাউরু। তারপর থেকে গর্ত বা উঁচু-নিচু জায়গা দেখলে খুব সাবধানে পার হচ্ছে।

পথটা কোথাও একদম সমতল, আবার কোথাও কিছুটা উঁচু-নিচু। পথের পাশে মান্ধাতা আমলের খাম্বাগুলো এখনও আছে–বিন্দু দিয়ে তৈরি রেখা, দুর্গম আর অনুর্বর জগতের সঙ্গে সভ্যতার সংযোগ।

BanglaBook.org

'আহা,' বলল কাউরু। পাহাড়ে ঢুকে পড়া শুকনো নদীর কিনারায় ভেঙে পড়া কিছু দালান দেখতে পেল ও। পথ আর খাম্বা ওই গ্রামের ভেতর ঢুকে হারিয়ে গেছে। কোনো এক পর্যায়ে এই শহরে অন্তত বিদ্যুৎ আর টেলিফোন সংযোগ ছিল। গ্রামের বাইরে আর কোনো খাম্বা ওর চোখে পড়ছে না। লাইনটা সম্ভবত এখানে এসে থেমে গেছে।

গ্রাম যখন এক শ গজের মতো দূরে, একটা ছোট পাহাড়ে থামল কাউরু বাইকে বসেই বিশ-বাইশটার মতো বাড়ি গুণল, সবগুলো খয়েরি পাথর দিয়ে তৈরি। নদীর ওপারে আরও কিছু ঘরবাড়ি যদি থেকেও থাকে, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না ও। এরকম একটা জায়গায় কে বা কারা প্রথম বসবাস করতে এসেছিল, তারা পাগল ছিল নাকি পলাতক আসামী, কাউরুর কোনো ধারণা নেই।

এখানে, এই মরুভূমির মাঝখানে কি খুঁজছিল তারা? এখানকার বাড়ি-ঘর তৈরির কলা-কৌশল দেখে মনে হচ্ছে, প্রথম দলটা এসেছিল বহুকাল আগে। কিন্তু এখন গোটা গ্রাম খালি পড়ে আছে– বাতাসপীড়িত। কাউরু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এক শ গজ দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে জায়গাটা পরিত্যক্ত।

গ্যাস স্টেশনের লোকটা কি বলেছে মনে পড়ল ওর। *ওখানে কিছু নেই।* দেখা যাচ্ছে তার কথাই ঠিক। এটা একটা ভুতুড়ে শহর।

রোদ এখন পশ্চিম থেকে আসছে। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখল পাঁচটার কিছু বেশি বাজে। তবু এখনই স্টেইট রোডে ফিরে যাওয়ার সময় হয়নি। ওই রোড ধরে বিশ-পঞ্চাশ মাইল গেলেই ছোটখাট শহর পাওয়া যাবে খাওয়াদাওয়া আর রাত কাটানোর জন্যে।

ওয়েন'স রক তাহলে মরুভূমির মাঝখানে একটা ধ্বংসস্তূপ। জায়গাটা ওকে প্রায় আদিম একটা ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, কেন? এই জায়গা ওর জন্যে অস্বাভাবিক কোইন্সিডেন্সের একটা ফিউশন হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে, সেজন্যে কি? কেনেথ রথম্যান, উদ্ভাবনী মেধা নিয়ে একজন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, বসবাসের জন্যে এরকম একটা দুর্গম প্রান্ত কী কারণে বেছে নেবেন?

অনেক কিছুই কাউরু বুঝতে পারছে না।

তবে এতটা পথ এসে এখন আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। থ্রটল ওপেন করল কাউরু। সগর্জনে ছুটল ওর বাহন। গ্রামে ঢুকতে যাচ্ছে।

ঢোকার পথে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, আমেরিকার প্রায় সব শহরের মুখেই যেমনটা দেখা যায়।

ওয়েন'স রকে স্বাগতম

বাজে একটা কৌতুক মনে হলো কাউরুর।

BanglaBook.org

যতই এগোল, দেয়াল আর পাঁচিলের গায়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে জালের মতো একটা নকশা। দেয়াল আর পাঁচিলের যে-সব অংশ ক্ষয়ে গেছে বা খসে পড়েছে, বাতাসের বয়ে আনা বালি আর ধুলো পূরণ করেছে সেগুলো, তাতেই ওই নকশা তৈরি হয়েছে। শহরের মূল রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বালিতে ঢাকা।

ছোট দোকানসহ একটা গ্যাস স্টেশনও দেখা যাচ্ছে। ফাটল ধরা কংক্রিট চত্বরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে একটা পাম্প, মাজলটা হুক থেকে নামানো, মেঝেতে পড়ে আছে হোস, কেউটের মতো মোচড়ানো আর কালো, নজলটা বাঁকা হয়ে আছে ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে। দোকানের জানালা আঁট করে বন্ধ, জমিনে ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে আছে।

প্রধান রাস্তার ওপর দিয়ে ধীর গতিতে বাইক চালাচ্ছে কাউরু, দু'পাশের খালি বাড়ির ওপর চোখ বুলাচ্ছে, মনে আশা নেমপ্লেট বা ওরকম কিছু দেখতে পাবে।

শহরের ভেতর অনেক গাছ। তারমানে নিশ্চয়ই প্রচুর পানি আছে। এখানে বসবাস করতে চাওয়ার পেছনে এটা একটা কারণ হতে পারে। ওই পানি পেয়ে ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আর বাইরে এত গাছপালা জন্মেছে, রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে–প্রথম দেখায় সত্যিসত্যি স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ধারণা দেয়। কিন্তু বাতাস যখন ওগুলোর পাতা দোলাচ্ছে, কর্কশ ডাল আর কাণ্ডে অদ্ভুত ফোলা ফোলা ভাব আর গর্তের মতো দেখতে দাগ দেখতে পাচ্ছে কাউরু।

ভালো করে দেখার জন্যে একটা গাছের দিকে এগোল। ফোলা অংশের ছালের রঙ কাণ্ডের বাকি অংশের সঙ্গে মিলছে না। কাণ্ডের গা ওরকম ছাড়া ছাড়া ভাবে এমন সব রঙে ভর্তি হয়ে আছে, মারাত্মক রোদে পোড়া কোনো মানুষের চামড়া উঠে গেলে যেরকম দেখায়।

আক্রান্ত হয়েছে শাখা-প্রশাখাও। এমনকি, দেখতে খুব তাজা হলেও, পাতা পর্যন্ত বাদ যায়নি, কালো আর খয়েরি-হলদেটে দাগে ভরা। শুধু প্রথমদর্শনে গাছগুলোকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়: গা পরীক্ষা করলে ধরা পড়বে কঠিন রোগে জর্জরিত।

অ্যারিজোনার কর্কটে আক্রান্ত গাছ শুধু খবরের কাগজে ছাপা ফটোতে দেখেছে কাউরু, তাতে ওগুলোর বিকৃতির মাত্রা ও ধরন, রঙ হারানোর বিশদ বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া অসম্ভব ছিল। এই গাছগুলো মনে হয় সেই একই লক্ষণ প্রকাশ করছে। ভাইরাসজনিত ক্যানসার, এগিয়েছেও যথেষ্ট। এটা গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছুতে নিশ্চয়ই অনেক বছর সময় লেগেছে।

দ্রুত চারপাশে চোখ বুলাল কাউরু, অকস্মাৎ সতর্ক দেখাচ্ছে ওকে। এখানকার গাছপালা যদি এত দূর পৌঁছে থাকে, তাহলে পশুপাখি আর মানুষের কি অবস্থা?

বাতাস ছাড়া আর কোনো আওয়াজ পাচ্ছে না কাউরু, কিন্তু তারপরও অনুভব

BanglaBook.org

করছে র‍্যাটেলস্নেক, কাঁকড়া বিছে কিংবা অন্য কোনো বিষাক্ত মরু প্রাণী ওর পায়ের নীচে গর্ত খুঁড়ছে। কোনো অশুভ, প্রতিশোধপরায়ণ প্রাণীসত্তা কিংবা তার ছায়া লুকিয়ে আছে এখানে, পাহাড়প্রাচীর কিংবা ক্যাকটাসের পেছনে, অথবা মাটির কোনো ডেলার ভেতর। লুকিয়ে থেকে ওর মনে ভয় ঢোকাচ্ছে।

ওর একটা পা বাইকের ফুটরেস্টে, আরেক পা মাটিতে। দুটো পা-ই লেদার বুটে মোড়া। বহিরাগত কিছু ওর শরীরের ভেতর ঢুকতে পারবে না, জানে ও, কিন্তু তারপরও মাটির সংস্পর্শে আসতে ভয়ে সিঁটকে যাচ্ছে।

গলাটা অসম্ভব শুকিয়ে গেছে, পানি খেতে হবে। লাগেজের সঙ্গে খানিকটা মিনারেল ওয়াটার থাকলেও, সেটা বের করতে হলে বাইক থেকে নেমে মাটিতে দু'পা দিয়ে দাঁড়াতে হবে ওকে। তা করতে কাউরুর মন রাজি হচ্ছে না, কাজেই পানি না খেয়েই শহরের আরও ভেতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

কিছু বাড়ির দেয়াল স্তূপ করা পাথর। আবার সতর্কতার সঙ্গে কিছু মাটির দেয়ালও খাড়া করা হয়েছে। বেশিরভাগ ছাদ ধসে পড়েছে, যে-কোনো ঘরের মাঝখান থেকে ওপরে তাকালে নিশ্চয় আকাশ দেখতে পাবে ও।

বাইক ঘুরিয়ে যাচ্ছেও কাউরু একটা বাড়ির দিকে। উঠান পার হলো, উঁকি দিয়ে তাকাল একটা ঘরে। সত্যি তাই, অস্তগামী সূর্যের গরম রশ্মি তির্যক পথ ধরে ঘরটার ভাঙা ছাদ দিয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে, আলোর সেই টানেলে নাচানাচি করছে রাজ্যের ধুলো।

এত সব মানুষ গেল কোথায়? সবাই কি মারা গেছে? এমএইচসি ভাইরাস কাউকে রেহাই দেয়নি? নাকি পালিয়েছে তারা, হাসপাতাল আছে এমন কোনো শহরে?

'হ্যালো?' বাড়িটার ভেতর দিকে মুখ করে ডাকল কাউরু। কোনো সাড়া নেই, পাবে বলে আশাও করেনি। ওর গলার আওয়াজ যে কম্পন সৃষ্টি করল, তাতে যেন আলোর টানেলটা একটু নড়ে গেল বলে মনে হলো। হয়তো চোখের ভুল।

খসে পড়া দেয়ালের ভেতর দিয়ে বেশ বড় একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পাচ্ছে কাউরু, চারপাশে বাড়ি-ঘর।

প্রয়োজনের সময় যাতে দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে, বাইকের মুখ গ্রামের কিনারার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে নীচে নামল কাউরু। ইঞ্জিন বন্ধ করল না। প্যাক খুলে মিনারেল ওয়াটার বের করে ঢক ঢক করে পানি খেলো।

এখানে একটা লক্ষ্য নিয়ে এসেছে, সেটা পূরণ করতে হবে ওকে। প্রথম কাজ কেনেথ রথম্যানকে খুঁজে বের করা। তাঁর ঠিকানা চাই, যেখানে তিনি বাস করেন বা বাস করতেন।

বাইকে চেপে আসার সময় সতর্কতার সঙ্গে নেমপ্লেট খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। দেখা যাচ্ছে বাইক রেখে হাঁটতে হবে ওকে, প্রতিটি বাড়ি চেক করে দেখতে হবে

BanglaBook.org

ছাদ ভাঙা ঘরের ভেতর ঢুকে তির্যক রোদ মাড়িয়ে পেছনের ফাঁকা চত্বরে বেরোল কাউরু। দেখে মনে হলো, চাতালটা আসলে সামাজিক মেলামেশার একটা জায়গা। পুরোনো স্প্যানিশ ধাঁচের মনুমেন্ট রয়েছে মাঝখানে, প্ল্যাস্টার করা নারীমূর্তি, রেলিং দিয়ে ঘেরা। দু'সারি বাড়ি, দুটোই আধখানা চাঁদ আকৃতির। ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকে পাহাড়ী ঢাল। মাঝখানে, মনুমেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে, কাউরু কল্পনা করল এই গ্রামটাকে ওপর থেকে কেমন দেখাবে। দু'সারি বাড়ি মেলে ধরা পাখির লেজের মতো লাগবে দেখতে।

মনুমেন্টের পেছনের জমিন অনেকটা জায়গা নিয়ে ডেবে আছে, ভেতরে বৃত্তাকার কিনারাসহ একটা কুয়া। পানি তাহলে সত্যি আছে এখানে। সেজন্যেই লোকজন বসবাস শুরু করেছিল। ঝুঁকল কাউরু, পচা পানির দুর্গন্ধ ঘুষির মতো আঘাত করল ওকে। গোটা গ্রাম শুকনো খটখটে, কিন্তু কুয়ায় পানির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কুয়াটা শামুক আকৃতির। প্যাঁচানো এক প্রস্থ সিঁড়ির ধাপ বেয়ে কুয়ার কিনারায় পৌঁছুতে হবে আপনাকে, যেন শামুকের একটা খোল অনুসরণ করে।

কুয়ার ওপর কোনো ঢাকনি নেই। বাতাস ওটার ওপর দিয়ে বাঁশীর মতো আওয়াজ করে বয়ে যাচ্ছে।

কুয়ার কিনারায় ছোট কিছু কালো আকৃতি চোখে পড়ল, আকারে মুঠোর সমান। প্রথমে কাউরু ভাবল পাথর, কিন্তু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বুঝতে পারল পাথর নয়, মরা ইঁদুর, চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সব মিলিয়ে গোটা চাতালে দশ-বারোটার কম হবে না।

স্বভাবতই মরা ইঁদুরের তৈরি রেখা অনুসরণ করল কাউরুর দৃষ্টি। কালো আকৃতিগুলো গিয়ে মিশেছে ফাঁকা চাতালের কিনারায়, একটা গাছের নীচে। এখানে দাঁড়িয়েই পরিষ্কার বুঝতে পারছে, গাছটা কর্কট রোগে আক্রান্ত—ক্যানসারাস।

গাছের তলায় একটা বেঞ্চ। তাতে বসে আছে একজন মানুষ। মরা মানুষ, ইঁদুরের মতো একই রঙ সেটারও। সূর্য পেছনে থাকায়, লাশটা স্রেফ কালো একটা আকৃতি মাত্র।

বেঞ্চের দিকে এগোচ্ছে কাউরু, দশ ফুট দূরে থাকতে দাঁড়াল। ওটা একটা পুরুষের লাশ, দেখে মনে হচ্ছে অনেকটাই মমি হয়ে গেছে। পা দুটো মেলে দেয়া, অসাড় ভঙ্গিতে হাত দুটো ঝুলছে, মাথাটা পেছনদিকে হেলে বেঞ্চের পিঠে ঠেকেছে, চোয়াল সামনের দিকে বের করা। চিবুক থেকে কয়েক গাছি লম্বা চুল ঝুলে আছে, যে চুলকে একসময় কাউরুর ছাগলদাড়ি বলে মনে হয়েছিল... পচেনি শুধু গলা আর কবজিতে জড়ানো সোনার চেইনগুলো, রোদ লেগে চকচক করছে।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে লাশের মুখটা পরীক্ষা করল কাউরু। পাঁচ বছর আগে

BanglaBook.org

যে কেনেথ রথম্যানকে দেখেছিল ও, যিনি জাপানে গিয়ে ফুতামি পরিবারের সঙ্গে দিন কয়েক ছিলেন, তাঁরও এরকম সরু মুখ ছিল, গলায় আর কবজিতে ছিল সোনার চেইন। এটা ধরে নেয়া চলে যে লাশটা রথম্যানেরই।

নিশ্চয়ই এখানে, নিজ দেশে মারা গেছেন কেনেথ রথম্যান; চিকিৎসার কোনো চেষ্টা না করে।

চারদিকে চোখ বুলাল কাউরু। কিসে যেন আটকে গেল দৃষ্টি। পাহাড়ী ঢালে কিছু গাছপালা আছে, শুকনো আবহাওয়া যতটা অনুমোদন করে। সেগুলোর মাঝখানে ফুল দেখতে পাচ্ছে ও, তালুর সমান আকার নিয়ে ফুটে আছে–বাতাস লেগে ডালপালা দুলে উঠলে দেখা যাচ্ছে।

নিঃসঙ্গ একটা গাছে ফুল ফুটেছে। ওটার কাণ্ড সরু ; শাখাগুলো রোগা। পাতা দেখতে নরম। তবে শুধু এই একটা গাছেই প্রাণশক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

পাহাড়ী ঢালের প্রতিটি গাছ ক্যানসার আক্রান্ত: দূর থেকেও কাউরু দেখতে পাচ্ছে পাতাগুলোর শিরা বিদঘুটে ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে।

শুধু এই একটা গাছের রঙ বদলায়নি, এবং প্রতিটি শাখার শেষপ্রান্তে ম্লান লালচে-বেগনি ফুল ফুটেছে।

কিছু উদ্ভিদ অযৌন পন্থায় বংশ বিস্তার করে, কিছু তার বিপরীত। কাউরু লক্ষ করল এই পাহাড়ী ঢালে ছড়িয়ে থাকা ঝোপ-ঝাড়গুলো অযৌন। তবে ফুল ফোটা মানে যৌন জনন। কাউরু শুনেছে, অযৌন পন্থায় বংশ বিস্তার করা উদ্ভিদ হঠাৎ করে যৌন জনন পদ্ধতিতে বদলে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে, জীবনে প্রথমবারের মতো ফুল ফোটায়, তারপর দ্রুত জরায় আক্রান্ত হয়ে শুকিয়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে, এ-ধরনের একটা উদ্ভিদ চিরকাল ফুল ফোটাতে পারে না: ফুল ফোটানোর আনন্দ আসে মৃত্যুর বিনিময়ে।

কাউরুর ইচ্ছে হলো আধফোটা একটা ফুল ছিঁড়ে এনে রথম্যানের লাশের পাশে রেখে আসে।

অযৌন পন্থায় বংশবৃদ্ধি করা উদ্ভিদ সঠিক আবহাওয়ায় চিরকাল বাঁচে। মোহাবে মরুভূমিতে সুনিশ্চিত উদাহরণ আছে, এরকম উদ্ভিদ দশ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে টিকে আছে। অর্থাৎ...

একটা পেট্রি ডিশে ঠিক ক্যানসার সেলের মতো।

কাউরু এই মুহূর্তে অবশ্য উল্টোটা চাক্ষুষ করছে: একটা মাত্র গাছ ফাঁকি দিতে পেরেছে ক্যানসারকে, যেটা যৌন জনন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধির যোগ্যতা অর্জন করেছে। এবং, অবশ্যই, খুব একটা দেরি হবে না, ফুলসহ ওই গাছটা স্বাভাবিক নিয়ম ধরে মারা যাবে।

ফুল ফোটার যে আনন্দ, সেই আনন্দের হাত ধরে আসছে প্রোগ্রাম করা মৃত্যু; অথচ একটা প্রাণীসত্তা, যেটা ক্যানসারে পরিণত হয়েছে, বেঁচে থাকবে চিরকাল,

BanglaBook.org

জরাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে, তবে কখনোই ফুল ফোটাবে না। দেখে মনে হচ্ছে দুটো বিকল্পের মধ্যে যেকোনো একটা বেছে নেয়ার মতোই সহজ এটা।

কোনটা বাছবে কাউরু? উজ্জ্বল, দ্যুতিময় নশ্বর জীবন, নাকি নীরস একটা জীবন, যেটা চলতে থাকবে চিরকাল?

নিজের পছন্দ উপলব্ধি করতে খুব বেশি সময় লাগল না কাউরুর: ফুল ফোটা জীবনই ভালো লাগবে ওর।

পাহাড়ী ঢাল বেয়ে ফুলগুলোর দিকে উঠছে কাউরু।

চার

একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ঘুরল কাউরু, ঢাল বেয়ে নীচে নেমে আসবে। নামার জন্যে পা ফেলতে যাবে, চোখে পড়ল ওর নীচের কয়েকটা ছাদের কোথাও সরু ও তীক্ষ্ণ একটা আলো প্রতিফলিত হলো।

মাটির যা রঙ, ওই একই রঙের পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রতিটি ছাদ। ওগুলোয় আলো প্রতিফলিত হওয়ার কথা নয়, ভাবল কাউরু, চোখ সরু করে ঝলকটার উৎস খুঁজছে।

ওর সতর্ক দৃষ্টিতে কালো ও চৌকি কি যেন ধরা পড়ল, লাল ইঁটের তৈরি পড়ো পড়ো দালানের ছাদে পড়ে রয়েছে।

চৌকো জিনিসটার ইস্পাতের কিনারা দেখা যাচ্ছে, ওটা থেকেই প্রতিফলিত হয়েছে ডুবতে বসা সূর্যের আলো।

ওখানে ছাদের ওপর জ্বল জ্বল করছে প্যানেলটা, যেন ভিনগ্রহ থেকে আসা কিছু একটা আলো ছড়াচ্ছে। বিধ্বস্ত এ-ধরনের দালানের মাথায় বড় বেশি নতুন লাগছে ওটাকে। হয়তো প্রধান সড়ক থেকে গ্রামটা এত দূরে হওয়ায় এরকম একটা সিস্টেমের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওটাকে বেমানান লাগছে।

এত দূর থেকেও কালো প্যানেলকে সোলার পাওয়ার সিস্টেমের অংশ বলে চিনতে কাউরুর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। একটা বাড়ির চাহিদা মতো বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যথেষ্ট বড় ওটা।

এরকম যদি সব কটা বাড়িতে থাকত, তাহলে রাস্তা থেকে গ্রামের ভেতরে বৈদ্যুতিক খাম্বা বসানোর প্রয়োজন হত না। কিন্তু গ্রামের অন্যান্য ছাদে এরকম প্যানেল আর দেখতে পাচ্ছে না কাউরু। মনে হচ্ছে বিশেষ করে শুধু এই একটা বাড়িতেই বসানো হয়েছে।

প্রফেসর অ্যামানো কাউরুকে বলেছেন, তাঁর জানামতে পুরোনো একটা

BanglaBook.org

বাড়িতে থাকেন রথম্যান, সেটাকে তিনি তাঁর কাজের জায়গা হিসেবেও ব্যবহার করেন। ও ভাবল, রথম্যান হয়তো নিজের প্রাইভেট ল্যাবে সোলার পাওয়ার ব্যবহার করতেন।

লাশের হাঁটুর ওপর ফুলটা রেখে বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটছে কাউরু, সোলার প্যানেল লাগানো দালানটা খুঁজছে। পাহাড়ের ঢালে থাকতেই চিনে রেখেছিল, কিন্তু নীচে নামার পর দিশেহারা বোধ করছে, যেন একটা গোলকধাঁধার ভেতর ঢুকে পড়েছে।

এদিক গেল, ওদিক গেল, তারপর দেখল সামনে আর যাওয়ার উপায় নেই, কানাগলি। ঘুরে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ল, খানিক পর পৌঁছুল করিডরের মতো একটা জায়গায়।

দেয়ালের গায়ে গর্ত আর ফাটল, শিস বাজিয়ে বাতাস ঢুকছে ভেতরে, কিন্তু বেরোবার জায়গা না পেয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ওর গোড়ালির চারপাশে। মনে হলো আদিবাসী আমেরিকানদের গান শুনতে পাচ্ছে ও, কিংবা ওটা হয়তো পাখির ডাক, অথবা একজোড়া ডাল পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে।

স্থির হলো কাউরু, কান পাতল। ওর শ্রবণ যন্ত্রটি বিভ্রান্তির শিকার: কোনটা কাছে কোনটা দূরে পার্থক্য করতে পারছে না। একবার মনে হলো দূর থেকে ভেসে আসা মানুষের গলা শুনছে, পরমুহূর্তে শ্রুতিভ্রমের শিকার হয়ে অনুভব করল ওর কানে ফিসফিস করছে কেউ। কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ ওটা, বিড়বিড় করছে–পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে কাউরু–ডান দিকের দেয়ালের ওদিক থেকে ভেসে আসছে।

থামল আওয়াজটা। তারপর আবার যখন শুরু হলো, এবার ভেসে আসছে বাঁ দিকের দেয়ালের ওদিক থেকে।

ওই কণ্ঠস্বর আর বাতাসের শিস চারদিক থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হলো, দেয়ালের গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় বিভিন্ন মাত্রার অনুরণন তুলছে।

ওর ভয় করছে না, বাতাস খুব শুকনো হওয়াটাই কি তার কারণ? সম্পূর্ণ আর্দ্রতামুক্ত হওয়ায়, বাতাস যেন তার খুদে হাত খুইয়ে ফেলেছে, যেগুলো আঁকড়ে ধরে ঠাণ্ডা হিম কামড় দিতে পারত ওকে। নিরাবরণ যেকোনো ত্বক থেকে ভেজা ভাব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়; কাউরু ভয় পেল, একটু পর থেকে সে হয়তো কিছুই অনুভব করবে না।

বাকি সব ইন্দ্রিয় বাদ দিয়ে শুধু শ্রবণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কাউরু। শব্দটার উৎস সন্ধানে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। একদিকের দেয়ালের গর্ত গলে ভেতরে ঢুকল। এরকম আরেকটা গলল। এরপর ওর সামনে বর্ণিতে গেলে অন্য একটা জগৎ খুলে গেল।

অস্পষ্ট একটা গন্ধ। জায়গাটা দু' শ' বর্গফুট হবে, চারপাশে ভাঙাচোরা দেয়াল। আগে যা পায়নি এখানে, প্রকৃতিতে যে জিনিসটা পাওয়া যায় বলে মনে হয়

BanglaBook.org

না, সেটা পাচ্ছে কাউরু–মানুষের গন্ধ।

এক কোনে পাইপের ফ্রেম দিয়ে বানানো খাট। তাতে বিছানা নেই, শুধু পুরোনো তোষক ফেলা, তা থেকে কয়েকটা স্প্রিং বেরিয়ে পড়েছে। ওটার পাশে হোঁৎকা চেহারা নিয়ে একটা টেবিল। তার পাশে দুটো ডেক চেয়ার, মুখোমুখি রাখা–বাড়ির চেয়ে বেশি মানাত সৈকতে।

মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে একটা ল্যাম্প। টেবিলের পায়ায় হেলান দিয়ে দাঁড় করানো চামড়ার সুটকেস। দেয়ালে তাক আছে, প্রায় সবকটাই ভাঙা, ওগুলোয় রাখা জিনিস-পত্র কিনারায় চলে এসেছে। নীচের তাকে কিছু বই-পত্র।

কামরার সবকিছুই অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভারসাম্য রক্ষা করছে। কাউরুর সন্দেহ হলো, ও যদি তাক থেকে কিছু একটা তুলে নেয়, কিংবা টেবিলটা কয়েক ইঞ্চি সরায়, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে সব।

অকস্মাৎ আবার ফিরে এল কর্কশ কণ্ঠস্বর, ওর কানে নিঃশ্বাস ফেলছে। ভীষণ চমকে উঠল কাউরু। চারদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে।

কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

দ্রুতই মিলিয়ে গেল আওয়াজটা, পেছনে রেখে গেল ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গুঞ্জন। দেয়াল আর টেবিলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা রয়েছে, সেদিকে তাকাল কাউরু। ওখানে বৈদ্যুতিক তার পড়ে রয়েছে। আশ্চর্য, এতক্ষণে খেয়াল করল টেবিলের ওপর একটা রেডিও! আওয়াজটা বলে দিচ্ছে কারেন্ট সাপ্লাই বিরতিহীন নয়।

তারটা ধরে একটু ঝাঁকাল কাউরু। গুঞ্জনটা আরও নিস্তেজ হয়ে গেল, তার বদলে এক লোকের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, সঙ্গে গিটারের বিষণ্ন সুরে। রেডিওর প্রোগ্রাম। গায়ক দুঃখের গান গাইছে। শব্দগুলো কিছু ধরতে পারল কাউরু–বহুকাল আগে শেষ হয়ে যাওয়া একটা প্রেমের প্রসঙ্গ নিয়ে হা-হুতাশ।

ঝুঁকে টিউনার অ্যাডজাস্ট করল কাউরু, যান্ত্রিক শব্দজট আরও কমিয়ে আনল। বাতাসে ভর করে চারদিকে ছড়ানো আওয়াজের এই উৎসটাই এতক্ষণ ওকে বিভ্রান্ত করছিল। যেকোনো কারণেই হোক রেডিওটা এখনও অন করা, সকেটে প্লাগ ঢোকানো, এবং যথারীতি সংকেত পাচ্ছে। শ্রোতা না থাকলেও গান বাজছে।

পাওয়ার লাইনটা এই ধ্বংসস্তূপে এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে, এটা অসম্ভব। অনেক আগেই তা বন্ধ হয়ে গেছে।

অবশ্যই ছাদের ওপর বসানো সোলার প্যানেল থেকে বিদ্যুৎ আসছে। তা না হলে এখনও রেডিওটা চালু থাকার আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

তার অনুসরণ করে ওয়াল সকেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কাউরু, তারপর আবার ভলিউম অ্যাডজাস্ট করল। কোনো ভুল নেই, কোথাও থেকে বিদ্যুৎ আসছে।

লেগে থাকো, নিজেকে উৎসাহ দিল কাউরু। মরুভূমির মাঝখানে বাড়িটা

BanglaBook.org

আধুনিক বিজ্ঞানের একটা স্বর্ণমুকুট পরে আছে, এই জ্ঞান ওকে এক ধরনের সাহস যোগাচ্ছে।

একদিকের দেয়ালে পাশের ঘরে যাওয়ার দরজা নবে হাত রাখল কাউরু। সহজেই খুলে গেল কবাট

চৌকাঠের পর একটা প্যাসেজ, শেষ হয়েছে আরেক দরজার সামনে। সেটা খোলা, ভেতরে এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, নেমে গেছে বেজমেন্টে।

ধাপগুলো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। তবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখে অন্ধকার সয়ে এল, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে নীচেটা। একটা দরজার ভেতর থেকে সামান্য আলো আসছে তারমানে কি বেজমেন্টে কারেন্ট আছে?

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নীচে তাকিয়ে থাকল কাউরু, ভাবছে: পথ দেখিয়ে এখানে আনা হয়েছে ওকে।

ওখানে একটা আলো জ্বলছে।

ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করল কাউরু সম্ভবত রেডিওর মতো ওটাও অন করে রাখা হয়েছে।

প্রতিবার একটা করে ধাপ, নীচে নামছে কাউরু।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভেতরে কি আছে বোঝার চেষ্টায় কান ঠেকাল কবাটে। কোনো আওয়াজ নেই। অনুভবে কারও উপস্থিতিও ধরা পড়ছে না।

দরজায় নক করতে যাচ্ছিল, তারপর ভাবল নেহাতই বোকামি হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে নবটা ধরে ঘোরাল, কবাট খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সিলিং থেকে নিঃসঙ্গ একটা ফ্লুরোসেন্ট বালব্ ঝুলছে, ম্লান আলো ছড়াচ্ছে বেযমেন্টে। তবে ঘরের কোনে আরেকটা বিশেষ আলো জ্বলছে, যেটা আধুনিক সভ্যতার লক্ষণ প্রকাশ করে।

প্রচুর জায়গা নিয়ে বেযমেন্ট, কারণটাও পরিষ্কার কামরার ঠিক মাঝখানে একটা কমপিউটার বসানো হয়েছে, চারপাশে সংশ্লিষ্ট কেবিনেট। মনিটর মিটমিট করছে।

ঘুরে এগোল কাউরু, যতক্ষণ না মনিটরের মুখোমুখি হলো ওটার পাশে একটা হেলমেট রয়েছে, সেটার ভেতরে ও বাইরে, দুদিকেই ইলেকট্রনিক ডিভাইস ফিট করা এটা সম্ভবত একটা হেলমেট ভিসপ্লে: ছেলেবেলায় ভার্চুয়াল রিয়্যালেটি গেইমস খেলার জন্যে প্রায় এরকম একটা ব্যবহার করত সে। অনেকদিন পর দেখছে বলে মধুর সব স্মৃতি এসে ভিড় করল মনে।

হেলমেটের পাশে তার লাগানো গ্লাভ পড়ে রয়েছে, তবে দুটোর কোনোটাই ছুঁলো না কাউরু। থামল মনিটরের সামনে

যেন সামনে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে মনিটরের স্ক্রিনে হরফ ফুটতে শুরু করল:

BanglaBook.org

প্রতিবার একটা করে অক্ষর আত্মপ্রকাশ করল। আইডিয়াটা ছেলেমানুষির চূড়ান্ত মনে হলো কাউরুর। সিস্টেমটা এমনভাবে সেট করা হয়েছে, কেউ সামনে এসে দাঁড়ালে টের পাবে ডিসপ্লে, অমনি সচল হয়ে উঠবে সেটা।

মুহূর্তের জন্যে সামান্য আচ্ছন্ন বোধ করল কাউরু। স্ক্রিনের সামনে ফেলা চেয়ার ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল, ধীরে ধীরে বসল সেটায়, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর কমপিউটারকে লক্ষ্য করে মুখ খুলল:

'আপনার পরিচয়টা কি, শুনি?'

কমপিউটার ওর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিল না, তার বদলে ওকে একটা দৃশ্য দেখাল।

খাঁ খাঁ, বাতাসতাড়িত মরুভূমি। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু বালিয়াড়ি। দৃশ্যটা এমনভাবে সচল হলো, দর্শকের মনে হবে মরুভূমির ওপর দিয়ে ছুটছে সে। একটা পথ পাওয়া গেল, উঁচু-নিচু ঢালের ওপর দিয়ে এগিয়েছে। পথের সামনে পড়ল একটা গ্রাম। এই গ্রামটাকে আগে কোথাও দেখেছে কাউরু।

তারপর সে উপলব্ধি করল, ওটা ওয়েন'স রক; তবে ও যে ওয়েন'স রককে চেনে তারচেয়ে এটা অনেক আলাদা। কমপিউটারের পরদায় যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা অনেক ছোট, মাত্র অল্প কটা বাড়ি চোখে পড়ছে, সেগুলো কাঠের তৈরি, পাথরের নয়। পেছনে পাহাড়ী ঢালটা না থাকলে কাউরু বুঝতেই পারত না কি দেখছে।

ওর মনে প্রশ্ন জাগল, এটা কতদিন আগের ছবি? এক শ বছর? আরও বেশি? দৃশ্যটায় এখনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না, এমন কোনো লক্ষণও নেই যেটা দেখে বোঝা যাবে কোন যুগ। তবে একটা জিনিস ধরা যাচ্ছে, ওটা ওল্ড ওয়েস্ট–পুরোনো পশ্চিম।

এটা কি সিনেমা? স্বাভাবিক প্রশ্ন।

কমপিউটার গ্রাফিক্স বলে মনে হচ্ছে না। কাউরুর ভাবতে ইচ্ছে করছে, এটা ডকুমেন্টারি গোছের কিছু হবে–ফিল্মে রেকর্ড করে রাখার প্রয়াস। কিন্তু এটা যদি এক শ বা তারও বেশি আগে রেকর্ড করা হয়ে থাকে, তাহলে এতটা পরিষ্কার দেখাচ্ছে কেন, কেনই বা এরকম সুরক্ষিত অবস্থায় আছে?

না, ও যা দেখছে তা সম্ভবত কোনো বিশেষ টেকনলজি ব্যবহারের ফল, বর্তমান ওয়েন'স রকের ছবিতে প্রাচীন শহরটা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তবে দেখতে একদম আসল লাগছে।

পেছনে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে চমকে উঠল কাউরু। এতটাই বাস্তব শোনাল, দেখার আশায় ঘাড় ফেরাল। ঘোড়া নয়, দেখতে পেল পেছনের পাথুরে

BanglaBook.org

দেয়ালে একটা স্পিকার ঝুলছে।

মনিটরের দৃশ্যটা দ্বিমাত্রিকে দেখানো হচ্ছে, তবে আওয়াজটা আসছে ত্রিমাত্রিক।

মনিটরের পাশে পড়ে থাকা গ্লাভ আর হেলমেটের দিকে বারবার তাকাচ্ছে ও; অবশেষে বুঝতে পারল কী ওকে করতে বলা হয়েছে।

তুমি যদি 3D-এ দেখতে চাও, হেলমেট আর গ্লাভ ব্যবহার করো।

কাজেই ওগুলো হাতে নিল কাউরু। হেলমেট পরে মাথা ঘোরাতেই ওর মনের চোখ দৃশ্যটাকে ৩৬০ ডিগ্রি দৃষ্টিতে দেখতে পেল।

ওর পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ এখন শুধু আর ত্রিমাত্রিক থাকল না, অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠল, প্রতিধ্বনি তুলছে ওর মগজে। কাউরু অনুভব করল, ওই আওয়াজের সঙ্গে ওর পায়ের নীচে জমিন কাঁপছে।

যদিও বুট পরে আছে কাউরু, কিন্তু তারপরও কীভাবে যেন একটা ক্যাকটাসের শিরদাঁড়া পায়ের তলায় বিঁধে যাওয়ায় তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল ও। লোকজনের হইচই আচ্ছন্ন করে তুলল ওকে। ঘাড়ে গরম বাতাস লাগল, প্রবল তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, দরদর করে ঘামছে।

ধাওয়া খেয়ে অবিরত ছুটছে কাউরু, লোকগুলোর হাতে ধরা না দেয়ার জন্যে পালাচ্ছে। আর যখন সহ্য করতে পারল না, পেছন দিকে তাকাল সে, একডজন বা তারও বেশি ঘোড়সওয়ার ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল, পেছনে ঝুলে থাকা সূর্যের গায়ে তাদের মাথায় গোঁজা পালক ফুটে উঠেছে।

পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলবে আমাকে।

লাফ দিয়ে একপাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কাউরু, ওদের পথের বাইরে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পেশিবহুল একটা হাত লম্বা হয়ে ওর বগল খামচে ধরল, তারপর একটানে তুলে নিল। হাতটা নিরেট, স্পর্শের অনুভূতি মিথ্যে নয়। ঘাম আর ধুলোর গন্ধ পাচ্ছে ও।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই শক্তিশালী হাতটা ওকে একটা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল।

নিজেকে কাউরু বলল, স্বপ্ন দেখছি। ও জানে, কিংবা ভাবছে জানে, এটা বাস্তব নয়; কিন্তু যখন ইন্ডিয়ান লোকটার পিঠে নিজের মুখ চেপে ধরল—কঠিন পেশির সমষ্ঠি ওটা—ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ার ভয়ে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল তাকে, চোখের সামনে মানুষের কয়েকটা খুলি দেখতে পেল, অলঙ্কার হিসেবে ইন্ডিয়ান যোদ্ধার কাঁধ থেকে ঝুলছে।

তার মধ্যে একটা খুলি একদম নতুন, ভেতর দিকটা এখনও ভিজে, এখনও রক্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ওর কোটরের ভেতর চোখ দুটো যেন সাঁতরাচ্ছে। মাথাটা পেছন দিকে ঝুলে

BanglaBook.org

পড়ল, যদিও ওর ইন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করে দিল ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলে মারা যাবে সে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অস্তিত্ব হারাল বাস্তবতা আর অবাস্তবতার মাঝখানের দেয়ালটা।

পাঁচ

কাউরুর কোনো ধারণা নেই ঘোড়ার পিঠে কতক্ষণ এভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে সে। কয়েক মিনিট হতে পারে, কিন্তু কেউ যদি বলে কয়েক ঘণ্টা, তাও হয়তো বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করবে।

একটা উপত্যকায় নামল ওরা। গিরিখাদের নীচে বয়ে চলেছে একটা নদী, সেটার পাশে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সবাই। ঠিক নদী নয়, খরস্রোতা পাহাড়ী নালা। এতটা গভীরে এত বিপুল জলরাশি দেখে বিস্মিত হলো কাউরু। গিরিখাদের মাথা থেকে যখন নীচে তাকিয়েছিল, সরু ফিতের মতো লাগছিল নালাটাকে—তখন কল্পনায় ধরা দেয়নি এটা এত পানি বহন করতে পারে।

পানি মোটেও পরিষ্কার নয়, খয়েরি মাটি গোলা। তবে এরকম শুকনো জায়গায় শুধু নদীর পাশে দাঁড়াতে পারাটাও বিরাট স্বস্তি বটে।

কিনারা ধরে কিছুক্ষণ এগোল ওরা। সামনে চওড়া একটা জায়গা, ওখানে বাঁক নিয়ে উপত্যকায় পৌঁছেছে নদী।

এখানে থামল দলটা। দলের কয়েকজন গিরিখাদের মাথার দিকে তাকিয়ে পশুর ডাক নকল করছে।

বাকিরা দুটো আলাদা গ্রুপে ভাগ হলো, এক দল উজানের দিকে নজর রাখল, আরেক দল ভাটির দিকে—পিছু নেয়া এবং ওত পেতে থাকা সম্ভাব্য শত্রুর বিরুদ্ধে সতর্কতা।

জ্বলজ্বলে সূর্য জমিন পোড়াচ্ছে, সোল থাকা সত্ত্বেও পায়ে উত্তাপ অনুভব করছে কাউরু। অনুভব করতে পারছে সময়ের বয়ে চলা।

নালার কিনারা ঢেকে রাখা গাছপালায় একটা কম্পন সৃষ্টি হলো। তারপর পাথর আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ইন্ডিয়ান মেয়ে, শিশু আর বৃদ্ধার ছোট একটা দল। তবে ঘোড়সওয়ারদের চেয়ে সংখ্যায় তারা বেশি।

প্রথমে মনে হলো মেয়েরা সামনে আসতে ভয় পাচ্ছে, পা চলছে না। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা পুরুষদের দিকে একাধারে উত্তেজনা আর প্রত্যাশা, আনন্দ আর আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে তারা।

BanglaBook.org

কাউরু দেখল, ওদের চেহরায় আকুল প্রার্থনার ভাবও ফুটে আছে।

তারপর যে মেয়ে যেইমাত্র নিজের প্রিয়জনের মুখ চিনতে পারল, পশুসুলভ তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে।

চিনতে পেরে যার যার পুরুষের কাছে ছুটে আসছে তারা পুরুষরাও ঘোড়া থেকে নেমে জড়িয়ে ধরছে তার তার মেয়েমানুষকে।

আগে যে সতর্কতা প্রদর্শন করা হয়েছে তার সঙ্গে এখনকার ব্যাকুলতা সঠিক মাত্রায় সরাসরি ভারসাম্য রক্ষা করছে ওদের এই পুনর্মিলনে।

মেয়েদের চিৎকার শুনে মনে হলো তারা যেন কাঁদছে। তবে মন দিয়ে শুনলে দু'ধরনের আওয়াজ ধরা পড়বে কানে। কেউ আনন্দে কাঁদছে, কেউ দুঃখে। যারা বুঝতে পারল ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে তাদের আপনজন নেই তারা জমিনে হাঁটু গাড়ল, হাত দিয়ে অনবরত চাপড় মারছে মাটিতে, গলার রগ ফুলিয়ে অভিশাপ দিচ্ছে ভাগ্যকে। কেউ আবার শিশুদের আঁকড়ে ধরে আকাশের দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, কেউ বৃদ্ধাদের হাত ধরে ঢলে পড়ল মাটিতে।

হঠাৎ বুঝতে পারল কাউরু কি ঘটছে এখানে। ইন্ডিয়ানদের একটা গোষ্ঠী–নিশ্চয়ই তারা এই এলাকায় বসবাস করে–তাদের যোদ্ধাদের কোথাও লড়াই করতে পাঠিয়েছিল। কতজন গিয়েছিল?

ও দেখল যতগুলো মেয়ে আপনজনকে ফিরে পেয়ে আনন্দে ভাসছে, প্রিয়জনকে হারিয়ে বুক চাপড়াচ্ছে প্রায় ততজন মেয়েও। অর্থাৎ যত লোক ফিরে এসেছে প্রায় তত লোক ফিরে আসেনি। একজন মেয়ের কাছে তার প্রিয়জন ফিরে না আসা মানে ধরে নিতে হবে সে মারা গেছে। প্রতিটি মেয়ে, শিশু ও বৃদ্ধার ভেতর থেকে উথলে উঠছে প্রবল ভাবাবেগ–কারও ইতিবাচক, কারও নেতিবাচক।

স্থির দাঁড়িয়ে দেখছে কাউরু। পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্তে এল, একমাত্র ও-ই এখানে দর্শক বা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে সমর্থ। উপলব্ধি করল এখানে ওকে মানাচ্ছে না। একটা অস্বস্তি এসে ভর করল।

কিন্তু একমুহূর্ত পর সত্যিকার অর্থে কোন দুনিয়ার মানুষ সে, তা নিয়ে আবার মারাত্মক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো। একটা হাত খপ করে আঁকড়ে ধরল ওকে, টেনে নিল একপাশে। ও দেখল, এক তরুণী ছুটে আসছে ওর দিকে। তার ব্যগ্র দৃষ্টির সামনে ওর তাচ্ছিল্য ভরা নির্লিপ্ততা এক নিমেষে গুঁড়িয়ে গেল। দশ বছরের এক ছেলে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল। অকস্মাৎ এই ভাবাবেগের আবর্তে পড়ে কাউরু হতভম্ব।

তরুণীর মাথায় লম্বা চুল, বেণী করে পিঠে ফেলা। তার চওড়া কপাল উন্মুক্ত। চোখ দুটো বিস্ফারিত। স্তনের ওপর শিশুটি লেগে থাকা সত্ত্বেও কাউরুকে লক্ষ্য করে লাফ দিল সে।

দম বন্ধ হয়ে এল কাউরুর। তারপরও তরুণীকে গ্রহণ করল। তার প্রচণ্ড আবেগ আলিঙ্গন করতে বাধ্য করল ওকে।

BanglaBook.org

সামনের এই তরুণীর চেহারা ওর মনের কোঠায় সযত্নে রক্ষিত রাইকোর চেহারার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল। ওরা দুজন একই রকম দেখতে। চুলের দৈর্ঘ্য আলাদা, সাজানোর ভঙ্গিও আলাদা। মুখের আকৃতি এক। দুজনেরই সেই নত করা চোখ তবে এমনও হতে পারে যে কাউরু সব এভাবে দেখতে চাইছে। এটা তো মিথ্যে নয় যে মরুভূমিতে আসার পর থেকে রাইকোকে দেখার ইচ্ছেটা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

পরস্পরকে ওরা যখন জড়িয়ে ধরে আছে, দুজনের মাঝখানে চ্যাপ্টা হচ্ছে শিশুটি, কাউরুর হাত আর বাহু সরাসরি তরুণীর নিরাবরণ ত্বকের সংস্পর্শে চলে এল। তরুণীর ভাবাবেগ ওর নিজের বুকেও প্রবাহিত হচ্ছে, মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে এরকম একটা অনুভূতি হলো কাউরুর।

ও এবং এই তরুণী নিশ্চয় স্বামী-স্ত্রী। কোমর ধরে ঝুলে থাকা ছেলেটি নিশ্চয় ওর পুত্র। ওর আর তরুণীর মাঝখানে আটকা পড়ে যে শিশুটি চিৎকার করে কাঁদছে, সে নিশ্চয় ওর সদ্যোজাত কন্যা।

মনে হলো, এটা কাউরুর জানা আছে এই তরুণীর সঙ্গে বছরগুলো কীভাবে কাটিয়েছে ও। যে-সব জিনিসকে এখানে তৈরি হতে আর বড় হতে দেখেছে, সব ওর মনে ধরা দিচ্ছে। বিষণ্নতা, তবে তারচেয়ে বড়, ঘৃণা। বাবার খুনির ওপর প্রতিশোধ নেয়ার আকাঙ্ক্ষা ওর আত্মার গভীরতা ভরাট করে রেখেছে।

নতুন নতুন তথ্য আসছে ওর কাছে। অন্য এক গোত্র থেকে এই গোত্রে বাস করতে এসেছিল তরুণী। এটা তার দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম স্বামী খুন হয়েছে অনেকদূর উজানে। শুধু খুন হয়নি, একদল শ্বেতাঙ্গ সৈনিক আর গুণ্ডা তার ওপর প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে, তারপর পাথরের ওপর ফেলে রেখে গেছে মরার জন্যে।

প্রথম স্বামীর প্রতি এই নির্দয় আচরণ এখনও ভুলতে পারে না তরুণী, তার মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমে আছে।

এখন কাউরু জানে যাকে নিজের ছেলে বলে ভেবেছিল সে আসলে তরুণীর প্রথম স্বামীর সন্তান। জীবিত যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে তারা হলো শুধু ওর বৃদ্ধা মা আর নিজের সদ্যোজাত শিশুকন্যা।

কাউরুর মনে নতুন করে আবার সন্দেহ জাগল, প্রকৃত দুনিয়া ভার্চুয়াল স্পেসে ছায়া ফেলছে। এই তরুণীর সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় হুবহু রাইকোর সঙ্গে ওর সম্পর্কের মতো পার্থক্য শুধু রিয়োজি মারা গেছে। সে ফায়ার এস্কেপের জানালা দিয়ে লাফ দিয়েছে, পেছনে রেখে গেছে শুধু কংক্রিটের ওপর রক্তের দাগ। সে অপর দিকে চলে গেছে। তবে এই মুহূর্তে ওর কোমর ধরে ঝুলে থাকা ছেলেটা দুর্বল, তার ওপর আস্থা রাখা যায় না, ঠিক যেমন রিয়োজির ওপর আস্থা রাখা যেত না।

কাউরু উপলব্ধি করল ওর নিজের শরীর আর মন অপর জগতে চলে যাচ্ছে, ও

BanglaBook.org

পড়ে থাকছে মাত্র অর্ধচেতন অবস্থায়। কিছু না বুঝেই যেটাকে ও 'অপর জগৎ' ভাবছে, ওর জানা নেই কোথায় সেটার অবস্থান।

কিছুক্ষণ শান্তিময় বিরতি স্বল্প ঢালু পাহাড়ী ঢালের ওপর ফেলা তাঁবুতে বাস করে ও; ওকে ঘিরে থাকে স্ত্রী, সন্তানরা আর বৃদ্ধা মা। ওখানে ওরা কতদিন হলো একসঙ্গে আছে? মাঝে-মধ্যে কয়েক বছরও ওর কাছে মাত্র এক মুহূর্ত বলে মনে হয়, আবার কখনো একটা দিনকে একটা দিনই মনে হয়।

সময়ের বয়ে যাওয়াটা কাউরু অনুভব করতে পারে–কখনো তা বিস্তৃত, ধীরগতি; কখনো দ্রুত, চঞ্চল। ওকে মুড়ে ফেলে সময়টা ছিল দাগে ভরা, কোথাও প্রচণ্ডতার ছোপ, কোথাও দুর্বলতার ছোপ।

ওর শিশুকন্যা, প্রথম দেখেছিল যখন সদ্যোজাত, এখন একটু বড় হয়েছে ওর সৎ ছেলের মধ্যে যোদ্ধা হওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। ধনুক ব্যবহার করার সময় যেভাবে সে দাঁড়ায়, তা দেখে হাসে সবাই।

এই শরীরটার সঙ্গে কাউরু এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নদীর পাশে উবু হয়ে বসে পানিতে প্রতিফলিত যে চেহারা দেখতে পাচ্ছে সেটা নিজের পুরোনোটার চেয়ে পুরোপুরি আলাদা।

গাঢ় ত্বক, মোটা ঘাড়, আর উল্কি আঁকা বিশাল কাঁধ। এই শরীরটা ছুঁতে পারে ও, অনুভব করে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। শুধু, ওর মুখের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ঝাপসা হয়ে আছে পানির নড়াচড়ায়: ওগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না।

স্ত্রীর সঙ্গে বহুবার মিলিত হয়েছে কাউরু, প্রতিবার তার আরও কাছাকাছি হতে পেরেছে। ওর মেয়েও এখন ওর দিকে অন্য চোখে তাকায়।

ইন্ডিয়ানদের এই গোত্রটা এক জায়গায় কখনো বেশিদিন থাকে না: সব সময় চলার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয় ওরা। পুব আর দক্ষিণ থেকে ওদেরকে চাপের মধ্যে রাখে একটা গোত্র, যাদের গায়ের রঙ অন্যরকম। মাত্র একটা দিক পশ্চিম ওদের যাওয়ার জায়গা। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ওদের নেতাদের প্রখর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়, যাতে শত্রুদের সঙ্গে যথাসম্ভব কম দেখা হয়, সেই সঙ্গে নিয়মিত চলতে পারে খাবার আর পানি সংগ্রহ।

পুরো গোত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে নেতাদের একটা মাত্র ভুলে।

তারা মাত্র একটা জায়গায় পৌছুনোর লক্ষ্য স্থির করতে পারে। এই উপজাতি হোক ক্ষতবিক্ষত এবং বিভক্ত, প্রত্যেকের প্রত্যাশা একটা মাত্র বিন্দুতে স্থির: প্রাচীন কিংবদন্তি।

'অবশ্যই তোমরা বিশাল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ কিনারায় পৌছুনোর কথাটা মাথায় রাখবে, যেখানে পুব আর পশ্চিম সাগরে গিয়ে পড়া নদীগুলোর উৎসমুখ আছে।

BanglaBook.org

এমন একটা জায়গা, যেখানে আগে কেউ কখনো যায়নি। ওখানে তোমরা প্রকাণ্ড গহ্বর দেখতে পাবে, ওটার পেটে আছে লেক। ওটাই হবে এই গোত্রের অনন্তবাস। ওখানে মহান আত্মা তোমাদের ওপর দৃষ্টি রাখবেন, কেউ যাতে তোমাদের হুমকি দিতে না পারে, এবং তোমরা চিরকাল বাঁচবে।'

আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ার জন্যে ওই কিংবদন্তি ছাড়া আর কিছু নেই ওদের। এখন শুধু যদি পশ্চিমে যেতে হয় ওদেরকে, এটা স্বাভাবিক যে কিংবদন্তির ওই জায়গাটা খুঁজবে ওরা।

যদিও আকারে ছোট হয়ে গেছে, তারপরও গোত্রের লোকসংখ্যা দু শ'রও বেশি। এত মানুষকে দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। সামনের এলাকায় টহল আর পাহারা দেয়ার জন্যে আছে প্রাণচঞ্চল একদল তরুণ ঘোড়সওয়ার। ওরা যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে খবর দেবে যে সামনের পথে কোনো শত্রু নেই, শুধু তারপরই গোত্রের মূল অংশ আগে বাড়বে। শিকারিদের বিরতিহীন পাঠানো হচ্ছে যেখান থেকে পারা যায় খাবার যোগাড় করে আনতে।

রাত নামলে নিরাপদ ও সুবিধেমতো জায়গায় তাঁবু ফেলে প্রতিটি পরিবার। সবাই কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে। তাঁবুগুলোর মাঝখানে জ্বলে ওঠে ক্যাম্পফায়ার, সেটাকে ঘিরে বসে আগুনে পোড়ানো বিভিন্ন পশুর মাংস খায় সবাই, দিনের বেলা যেগুলো শিকারিরা সংগ্রহ করে এনেছে।

ওরা কখনো পেটভরে খেতে পায় না। কালেভদ্রে যদি কিছু বাঁচে, আগুনের তাপে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। তবে আজকাল কিছুই বাঁচে না।

পানির দেখা পেলে প্রথমে গোসল করে ওরা, ধোয়াধুয়ির কাজ সারে, তারপর খাওয়ার উপযোগী পরিষ্কার পানির খোঁজে উজানের দিকে এগোয়। ওদের বেঁচে থাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তই হলো পানি যে সেটা প্রথম দেখতে পায়, অকুণ্ঠচিত্তে সবাই তাকে ধন্যবাদ জানায়।

এখন ওরা যেখানে এসে থেমেছে, এখান থেকে আর মাত্র দুটো পাহাড়চূড়া পার হলেই পৌঁছে যাওয়ার কথা কিংবদন্তিতে বর্ণনা করা সেই আশ্চর্য জায়গায়। যেখানে নাকি ওদের অনন্তবাস নিশ্চিত।

বলা যায় গন্তব্য একরকম দেখাই যাচ্ছে, কাজেই আজকের মতো এই বনভূমিতেই তাঁবু ফেলল ওরা, অতিরিক্ত হিসেবে জমিয়ে রাখা শক্তি আর সাহস গুছিয়ে নিচ্ছে। ধরে নেয়া হলো ভাগ্যও প্রসন্ন, কারণ কাছেই পাওয়া গেল সুপেয় পানি

ঝরনাটা খুঁজে পেল বাচ্চারা। বলা হলো, ওদের কয়েকজন মিলে গাছপালার চারপাশে ছুটোছুটি করে খেলছিল, এই সময় দেখতে পেল কিছু গাছের আড়ালে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে খানিকটা পাথর, সেটার গায়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানির সরু একটা ধারা।

BanglaBook.org

খবরটা পরস্পরকে জানাল ওরা। কাছাকাছি থাকা বড়রাও ঝরনা পাওয়া গেছে শুনে পাত্র হাতে উঠে গেল সেদিকে।

এখানে ওখানে দাঁড়াল ওরা, সতর্ক চোখে চারপাশে তাকাল

পাহাড়ী ঢাল বেয়ে যারা উঠছে তারা কজন গুণল কাউরু

তিনজন ওর সামনে, চারজন পেছনে, সব মিলিয়ে ওকে নিয়ে আটজন; পেছনের চারজন সবাই নারী, ওর স্ত্রী আর কন্যাও আছে তাদের মধ্যে। সামনের তিনজন প্রত্যেকে বাচ্চা, তাদের সঙ্গে ওর ছেলেও আছে, হঠাৎ করে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। শুধু ওর মা অনুপস্থিত তিনি আছেন মূল দলের সঙ্গে নীচের বনভূমিতে

যে বাচ্চাটা বলেছিল ঝরনাটা সে-ই প্রথম দেখেছে, সত্যি কথাই বলেছিল। ওই যে ওদিকে, পাহাড়ের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা বোল্ডারের ওপরটা পানিতে ভেসে যাচ্ছে। তবে ধারাটা খুবই ক্ষীণ।

নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিল ওরা। কেউ বলছে ঢালের আরও ওপর দিকে উঠে খুঁজে দেখা দরকার, পানির আরও বড় কোনো উৎসমুখ পাওয়া যেতে পারে। পানি যখন আছে এখানে, তার একাধিক বেরোবার মুখ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু অনেকে এই পানিতেই খুশি।

তুমুল কথা কাটাকাটি চলছে, কেউ গোঁ ছাড়তে রাজি নয়, এই সময় ওদের পেছনের ঝোপ খস খস করে উঠল।

একেবারে আচমকা যে লোকগুলো হাজির হলো তারা দেখতে অন্যরকম। অনেকের পরনে কোঁচকানো নীল ইউনিফর্ম। কিছু পরেছে সাদা শার্ট, কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধা ছেঁড়া জ্যাকেট। কিছু পরেছে কালো শার্ট, চামড়ার তৈরি ট্রাউজার।

দ্রুত গুণে কাউরু দেখল তারা বারোজনের বেশি হবে তো কম নয় তবে মোটেও সুশৃংখল একটা দল নয়। কয়েকজনের হাতে পাত্র দেখা যাচ্ছে, সন্দেহ নেই তারাও পানির খোঁজে আছে। বাকি সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। কয়েকটা সাদা শার্টে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে।

আগন্তুকদের মধ্যে ফিসফিস গুঞ্জন উঠল। উত্তেজনায় টান টান পরিবেশ। কি করতে হবে তা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। সঙ্গে নারী আর শিশুরা থাকায় যুদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। আগন্তুকরা যদি লড়াই চায়, কাউরুর দলের ছুটে পালানো ছাড়া উপায় নেই। তবে হঠাৎ নড়াচড়া না করাটা জরুরি, কারণ লোকগুলো উদ্দেশ্য খারাপ কিছু নাও হতে পারে।

নবাগতরা আলাপ করছে, দৃষ্টি বিনিময় করছে, কিন্তু তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না কাউরু। সময় সম্পর্কে ওর অনুভূতি আবার সব এলোমেলো হয়ে গেছে। নতুন লোকগুলো আসার পর মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ড পার হয়েছে, অথচ ওর অনুভূতি বলছে গত হয়েছে বেশ কয়েকটা মিনিট।

BanglaBook.org

অকস্মাৎ বাচ্চা তিনটে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল, কিছুটা ছুটছে কিছুটা গড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। ওদের পিঠ লক্ষ্য করে রাইফেল তোলা হলো, তবে অন্যেরা একপাশে সরিয়ে দিল সেগুলো, এবং যেন নীরব কোনো ইঙ্গিত পেয়ে বাচ্চাদের ঘিরে ফেলল তারা, যাতে পালাতে না পারে।

লোকগুলো গোলাগুলি চাইছে না। গুলির শব্দ নীচের মূল দলের কানে পৌঁছুবে, তা পৌঁছুলে এদেরও বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তারা সম্ভবত কাউরুর দলের প্রত্যেককে চুপ করিয়ে দিতে চায়।

এই উপসংহারে পৌঁছে স্ত্রীর দিকে ফিরতে গেল কাউরু। আর তখনই চোখে পড়ল একটা পাথরের আঘাতে ওর ছেলের মাথার খুলি দু'ভাগ হয়ে খুলে গেল, কয়েকজন লোক ওকে মাটির সঙ্গে চেপে ধরে আছে।

বলিষ্ঠ হাত দিয়ে শক্ত করে মুখ চেপে ধরা হয়েছে, ফলে বাচ্চারা কেউ চিৎকার করতে পারছে না, তাদের মগজ ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারদিকের জমিনে। খয়েরি পাথরের ওপর টকটকে লাল রক্ত যেন কমপিউটারের পরদায় ফোটানো গোলাপ। কাউরু শুনতে পেল ওর পেছনে পাথরে সবুট লাথি মারছে লোকগুলো।

গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল কাউরু। ওখানকার মাংস বা তন্তু যদি নাও ছিঁড়ে থাকে, হাড়টা বোধহয় গুঁড়িয়ে গেছে। ভারসাম্য ধরে রাখতে পারল না, ছিটকে পড়ল বোল্ডারের ওপর। পড়ার সময় শরীরটাকে মোচড়াল, ফলে পাথরটার ওপর পাঁজর দিয়ে পড়ল, কিন্তু এখন আর কোনো ব্যথা অনুভব করছে না।

হাত বাড়াল কাউরু, স্ত্রীকে ছুঁতে চাইছে। কিন্তু তা পারার আগেই দেখল শত্রুরা মেয়েদেরকে তুলে ঝোপের দিকে ছুঁড়ছে।

সমস্ত শক্তি এক করে নিজেকে দাঁড় করাতে চাইছে কাউরু, কিন্তু শত্রুরা ধরে রাখল ওকে। এমনকি ওর চুল ধরে পাথরের সঙ্গে চেপে রাখা হলো মাথাটা, যাতে নড়াচড়া করতে না পারে।

ওর মাথার পাশে কি যেন একটা ভাঙার ভোঁতা আওয়াজ পেল কাউরু। জানে তাকানো উচিত হবে না, তারপরও চোখের মণি এক কোনে সরে এল, মাংস ছেঁড়ার শব্দ অনুসরণ করে।

কাউরু দেখল ওর প্রিয় শিশুকন্যার ছোট্ট শরীর, যাকে সে রোজ সারাদিন কত আদর করেছে, একজন মানুষের মাথা সমান উঁচু থেকে ছুঁড়ে মারা হলো একটা পাষাণ পাথরের ওপর।

ওর সমস্ত চিন্তা দখল করে নিল মরতে বসা মেয়েটা, কিন্তু শরীর ওর একটা নির্দেশও মানছে না। সর্বাঙ্গ পুড়ে যাওয়ার যে অনুভূতিটা হচ্ছে সেটাকে ব্যথা বলা যায় না। শরীরের কত জায়গায় আঘাত পেয়েছে সেটা জানাও সম্ভব নয়। ব্যথা এখন প্রসঙ্গ নয়। কাউরু মরতে রাজি আছে, এই পর্যায়ে ভয় এমন একটা বিলাসিতা যা ওর সামর্থ্যের বাইরে। যেটা সহ্য করার মতো নয় বলে মনে হচ্ছে,

BanglaBook.org

ওর যারা প্রিয়জন তাদের কপালে জুটল এই ভয়াবহ পরিণতি, আগে আন্দাজ করতে না পারা তাদের এই বিলুপ্তি।

কাউরু দেখল আবার ওর শিশুকন্যাকে একই রকম উঁচুতে তুলে আছাড় মারা হলো মাটির ওপর। নিশ্চয় ইতিমধ্যে মারা গেছে সে নেতিয়ে পড়া প্রাণহীন দেহটা ছড়ানো পাথরের মাঝখানে ফেলে রাখা হলো।

ওর মেয়েকে যে লোকটা মাথার ওপর তুলে আছাড় মারছিল, বোধহয় এরচেয়েও মজার কিছু খুঁজে পেয়েছে সে, তা না হলে হঠাৎ করে ঘাস মাড়িয়ে গাছপালার দিকে যেত না।

দৃষ্টি দিয়ে লোকটার অলস হাঁটা অনুসরণ করতে পারছে কাউরু। হাঁটতে হাঁটতে লোকটা তার শার্টের কিনারায়, যে অংশটা তার ট্রাউজারের ওপর ঝুলছে, হাতের উল্টোদিক ঘষল। কী করছে সে?

তার গায়ের শার্টটা একসময় সাদা ছিল, এখন ছোপ ছোপ রক্ত লেগে রয়েছে। শুধু রক্ত নয়, তার কাপড়ে খুদে মাংসের কণাও আটকে রয়েছে। ওগুলো কি ওর মেয়ের রক্ত, ওর মেয়ের মাংস?

লোকটা এমনভাবে তার শার্টে হাত দুটো ঘষছে, যেন নোংরা কিছু ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। অবশেষে সে তার হাতের উল্টো পিঠে থুথু ছিটিয়ে নিয়ে ট্রাউজারে জোরে জোরে ঘষতে লাগল।

স্ত্রীর অস্পষ্ট গলা শুনতে পাচ্ছে কাউরু। বুঝতে পারছে কাছাকাছি কোথাও আছে সে। কিন্তু চোখ দুটো যতটুকুই ঘোরাক, কোনোভাবে দেখতে পাচ্ছে না তাকে। সম্ভবত কোনো ঝোপের ভেতর আটকে আছে আহত শরীরটা। কাউরু শুধু দেখতে পাচ্ছে লোকগুলো এক হাঁটু গেড়ে, কাকে যেন ঘিরে রেখেছে।

ওর চুল ধরা হাতের মুঠো শক্ত হলো, আরও জোরে পেছন দিকে চেপে ধরল মাথাটাকে, ফলে ওর গলা মধ্যগগনে উঠে আসা সূর্যের দিকে পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।

আলোর আরও একটা তীক্ষ্ণ ঝলক দেখতে পেল কাউরু, সেটা রোদ নয়। এই আলোটা ক্ষিপ্রবেগে ডান থেকে বাম দিকে সরে গেল।

কাউরুর গলা থেকে ঘরঘরে আওয়াজ বেরোচ্ছে, তারপর শিস বাজানোর মতো শব্দ শোনা গেল। বুকের ওপর তপ্ত তারল্য অনুভব করল কাউরু। ওর মাথাটা মনে হলো যেন আরও পিছিয়ে গেছে।

রোদের রঙবদলের সঙ্গে উত্তাপ ক্রমশ আরও বাড়ছে, তারপর সবকিছু একসময় একরঙা হয়ে উঠল। লাল সূর্য ধীরে ধীরে কালো হয়ে গেল। বাড়তে থাকল অন্ধকার। ওর বাকি সমস্ত ইন্দ্রিয় অচল হয়ে পড়েছে, এখনও কাজ করছে শুধু ওর শ্রবণশক্তি

কাউরু ওর স্ত্রীর চিৎকার শুনতে পাচ্ছে সেটা যত না যন্ত্রণাকাতর কান্নার

BanglaBook.org

মতো লাগল কানে, তারচেয়ে বেশি মনে হলো দুর্বল হাসি। সচেতনতা হারানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার কণ্ঠস্বর ধরে রাখল ওর কান। যে মেয়েলোকের সঙ্গে নিজের দীর্ঘ একটা সময় কাটিয়েছে ও, অন্তত এই দুনিয়ায়।

ওর মৃত্যু, এবং ওর প্রিয়জনদের মৃত্যু, সব একই সময় ঘটেছে।

ছয়

চেয়ারে কিছুক্ষণ নেতিয়ে থাকল কাউরু, অন্ধকারে ডুবে আছে। হঠাৎ কেউ দেখলে ভাববে স্রেফ ক্লান্ত একজন মানুষ। কিন্তু কাউরু যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এসেছে সেটা সাক্ষাৎ মৃত্যু: ওর শরীর এখন ওর আত্মার খালি খোলস মাত্র।

মৃত্যু ঘটার মুহূর্তটিতে ওর যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা চেতনা হারানোর মতো নয়। একজন মানুষ যখন জ্ঞান হারায়, তার মস্তিষ্ক তখনও কাজ করতে থাকে। পলকের জন্যে কাউরু যেটা জানতে পেরেছে, তা হলো—ওর হৃৎপিণ্ড থেমে গেল, এবং সময় আর বিস্তৃতির [স্পেস] কোমল অনুভূতি মিটমিট করতে করতে ফুরিয়ে গেল ওর মগজের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে।

অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে আসা একটা গলা শুনতে পাচ্ছে কাউরু।

'জাগুন। আপনার জাগার সময় হয়েছে।'

একটা পুরুষকণ্ঠ, ভরাট, তবে লাগাম টানা।

'এদিকে আসুন,' প্রতিধ্বনি সহ হারিয়ে যাওয়ার আগে হুকুম করল অচেনা কণ্ঠস্বর।

কেঁপে উঠল কাউরু, তারপর ছোট্ট লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল। মুখ খুলে বাতাস টানল ও, নিজের অজান্তেই ওপর দিকে বিস্তৃত হলো শরীরটা। যেন পানিতে ডোবা মানুষ, বাতাসের অভাবে ছটফট করছে, মাথা তোলার চেষ্টা করছে পানির ওপর।

টান দিয়ে মাথা থেকে হেলমেট ডিসপ্লে খুলে ডেস্কের দিকে ছুঁড়ে দিল কাউরু। ডেটা গ্লাভও খুলল, ছুঁড়ে দিল ওটার দিকে।

অনুভূতি হলো, ওর হৃৎপিণ্ড ধরে কেউ যেন পিষছে। আবার চেয়ারটায় বসে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল। সত্যিকার একটা আবহাওয়ার সঙ্গে যতই নিজেকে পুনর্বাসিত করতে চাইছে শরীর, ততই দ্রুত হচ্ছে ওর হৃদ্‌স্পন্দন। স্মৃতিগুলো এখনও তাজা আর পরিষ্কার।

কাউরু বুঝতে পারছে ওর চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। অব্যক্ত আবেগ, না ঠিক বিষণ্নতা, না ঠিক বেদনা, প্রবল স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে মনের ভেতরে।

ডেস্কে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদছে কাউরু। ওসব সত্যি ছিল না বলেও শান্ত করা

BanglaBook.org

যাচ্ছে না ওর বিশৃংখল অনুভূতিকে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে, হিসেব কষে বের করল মাত্র দেড় ঘণ্টা হেলমেটের ভেতর ছিল ও, কিন্তু তাতেও শান্তি বা স্বস্তি ফিরল না। যখন এক মিনিট এক বছরের সমান হয়ে যায়, সময়ের ওজন তখন খুব ভারি হয়ে ওঠে।

এইমাত্র যে ভার্চুয়াল রিয়্যালেটির অভিজ্ঞতা হলো সেটা কার বা কীভাবে তৈরি তা কাউরুর জানা নেই, তবে ওর অনুভূতি বলছে অপর ওই দুনিয়ায় পুরো একটা জীবন বেঁচেছিল সে।

কাউরু তার মেয়েমানুষকে ভালোবেসেছে, তার একটা সন্তান হয়েছে, নিজ গোত্রের জন্যে যুদ্ধ করেছে সে, নেতারা সবাই তাকে খুব পছন্দ করত, এবং অবশেষে মারা গেছে সে–সবই ওই অপর দুনিয়ায়।

নিজে যখন মারা যায়, সেই মুহূর্তে প্রিয়জনদেরও হারিয়েছে–ওরা ছুঁতে পারার মতো নাগালে ছিল, শুধু যদি হাত বাড়াতে পারত কাউরু। কিন্তু ওদেরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

'লেইচি!' ডাকল কাউরু এটা একটা নাম, ওর স্ত্রীর নাম, এই নামে কতবার ওকে ডেকেছে সে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মনে পড়ল নদীর তীরে পরস্পরের গা ধুইয়ে দিয়েছে তারা, ত্বক স্পর্শ করার অনুভূতিটা এখনও তাজা। নীরব হাসি আর প্রেম থাকত ওদের মুখে।

'কচিজ!' এটা ছিল ওর মেয়ের নাম। সে ভালো করে হাঁটতে শেখার আগে তাকে বুকে কিংবা পিঠে নিয়ে কতগুলো পাহাড়চূড়া পার হয়েছে কাউরু? ছোট্ট কচিজ তার বাবার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ার আগে গুণ গুণ করে পাহাড়ী ফড়িং আর প্রজাপতির গান গাইত।

ওদের নাম মনে করতে পারে কাউরু, কিন্তু নিজের নামের বেলা ওর স্মৃতি খুবই অস্পষ্ট। স্মৃতি থেকে মুছে গেছে ওর মৃত্যুযন্ত্রণাও। মনে আছে শুধু প্রিয়জনদের কথা, সে-সব ওকে খুব কষ্ট দেয়।

দাঁড়াবার সময় একটু টলে উঠল কাউরু। এগিয়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল দেয়ালে। ব্যথাটা সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। এই আত্মপীড়ন দরকার ছিল ওর, হৃদয়ের বেদনা ভোলার জন্যে।

ব্যাপারটা কি বোঝার জন্যে আমাকে সব বিশ্লেষণ করতে হবে, নিজেকে বলল কাউরু, আশা করল যুক্তি ওকে বিষণ্নতা থেকে মুক্ত করবে। ওর আর মন খারাপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছে কাউরু সেটা মুভি দেখার মতো নয়। একমাত্র যে উপায়ে নিজেকে ওটার বর্ণনা দিতে পারা যায়, সেটা হলো: শরীরসহ ওকে একটা ভার্চুয়াল স্পেসে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর ওই ভার্চুয়াল স্পেস হুবহু পুনরুৎপাদন করেছিল বাস্তবতা– রিয়্যালেটি। কীভাবে সেটা সম্ভব হয়েছিল?

BanglaBook.org

প্রশ্নগুলো মাত্র আসতে শুরু করেছে।

লূপ।

প্রথম যে আইডিয়াটা ওর মাথায় এল, এই ভার্চুয়াল স্পেস সম্ভবত কৃত্রিম প্রাণ প্রকল্পের [আর্টিফিশাল লাইফ প্রজেক্ট] একটা অংশ।

কাউরু জানে লূপের যে ইতিহাস, তা পৃথিবীর ইতিহাসেরই প্রতিরূপ, তো লূপের সেই ইতিহাসের যে কোনো মুহূর্তে ওর উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব শুধুমাত্র মাথায় একটা হেলমেট ডিসপ্লে পরে এবং সময় আর বিস্তৃতির কোঅর্ডিনেটস সেট করে।

লূপের ভেতর যে লাইফ ফর্ম আছে তাদের কাছে আপনি ঈশ্বর হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন, তাদের আপনি দেখতে পারেন ওপর থেকে; কিংবা আপনি চাইলে বিশেষ একজনের দৃষ্টি আর শ্রবণশক্তি ব্যবহার করে একটা ভার্চুয়াল জীবনযাপনও করতে পারেন।

লূপ লাইফ ফর্মের জন্ম-নকশা থেকে শুরু করে ইতিহাস পর্যন্ত সবই হলোগ্রাফিক মেমোরির একটা প্রকাণ্ড স্টোরে সেভ করা আছে।

সেজন্যেই কাউরু অনুমান করছে, যে-পৃথিবী থেকে এইমাত্র ঘুরে এল ও, লূপের একটা অংশ সেটা। ওর অভিজ্ঞতা ছিল একটা 'ফিজিক্যাল এক্সপ্রেশন', কমপিউটার গ্র্যাফিক্স থেকে হাজার বছর পেছনের একটা ব্যাপার, এবং ওর এই অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র প্রোগ্রামটার আদি আরএনএ [RNA] লাইফ ফর্ম থেকে বেরিয়ে আসা অস্তিত্ব লূপ ধারণ করে বলে।

শরীরগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করেছে, তারপর ওখানে সে ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পেয়েছে, এসব সত্যি, বানানো বা কৃত্রিম নয়। সে-সব কথা চিন্তা করা মাত্র ঝড় বয়ে যাচ্ছে কাউরুর মনে।

ভার্চুয়াল জগতে যে মৃত্যু এবং বিদায় পর্বের ভেতর দিয়ে ওকে যেতে হয়েছে, সে-সব ওর বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করছে। আর কোনো প্রিয়জনকে ওর হারাতে হবে না। বাস্তব দুনিয়ায় আর কি ধরনের বিদায় পর্ব আছে যা এরচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে?

ওই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দ্বিতীয়বার আর যেতে চায় না কাউরু। ওকে স্রেফ এমএইচসি-র ধাঁধার তালা খুলতে হবে। ওটাকে পাঠ এবং বিশ্লেষণ করার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

লূপের ভেতর যে ক্যানসারাজেইশন শুরু হয়েছে সেটা পৃথিবীকেও প্রভাবিত করছে।

এটা কাউরু এখন আগের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে। ভার্চুয়াল দুনিয়ার এক কোনে শুধু একটু তাকাতেই ওর সমস্ত ভাবাবেগ ভেঙে পড়েছিল। ভার্চুয়াল দুনিয়া প্রভাবিত করছে ওকে: তাহলে এতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে যে সারা দুনিয়াকেই

BanglaBook.org

প্রভাবিত করছে সেটা?

এই কামরাটার তাৎপর্য কী?

কেউ একজন আগাম বুঝতে পেরেছিল কাউরু এখানে আসছে, সে-ই এই জটিল সিস্টেম রেখে গেছে ওকে স্বাগত জানাতে; ওর ধারণা তিনি অবশ্যই রথম্যান। কিন্তু আন্দাজ করতে পারছে না কেন।

তবে কারণ একটা থাকতেই হবে। পথ দেখিয়ে ওকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, এই অনুভূতিটা কাউরু ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছে না। আর সত্যি যদি তা নিয়ে আসা হয়ে থাকে, পরবর্তী কি নির্দেশ আসে দেখার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

ওটা হয়তো আমাকে দেখাচ্ছিল কোথায় আমার যাওয়া উচিত।

ওর মা আদি উত্তর আমেরিকার একটা লোককাহিনি শুনিয়েছেন ওকে—একজন যোদ্ধা তার গোত্রের লোকজনকে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভার্চুয়াল জগতের যে গোত্র থেকে কাউরু এসেছে তারাও বিশ্বাস করত যে রকি পর্বতমালার দক্ষিণ প্রান্তে একটা জায়গা আছে যেখানে মহান আত্মার অধীনে তাদের অনন্তবাস নিশ্চিত, এবং সেই বিশ্বাসই তাদেরকে পশ্চিমে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। যে দুর্গম পথ তারা অনুসরণ করেছিল, কাউরুর মগজে এখনও তা খোদাই করা আছে।

গন্তব্যে পৌঁছুতে আর যখন মাত্র দুটো পাহাড়চূড়া টপকানো বাকি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যু এসে হানা দেয় তাদের ওপর, তবে ওই পর্যন্ত পুরোটা রাস্তা পরিষ্কার মনে করতে পারছে কাউরু।

হঠাৎ কাউরু উপলব্ধি করল কি করতে হবে ওকে। *ওই গোত্র যেদিকে গিয়েছিল আমাকেও সেদিকে যেতে বলা হচ্ছে।*

তবে তার আগে একটা কাজ করা দরকার

প্রফেসর অ্যামানো জাপানে আছেন, তাঁর সঙ্গে ওর যোগাযোগ করতে হবে।

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সেই মুহূর্তে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অ্যামানোর কমপিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত হলো কাউরু, তারপর মাত্র একটা অনুরোধ করল তাঁকে: *আর্টিফিশাল লাইফ ফর্ম টাকাইয়ামা আর আসাকাওয়ার ছবি পাঠান—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।*

এই অনুরোধ আগেও একবার করা হয়েছে প্রফেসর অ্যামানোকে, কাউরু জাপান ছাড়ার আগে

লূপ কাজ করে হুবহু বাস্তব দুনিয়ার ক্রমবিন্যাস [scale] ধরে। সহস্র কোটি বুদ্ধিমান প্রাণীসত্তা জীবনযাপন করছে, তৈরি করছে নিজেদের জাতিগত ইতিহাস। কি বিপুল পরিমাণ মেমোরি প্রয়োজন হয়েছে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরতে থাকে! এতকিছুর মাঝখানে, প্রফেসর অ্যামানো ঠিক সেই মুহূর্তটিকে ধরতে চেষ্টা করেছেন

BanglaBook.org

যখন বাস্তব দুনিয়ার ক্যানসারাইজেশন শুরু হলো। মোটেও ছোট কোনো বিষয় নয়।

তবে অ্যামানো যদি ওই সিকোয়েন্স আলাদা করতে সফল হয়ে থাকেন, হেলমেট ডিসপ্লে আর ডেটা গ্লাভ ব্যবহার করে কাউরু তাহলে সত্যিকার সময়ে একটা তদন্ত চালাতে পারবে। লূপে প্রথমে কাউকে ধরবে ও, সূত্র খুঁজে বের করবে ক্যানসার কেন শুরু হয়েছিল। কে বলতে পারে? হয়তো এই তথ্যটাই ওর জন্যে সব কিছু খুলে দেবে।

প্রফেসর অ্যামানোর সাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে কাউরু, অদম্য ইচ্ছে জাগল, রাইকোর গলাটা একবার যদি শুনতে পেত!

কটা বাজে এখন জাপানে? সময়ের সাত ঘণ্টা পার্থক্য থাকায় ওখানে এখন সকাল নটা। রাইকোর কি ঘুম ভেঙেছে? ভার্চুয়াল জগতে ভালোবাসত এমন কাউকে হারানোর কঠিন অভিজ্ঞতার পর, রাইকোর খুব কাছাকাছি হওয়ার প্রবল একটা আকাঙ্ক্ষা জাগছে কাউরুর মনে।

অন্তত যদি জানা যেত কেমন আছে সে।

নিজের স্যাটালাইট ফোনে ডায়াল শুরু করল কাউরু।

সাতবার রিং হওয়ার পর ঘুম জড়ানো গলায় সাড়া দিল কেউ।

'হ্যালো?'

কাজেই প্রমাণিত হলো বাস্তব দুনিয়া ঠিকই তার জায়গা মতো আছে। শুধু রাইকোর 'হ্যালো' উচ্চারণ অবর্ণনীয় স্বস্তি এনে দিল ওকে। বিপজ্জনক জলাভূমি থেকে শক্ত ডাঙায় ফিরতে পারার মতো।

'আমি।'

খানিক বিরতি, ধাতস্থ হতে সময় নিচ্ছে রাইকো। আবার যখন মুখ খুলল, কণ্ঠস্বরে একটুও জড়ানো ভাব নেই।

'সত্যিই কি তুমি? এই, কোথায়? কেমন আছ তুমি?' গুলির মতো একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়ছে রাইকো–কাউরুকে নিয়ে তার সমস্ত উদ্বেগ হঠাৎ মাথাচাড়া দিচ্ছে। শুনে কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল কাউরুর অন্তর।

এক এক করে তার প্রশ্নের উত্তর দিল কাউরু। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, শোনো। আমি চাই তুমি শান্ত থাক, এবং স্রেফ অপেক্ষা করো আমার জন্যে।'

কথা আর বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল কাউরু। বিরতিহীন বকবক করার কোনো মানে হয় না!

প্রফেসর অ্যামানো কখন সাড়া দেবেন কে জানে, কাউরু ভাবল অপেক্ষার সময়টা একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

কাউরুর বিশ্বাস, দুনিয়ায় একমাত্র ওরই সন্দেহ হয়েছে লূপ আর ক্যানসার

BanglaBook.org

ভাইরাসের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এটা অবশ্যই সম্ভব যে অন্য কেউও এই একই উপসংহারে অন্য কোনোভাবে পৌঁছুতে পারে, তবে সে-সম্পর্কে কোনো তথ্য ওর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

তবে, তাছাড়া, ব্যাপারটা যদি প্রফেসর অ্যামানোর চোখে ধরা না পড়ে থাকে–লূপ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল যাঁর ওপর–তাহলে কাউরু ধরে নিতে পারে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখছে এটাকে।

ওর ভেতর এরকম একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের নির্দেশনা মেনে চললে এমন সব বিষয়ের ওপর আলো ফেলতে পারবে সে, যেগুলো আগে কেউ খেয়াল করেনি। ওর কোনো সন্দেহ নেই যে লূপের থেমে যাওয়ার কারণটা বহুবার তদন্ত করে দেখা হয়েছে, তবে সে-সব বিশ বছর আগে–এমএইচসি-র আগে।

সম্পূর্ণ ক্যানসারে পরিণত হয় লূপ। তারপর খুব একটা সময় নেয়নি, মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস পৃথককরণ চাক্ষুষ করল বাস্তব দুনিয়া, যেটা এখন মানবেতর জগতেও সংক্রমিত হচ্ছে। দেখে অবশ্যই মনে হচ্ছে লূপ থেকেই ছড়িয়েছে ওটা।

তারপর আছে বিস্ময়কর সেই কোইন্সিডেন্স, নটা জিন, যেগুলো এমএইচসি ভাইরাস তৈরি করেছে, সবগুলোর বেইস টোটাল এসেছে $2n \times 3$। এ থেকে কাউরু ধারণা করছে যে ভাইরাসটার উৎস হতে পারে একটা কমপিউটার–এমন কিছু, যেটা বাইনারি কোডে চিন্তা করতে পারে।

ঘুমে চোখ দুটো বুজে আসছে, এই সময় কমপিউটার জ্যান্ত হয়ে উঠল। ডেস্কের সামনে গিয়ে বসল কাউরু। যা ভেবেছে, প্রফেসর অ্যামানো জবাব পাঠিয়েছেন। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ধাপ অনুসরণ করতে হবে ওকে।

নির্দেশনা মেনে কয়েকটা বোতামে চাপ দিল কাউরু। তারপর ব্যাপারটা সহজ, এই কমপিউটারকে লূপ মেমোরির প্রাসঙ্গিক অংশের অ্যাকসেস পাইয়ে দেয়া।

অ্যাকসেস কমপ্লিট।

হেলমেট ডিসপ্লে আর ডেটা গ্লাভ পরল কাউরু, এখন জানে কী মানে এটার।

ঘটনাপঞ্জি কাউরু যেটা পাঠিয়েছিল, সেটার শুরু ১৯৯০ সালের গ্রীষ্ম, লূপ সময়, নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির দ্বারা যা কিছু শোনা এবং দেখা হয়েছে তার সমস্ত কিছু কাভার করবে।

চাক্ষুষ করার জন্যে সব কিছু রাখা আছে। কাউরু যদি উল্লেখ করে, ধরা যাক একটা সময় হিসেবে 1990/10/04/14:39, এবং একটা জায়গা হিসেবে 35.41°N/139.46°E, তাহলে ওই মুহূর্তে ওখানে যা কিছু ঘটবে সব দেখতে পাবে ও। একই জায়গায় বসে থেকে, শুধু টাইম কোঅর্ডিনেটস বাড়িয়ে দিয়ে, ঘটনাপঞ্জি উন্মোচিত হতে শুরু করবে ডিসপ্লেতে। আরও নির্ভুলভাবে লোকেশন

BanglaBook.org

ফিক্স করার জন্যে একটা জুম ফাংশনও আছে।

ইচ্ছে করলে কাউরু একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারে। ও এভাবে উল্লেখ করতে পারে, ধরা যাক–গানজা ডিস্ট্রিক্টের চার নম্বর পাড়া, ব্যস, তাহলেই ওই জায়গার যেকোনো যুগের যেকোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হবে ও।

সম্ভাব্য যেকোনো দিকে তাকানোর সক্ষমতা আছে পর্যবেক্ষকের, রাস্তায় থাকা লোকজনের দিকে তাকাতে পারে, একটা ভুতের মতো যা খুশি দেখতে পারে। লূপের অধিবাসীরা পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকবে না, কিন্তু পর্যবেক্ষক অদৃশ্য মানব হিসেবে তাদের মাঝখানে দিব্যি ঘুরে বেড়াতে পারবে।

আবার, পর্যবেক্ষক মাত্র একজনের ওপরও মনোযোগ আরোপ করতে পারে। এতে সে তার নিজের বোধ আর অনুভূতি ভার্চুয়াল জগতে ওর পছন্দ করা চরিত্রের সঙ্গে এক করে ফেলার সুযোগ পাবে।

কাউরু এখন যেটা পেয়েছে তা হলো, ওর মগজে কয়েক ব্যক্তির মেমোরি ছাপা বা আঁকা হয়ে গেছে। লূপে কীভাবে ক্যানসারাইজেশন শুরু হলো সেটা পর্যবেক্ষণ করতে চাইছে ও, এমন একজনের অবস্থান থেকে যে এটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ঠিক যেভাবে একজন আদি উত্তর আমেরিকানের গোটা জীবন কাটিয়েছে ও, মাত্র কয়েক মিনিট সময়সীমার ভেতর।

ওর হাতে কয়েক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা রয়েছে; শুরু হয়েছে যাকে দিয়ে, তাকে সবাই টাকাইয়ামা নামে চেনে।

তাহলে ঠিক কী ধরনের জীবন কাটায় এই টাকাইয়ামা? কাউরু কৌতূহলী, তবে কৌতূহলকে ছাড়িয়ে গেল ওর ভয়। কে জানে, আরও অসহনীয়, হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হতে পারে ওকে।

তবে ইতস্তত করলে শুধু সাহসই হারাতে হবে। প্রোগ্রামটা এবার শুরু করতে যাচ্ছে কাউরু।

স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে, লূপে ঢুকে পড়ল।

মনে হলো শহরের মাঝামাঝি কোথাও একটা কফি শপে রয়েছে কাউরু। জানালার বাইরে নিওন সাইনের অবিরাম ঝলকানি, উজ্জ্বল রঙের কয়েকটা টানেল ঢুকে পড়েছে দোকানের ভেতরে। টাকাইয়ামা, যে লোকের ওপর ভর করেছে কাউরু, একটা টেবিলে এক লোকের মুখোমুখি বসে আছে। অপর লোকটা আসাকাওয়া নামে পরিচিত, টাকাইয়ামার বন্ধু।

গাল বসে গেছে, চোখ দুটো গর্তের ভেতর ঢোকা, হাড্ডিসার হাভাতে চেহারা, সব মিলিয়ে ভুতের মতো দেখতে আসাকাওয়া; তার ওপর চোখ বুলিয়ে করুণা জাগল কাউরুর মনে।

তবে এরকম বিধ্বস্তই দেখানোর কথা আসাকাওয়াকে: কাল রাতে এমন

BanglaBook.org

ভয়ানক একটা ভিডিওটেপ দেখেছে সে, এরকম আগে কখনও দেখেনি। যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সে পড়েছে তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে কারও সাহায্য দরকার তার, তাই টাকাইয়ামাকে বেছে নিয়েছে। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইবে বলে এখানে, এই কফি শপে তাকে আসতে বলেছে সে।

গ্লাসে রাখা বরফ থেকে একটা টুকরো নিয়ে মুখে ফেলল টাকাইয়ামা, দাঁত দিয়ে মুট মুট করে ভাঙছে। ওই ঠাণ্ডা ভাব কাউরুর মুখের ভেতরও ছড়াল।

সন্ত্রস্ত আর নার্ভাস দেখাচ্ছে আসাকাওয়াকে। গল্পটা বলার সময় ভুলভাল করে ফেলছে। তার বক্তব্য নিজের মতো করে বুঝে নিতে বাধ্য হচ্ছে টাকাইয়ামা।

আসাকাওয়ার সমস্ত সংকটের উৎস হলো একজন বকবক করা ট্যাক্সি ড্রাইভার, যার ট্যাক্সিতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিল সে। কোনো এক রাস্তার মোড়ে একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছে ড্রাইভার, সেটার কথাই আসাকাওয়াকে বলছিল সে।

ট্র্যাফিক সিগনাল দেখে থেমেছে ট্যাক্সি ড্রাইভার, ওই সময় তার পাশের একটা মোটরসাইকেল কাত হয়ে পড়ে গেল। ওটার কিশোর সওয়ার ওখানেই মারা গেল, যেন মনে হলো হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায়।

মজা করে, হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়তে পড়তে, ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিল ড্রাইভার, নকল করে দেখাচ্ছিল মোটরসাইকেলের আরোহী কীভাবে হাত-পা ছুঁড়ছিল, কীভাবে তার গোটা শরীর মোচড় খাচ্ছিল, মাথা থেকে হেলমেট খুলতে কি প্রাণান্ত কর চেষ্টা করছিল।

এসব অপ্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার ফল হলো, আসাকাওয়ার জীবন চিরকালের জন্যে বদলে গেছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের মুখে ঘটনাটা শোনার পর স্থির থাকতে পারেনি আসাকাওয়া, আকস্মিক মৃত্যুটা নিয়ে খোঁজ-খবর শুরু করল। আশ্চর্য একটা তথ্য জানতে পারল সে, মোটরসাইকেল আরোহীর মতো ওই একই ধরনের লক্ষণ প্রকাশ করে ওই একই সময়ে, তবে আলাদা আলাদা জায়গায়, আরও তিনজন কিশোর মারা গেছে।

ওই তিনজনের একজন হলো আসাকাওয়ার আপন ভাইঝি।

আসাকাওয়ার কৌতূহল বেড়ে গেল। চারটে মৃত্যুর জন্যেই আকস্মিক হার্ট অ্যাটাককে দায়ী করা হয়েছে, কিন্তু তার রিপোর্টার মন আলাদা একটা চোখ দিয়ে এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেল।

একই সময়ে একই কারণে চারটে কিশোরের মারা যাওয়াটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে না? আসাকাওয়া অনুভব করছে, এর আরও বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য।

সিদ্ধান্ত নিল, এই চার কিশোরের মধ্যে কি কি বিষয়ে মিল ছিল সেটা খোঁজ নিয়ে দেখবে সে। জানা গেল চারজনই পরস্পরের বন্ধু ছিল, এবং মারা যাওয়ার ঠিক এক সপ্তা আগে পাহাড়ের ওপর একটা ভাড়া করা কেবিনে ছিল তারা

BanglaBook.org

আসাকাওয়া সিদ্ধান্ত নিল, ওই জায়গাটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

দেরি না করে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সে। শুধু সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত একটা পাহাড়ী রিসর্ট ওটা। তার ধারণা, যে কারণেই ওদের মৃত্যু হয়ে থাক না কেন, ওদেরকে সেটা ধরেছিল ওখান থেকেই

বোঝাই যায়, প্রাথমিকভাবে কোনো ভাইরাসকে সন্দেহ করছিল আসাকাওয়া। ভেবেছিল ওই কেবিনের ভেতর ওরা চারজন একই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, আর তার ফলেই এক সপ্তা পর একই সময় মার যেতে হয় ওদের।

কিন্তু বিস্মিত আসাকাওয়া ওই কেবিনে আবিষ্কার করল একটা ভিডিওটেপ।

এই পর্যায়ে আসাকাওয়াকে থামিয়ে দিয়ে টাকাইয়ামা জিজ্ঞেস করল, 'প্রথমে তুমি আমাকে ভিডিওটা দেখতে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে আসাকাওয়া বলল, 'বললাম না, ওটা দেখলে তোমার জীবন বিপদের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।'

গ্লাস থেকে আরেক টুকরো বরফ নিয়ে মুখে পুরল টাকাইয়ামা, জিভ দিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। আসাকাওয়াকে দেখে মনে হলো, সে ভাবছে তাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।

তবে শেষ পর্যন্ত, মারাত্মক ঝুঁকি থাক বা না থাক, ভিডিওটা তাকে না দেখালে কীভাবে পরামর্শ দেবে সে?

টাকাইয়ামা সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, 'চলো, এখনই আমরা তোমার বাড়িতে যাই, ঠিক আছে? পাহাড় থেকে আনা তোমার ভিডিওটা আগে আমার দেখা দরকার। কিছু না দেখে কি ছাই বুদ্ধি দেব...'

অগত্যা রাজি হলো আসাকাওয়া। 'ঠিক আছে, চলো তাহলে।'

আসাকাওয়ার লিভিং রুমে বসে আছে টাকাইয়ামা, চোখ দুটো টিভি স্ক্রিনে স্থির তার দৃষ্টিশক্তির মধ্যে দিয়ে টেপের ছবি কাউরুর ব্রেনে পৌঁছে যাচ্ছে।

ছবিগুলো এলেমেলো আর ছেঁড়া ছেঁড়া। টেপটা শুরু হয়েছে একটা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ দিয়ে। তারপর সদ্যোজাত এক শিশুর ক্লোজ-আপ একটার পর একটা ইমেজ দ্রুত বদলে যাচ্ছে, তবে প্রতিটি দৃশ্য আশ্চর্য উজ্জ্বল ছাপ রেখে যাচ্ছে, নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে একটি শিশুর কান্না এবং অন্যান্য শব্দ।

ইমেজগুলো কমপিউটার গ্র্যাফিক্স নয়, আবার টেলিভিশন ক্যামেরাতেও ধারণ করা হয়নি এগুলো অন্য কোনোভাবে তৈরি করা হয়েছে। কারও মাথায় এরকম চিন্তা আসতে পারে: লূপের ভেতর থাকা সংবেদনশীল কেউ একজন ছোট একটা ভার্চুয়াল জগৎ তৈরি করেছে, এগুলো সেখানকার ছবি।

এক পর্যায়ে অচেনা এক লোকের মুখ দেখা গেল, নীচে থেকে তোলা হয়েছে,

BanglaBook.org

কাছাকাছি দূরত্ব। একটা ক্লোজ-আপ: তার কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। মুখটা ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে। চলে গেল সে, কিন্তু ফিরে এল পরিবর্তিত একটা মুখ নিয়ে: চেহারা থেকে উন্মত্ততা অদৃশ্য হয়েছে, সেখানে এখন ভয় আর হতাশা।

দৃষ্টিপথ সরু হয়ে যাচ্ছে, এক পর্যায়ে শুধু এক চিলতে আকাশ দেখা গেল, যেখান থেকে খসে পড়ছে মুঠো আকৃতির কালো পিণ্ড। ওগুলো ভোঁতা আওয়াজ তুলে কিছু একটার ওপর পড়ছে। অপ্রত্যাশিত ব্যথা অনুভব করছে কাউরুর শরীর।

কি ঘটছে! বিড়বিড় করল ও।

কোনো উত্তর এল না। দৃষ্টিপথ আরও সরু হয়ে গেল, তারপর একসময় সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

টেপ যখন শেষ হয়ে এসেছে, পরদার ওপর কয়েক লাইন লেখা ফুটে উঠল। মনে হলো লেখার জন্যে কালি আর তুলি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে যত্নের সঙ্গে নয়: প্রতিটি অক্ষরের আকার-আকৃতি আলাদা। লেখাটা হুবহু এরকম:

যারা এই ভিডিওটেপ দেখল তাদের নিয়তি দাঁড়াল, আজ থেকে এক সপ্তা পর ঠিক এই সময়ে মৃত্যুকে বরণ করবে তারা। তোমরা যদি মারা যেতে না চাও, তাহলে এই নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করো...

তারপর স্ক্রিনে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস ফুটল। উজ্জ্বল ছবি আর কণ্ঠস্বর। নদীর তীরে আতসবাজি। হালকা সুতি কাপড় পরা লোকজন গ্রীষ্মের একটা সন্ধ্যা উপভোগ করছে। গা ছমছমে অন্ধকার পরিবেশ কেটে গিয়ে স্বাস্থ্যকর স্বাভাবিক একটা দিন ফিরে এসেছে।

এর কয়েক সেকেন্ড পরই হঠাৎ করে ফাঁকা হয়ে গেল স্ক্রিন।

কাউরু আর টাকাইয়ামা যে যার ডিসপ্লে থেকে একই সময়ে মুখ তুলল।

এসব থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল।

ওই চার মৃত কিশোর সবাই এই ভিডিওটা দেখেছিল। এবং এক সপ্তা পর ওরা চারজনই মারা গেছে, ঠিক যেভাবে ভিডিওতে সতর্ক করা হয়েছে। তাহলে এমন একটা ভিডিও আছে, যেটা কেউ দেখলে এক সপ্তা পর খুন করে তাকে। এবং সেই মৃত্যু ঠেকাতে হলে যে নির্দেশনা পালন করতে হবে, সেগুলো টেপ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। ওই কিশোরদের বাঁচানোর কোনো উপায় ছিল না।

কেবিনে ঢুকে ভিডিওটা দেখার পর আসাকাওয়া নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, এখন সে হতাশায় কাতর। তবে টাকাইয়ামা ভয়ও পাচ্ছে না, হতাশও হচ্ছে না। সে বরং এই মৃত্যু নিয়ে খেলাটায় অংশ নিতে পেরে ভারি খুশি। মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে সে।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে কাউরু, কি রকম শক্ত মনের মানুষের ওপর ভর করেছে ও।

সবকিছু আরেকটু যুক্তির সঙ্গে বিশ্লেষণ করার জন্যে টাকাইয়ামার সচেতনতা

BanglaBook.org

থেকে একটু পিছিয়ে এল কাউরু।

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে দেয় যে লূপের ভেতর থাকা কোনো লাইফ ফর্মের পক্ষে এরকম একটা ভিডিওটেপ তৈরি করা অসম্ভব, যেটা দেখার এক সপ্তা পর মারা যাবে দর্শক অবশ্য, এটা সম্ভব যে বাস্তব দুনিয়া থেকে লূপে কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেটাই হয়তো ওই ফর্ম পেয়েছে–হতে পারে সেটা একটা কমপিউটার ভাইরাস, উদাহরণ হিসেবে। তাহলে সবকিছুর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

নিজের সন্দেহ-সংশয় আপাতত তুলে রেখে, ফের ভয়-ডরহীন টাকাইয়ামার সঙ্গে সংযুক্ত হলো কাউরু।

আসাকাওয়াকে দিয়ে নিজের জন্যে টেপের একটা কপি করাল টাকাইয়ামা, দুজনেই যাতে যার যার বুদ্ধি খাটিয়ে ওটাকে বিশ্লেষণ করতে পারে।

দুদিন যেতে না যেতেই টাকাইনামা জানতে পারল আসাকাওয়ার স্ত্রী আর মেয়েও ভিডিওটেপটা দেখেছে। আসাকাওয়া স্বীকার করল, তার অসতর্কতাই এরজন্যে দায়ী, কারণ ওটা সে অবহেলার সঙ্গে একটা টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছিল। কাজেই এখন শুধু নিজের প্রাণ বাঁচানোর আকুতি আসাকাওয়াকে অস্থির করবে না, গোটা পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তাকে উন্মাদ করে তুলবে।

নিজের বাড়িতে বসে টাকাইয়ামা বোঝার চেষ্টা করছে টেপে থাকা ইমেজগুলো কীভাবে আনা হয়েছে ফিল্মে। গবেষণা আর অনুমান তাকে অপ্রত্যাশিত একটা উপসংহারে পৌঁছে দিল।

টেপে থাকা ছবিগুলো টেলিভিশন ক্যামেরা বা ওই ধরনের কোনো যান্ত্রিক উপায়ে ধারণ করা হয়নি। যে ব্যক্তির দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, সে তার নিজের সাইকোলজিকাল পাওয়ার ব্যবহার করে ওগুলোকে সরাসরি ভিডিওটেপে প্রজেক্ট করেছে।

সাইকিক ফটোগ্রাফি, "থটোগ্রাফি"।

ওই ছবিগুলোকে খালি একটা টেপে ছেপেছে সাইকিক পাওয়ার, যে টেপটা কাকতালীয়ভাবে ভিসিআর-এ ঢোকানো ছিল

লূপ একটা বদ্ধ জগৎ। প্রাকৃতিক যে-সব নিয়মকানুন ওখানে প্রচলিত সে-সব কঠিনভাবে মেনে চলা হয়, কাজেই এ-ধরনের কিছু করা সম্ভব নয়। এখানকার বিধি-ব্যবস্থা বা সিস্টেম ঠিক এভাবে কাজ করে না।

কাউরুর এখন অনুভূতি হচ্ছে, ও যেন একটা মুভি দেখছে; যত্ন নিয়ে বানানো, সন্দেহ নেই, তবে ছেলেমানুষি চিন্তা-চেতনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি

কে সেই প্যারানরমাল থট-প্রজেক্টর, তার পরিচয় উদ্ধার করার জন্যে ওরা দুজন নিজেদের নাগালে থাকা ইনফরমেশন নেটওঅর্কের পুরো সুবিধে কাজে লাগাল। অবশেষে ওরা একটা নাম পেল।

BanglaBook.org

সাদাকু ইয়ামামুরা।

এই পর্যায়ে, ওদের পাওয়া সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে আলোচ্য চরিত্রটি এক নারী। যে দ্বীপে তার বাড়ি, সেখানে গেল ওরা, তার সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করছে :

তদন্তে বেরিয়ে এল, স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয় মনের এমন ক্ষমতাকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যায় এই সাদাকু ইয়ামামুরার ক্ষমতা। তার আচরণ, গতিবিধি, প্রবণতা ইত্যাদি খুঁটিয়ে জানল ওরা–জন্ম থেকে ধরে, স্কুলে গ্রাজুয়েশন, তারপর শহুরে জীবন গ্রহণ পর্যন্ত সময়সীমার ভেতর।

কিন্তু তারপর সাদাকু ইয়ামামুরার আর কোনো খোঁজ নেই, সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে–সম্প্রতি নয়, লূপ সময় অনুসারে প্রায় বিশ বছর আগে।

এখন গোটা ব্যাপারটাকে নতুন একটা দৃষ্টিতে দেখা দরকার। ওরা সিদ্ধান্ত নিল এবার তদন্ত করবে পাহাড়ী কেবিনে পাওয়া ওই ভিডিওটেপে ছবিগুলো এল কেন।

টাকাইয়ামা আর আসাকাওয়া ওই কেবিনে যাচ্ছে। তবে যাওয়ার পথে একজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগটা হাতছাড়া করল না। ওরা জানতে পেরেছে রিসর্টটা তৈরি হওয়ার আগে নির্দিষ্ট কিছু ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করার জন্যে একটা ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি ছিল ওই জায়গায়, এবং সেখানে চিকিৎসাসেবা দিতেন এমন একজন ডাক্তার এখন কাছাকাছি প্র্যাকটিস করছেন।

তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো টাকাইয়ামা আর আসাকাওয়া। কল বেল বাজাতে যে ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন, তাঁর মুখটা যখন ওরা দেখল, ওদের সঙ্গে কাউরু নিজেও বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল !

ভিডিওটেপে যে শেষ দৃশ্যটা আছে, তাতে কাঁধে রক্তসহ এই লোককে দেখেছে ওরা, চেহারায় ছিল আতঙ্ক আর হতাশা।

টাকাইয়ামার জেরার মুখে দাঁড়াতে না পেরে, ডাক্তার স্বীকার করলেন প্রায় বিশ বছর আগে সাদাকু ইয়ামামুরাকে খুন করেছিলেন তিনি, তারপর একটা কুয়ার ভেতর ফেলে দিয়েছিলেন লাশটা।

এখন, ওরা আন্দাজ করল, সেই কুয়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে রিসর্টের ওই কেবিন। তো সাদাকু ইয়ামামুরা, ধরে নেয়া হচ্ছে যে কিনা বিশ বছর ধরে মরে পড়ে আছে ওই কুয়ার তলায়, নিজের ক্রোধ আর অসন্তোষ সরাসরি ওপর দিকে প্রজেক্ট করেছিল, সেই রহস্যময় ইমেজগুলো ভিসিআর-এর ভেতর ঢোকানো একটা ভিডিওটেপে ছাপা বা রেকর্ড হয়ে গেছে। তারপর জানা গেল যে ওই সাদাকু ইয়ামামুরা পুং ও স্ত্রী, উভলিঙ্গের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।

টাকাইয়ামা বলল ওদের আসলে ক্রল করে কেবিনটার নীচে পৌঁছুনো দরকার। ঢাকনি তুলে পরীক্ষা করতে হবে কুয়ার তলায় সত্যি কোনো লাশের অবশিষ্টাংশ আছে কিনা। ওর ধারণা, তাতে করে ইয়ামামুরার আত্মাকে শান্তি দেয়া হবে; এবং

BanglaBook.org

ওর আশা ভিডিওটেপে যে অভিশাপ দেয়া হয়েছে তা থেকে মুক্তি পাবে ওরা।

লূপ সময় অনুসারে পুরো এক সপ্তা পার হয়ে গেল। মৃত্যু ছোবল মারেনি, আসাকাওয়া এখনও বেঁচে। অর্থাৎ ধাঁধার জবাব পাওয়া গেছে। স্বস্তিতে জ্ঞান হারানোর অবস্থা আসাকাওয়ার। স্বাভাবিক।

কিন্তু ব্যাপারটা তখনও শেষ হয়নি; পরদিন, যখন টাকাইয়ামার নিজের দিনক্ষণ উপস্থিত হলো, বুকে ব্যথা নিয়ে হার্ট অ্যাটাকের ছদ্মবেশে হাজির হলো সেই অভিশাপও। কাজেই প্রমাণ হয়ে গেল ইয়ামামুরার হাড়গোড় মাটি খুঁড়ে বের করা বা তার আত্মাকে শান্তি দেয়ার ব্যাপারে ওই ভিডিওটেপের কোনো আগ্রহ নেই।

টাকাইয়ামা মারা যাওয়ার ঠিক আগে, এতটুকু ইতস্তত না করে দ্রুত ওর সাবজেক্ট বদলে ফেলেছে কাউরু, তাকে ছেড়ে দিয়ে এবার ভর করেছে আসাকাওয়ার ওপর।

মৃত্যু, ভার্চুয়াল জগতেও, অত্যন্ত ক্লান্তিকর একটা অভিজ্ঞতা। জবাই করাটা দ্রুত ঘটে যায়, কিন্তু হার্ট অ্যাটাকে খুব কষ্ট, অনেক সময় তা দীর্ঘক্ষণ ভোগায়ও, কাজেই সুযোগ থাকলে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

টাকাইয়ামার মৃত্যুতে আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ল আসাকাওয়া। দেখা যাচ্ছে ভিডিওটেপের রহস্য ওরা ভেদ করতে পারেনি।

কিন্তু আসাকাওয়া তাহলে এখনও বেঁচে আছে কেন? এর একটাই কারণ থাকতে পারে। গত সাতদিনের মধ্যে ওই ভিডিওর কোনো ইচ্ছে নিশ্চয়ই পূরণ করেছে সে, তবে নিজেও জানে না সেটা কি।

সেটা এমন কিছু যা টাকাইয়ামা করেনি, কিন্তু আসাকাওয়া করেছে। কিন্তু কী? মগজটা তন্নতন্ন করে খুঁজল আসাকাওয়া। তাকে রেহাই দেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রহস্যের সমাধান করতে না পারলে, ওর স্ত্রী আর মেয়ে মারা যাবে।

কী চাইছে টেপটা?

এই পর্যায়ে আসাকাওয়া একটা অনুপ্রেরণা লাভ করল।

একটা ভাইরাস বেঁচে থাকে নিজেকে বহুগুণ করার জন্যে।

হঠাৎ ওটার সঙ্গে হোঁচট খেলো আসাকাওয়া। ওই ভিডিওটেপ ভাইরাসের মতো আচরণ করছে। ওটা আসলে যা করতে চাইছে তা হলো পুনরুৎপাদন। চাওয়া হয়েছে একটা কপি তৈরি করুক ও, এমন কাউকে দেখাক যে দেখেনি, এবং এভাবে সংখ্যা বাড়াবার কাজে সাহায্য করুক। ব্যাপারটা বোধগম্য লাগছে;

টাকাইয়ামার জন্যে ওই টেপের একটা কপি করেছে আসাকাওয়া। কিন্তু টাকাইয়ামা কারও জন্যে কোনো কপি তৈরি করেনি।

এরকম একটা উপসংহারে পৌঁছে, খপ করে ভিসিআরটা ধরল আসাকাওয়া, লাফ দিয়ে উঠে বসল নিজের গাড়িতে, ছুটল শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে। ওর ইচ্ছে টেপের দুটো কপি তৈরি করে শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখাবে, দেখিয়ে স্ত্রী আর কন্যার

BanglaBook.org

প্রাণ বাঁচাবে।

ডাবিং আর প্লেব্যাক নিরাপদেই সারা গেল, কিন্তু নিজের বাড়িতে ফেরার পথে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল একটা পরীক্ষা, সেটা ওর জন্যে এত কঠিন যে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা চলে না।

হাইওয়ে থেকে ঠিক নামতে যাওয়ার আগে রিয়ার-ভিউ মিররে আসাকাওয়া দেখল ওর স্ত্রী ও কন্যা পেছনের সিটে ঘুমে ঢুলছে। 'এই তো, আর একটু পরই বাড়ি পৌঁছে যাব,' বলল ও, স্টিয়ারিং হুইল থেকে একটা হাত তুলে পেছন দিকে নিয়ে গেল, ওদেরকে ছোঁয়ার জন্যে।

ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে ওরা। ঘড়ির কাঁটা ধরে আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে দুজনেই।

তাহলে টেপের কপি তৈরি করেও অভিশাপটা এড়ানো যাচ্ছে না।

প্রবল হতাশা আর শোকে নিজের কথা ভুলে গেল আসাকাওয়া। বিভ্রান্ত একজন মানুষ, খেয়ালই করল না তারা সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাফিক: সরাসরি ওটার গায়ে আছড়ে পড়ল ওর গাড়ি।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল আসাকাওয়া, তার আগের মুহূর্তে নিজেকে সে প্রশ্ন করল, *'ওরা মারা গেল কেন? আমি বেঁচে আছি কেন?'*

একটা শোক, আরেকটা জখম, দুটো মিলে আসাকাওয়ার শরীর ও মনের এত বেশি ক্ষতি করল যে তা আর মেরামতযোগ্য থাকল না।

চার

আসাকাওয়ার চোখ খোলা। দৃষ্টি সচল, সিলিংয়ে একটা বিন্দুকে ঘিরে থাকা বৃত্তকে অনুসরণ করছে। ছবিগুলো তার রেটিনা থেকে ব্রেনে পৌঁছুচ্ছে, কিন্তু সচেতনভাবে কিছু দেখছে না সে। চোখের মণি দুটো নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে খামোখা ঘুরছে, কোনো সূত্র না মেনেই।

তবে চোখ দুটোর এই অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়ার ভেতর দিয়েও কাউরু আন্দাজ করতে পারছে এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে আসাকাওয়া। সাদা পরদা দিয়ে পাশেরটা থেকে আলাদা করা তার বেড, চকচকে আই. ভি. স্ট্যান্ড—পুরো দৃশ্যটা কাউরুর জন্যে বয়ে আনল বেদনাদায়ক, অথচ একই সঙ্গে মধুর স্মৃতি। এখানকার পরিবেশ, জিনিস-পত্র, রাইকোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ওকে। একটা হাসপাতালের বেডে শুয়ে রয়েছে আসাকাওয়া।

তাকে সম্ভবত দুর্ঘটনার পরপরই নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। সেই থেকে

BanglaBook.org

বেশিরভাগ সময় নিশ্চয় অজ্ঞান ছিল: দীর্ঘ একটা সময় অন্ধকার ছিল ডিসপ্লে। প্রায় পুরোটা সময় আসাকাওয়ার রেটিনা কালো ছিল, তবে মাঝে-মধ্যে চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকিয়েছে সে–এখন যেমন তাকাচ্ছে।

আসাকাওয়ার চোখের ভেতর দিয়ে দুজন লোকের মুখ দেখতে পাচ্ছে কাউরু। একজনকে ঝাপসাভাবে আগেও কয়েক বার দেখেছে। গায়ে সাদা কোট থাকায় ধরে নিতে হয় আসাকাওয়ার চিকিৎসা করছেন তিনি। দ্বিতীয় মুখটা নতুন, আগে কখনও দেখেনি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিছানার কাছে এগিয়ে এলেন, ঝুঁকে আসাকাওয়ার মুখটা দেখছেন। 'মিস্টার আসাকাওয়া,' বললেন তিনি, একটা হাত রাখলেন তার কাঁধে। 'আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

সম্ভবত শ্রবণশক্তি আর স্পর্শবোধ, রোগীর এ দুটো ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করলেন তিনি।

আসাকাওয়া যে গহ্বরে বিচরণ করছে, এমনকি কাউরুর সচেতনতাও সেটার তল খুঁজে পাচ্ছে না, কাঁধে চাপ দিয়ে তা থেকে তাকে তুলে আনা সম্ভব নয়।

বিছানার সামনে থেকে পিছিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরোটা সময় এরকমই আছেন তিনি?'

'হ্যাঁ।'

ডাক্তার কিছুক্ষণ আলাপ করলেন তাঁর সঙ্গে। ওঁদের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল দ্বিতীয় ভদ্রলোকও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান রাখেন। সম্ভবত তিনিও একজন ডাক্তার।

ভদ্রলোক আবার এগিয়ে এসে আসাকাওয়ার মুখের ওপর ঝুঁকলেন। আবেগতাড়িত গলায় আবার ডাকলেন তিনি, 'মিস্টার আসাকাওয়া?' তাঁর চোখ দুটোয় রাজ্যের সহানুভূতি, যেন নিজের এরকম অভিজ্ঞতা থাকায় আসাকাওয়ার অসহায় অবস্থা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন ভদ্রলোক।

'উনি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না,' খুক করে একটু কেশে বললেন ডাক্তার।

হাল ছেড়ে দিয়ে বেডের কাছ থেকে আবার সরে গেলেন ভদ্রলোক। 'তাঁর এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আপনি জানাবেন।' কথাটা বলার সময় তাঁর চোখ-মুখে যে ভাব ফুটল সেটাকে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হলো কাউরুর। সন্দেহ নেই, আসাকাওয়াকে নিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে আছেন তিনি।

আসাকাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রেখে আর কিছু জানার সুযোগ নেই কাউরুর। যতদিন এই অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকবে সে, ওর তথ্য সংগ্রহ করার কাজ এতটুকু এগোবে না।

অর্থাৎ আবার অন্য কারও ওপর ভর করার সময় হয়েছে।

BanglaBook.org

সদয় প্রকৃতির দ্বিতীয় ভদ্রলোককে সম্ভাব্য একজন ভালো প্রার্থী বলে মনে হলো কাউরুর। এই লোকের মুখ আগে কখনও দেখেনি বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আশ্চর্য এবং ব্যাখ্যাহীন একটা ঘনিষ্ঠতা অনুভব করছে ও। তাছাড়া, ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে এই কেসটার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত তিনি

কিছু কমান্ড টাইপ করল কাউরু, নিজের সচেতনতা বিচ্ছিন্ন করল আসাকাওয়ার উপলব্ধির ক্ষমতা থেকে, তার বদলে রোগীর কেবিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে দ্বিতীয় ভদ্রলোকের ওপর ভর করল, ওই একই কৌশলে। সেই মুহূর্ত থেকে আসাকাওয়ার মন বা মস্তিষ্কের সঙ্গে কোনোভাবেই আর যুক্ত থাকল না কাউরু: তার পরিবর্তে, ও এখন থেকে ওর নতুন সাবজেক্টের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণক্ষমতা উপভোগ করতে পারবে। নতুন সাবজেক্টের নাম মিটসু আনডু।

কিন্তু দেখা গেল আনডুর অন্তরেও খুব একটা শান্তি নেই। কাউরু যেন আরও দুঃখ-কষ্টের ভাগ নিতে এসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। প্রিয়জন হারানোর ব্যথা যথেষ্টই পেয়েছে ও।

কাউরু যে ভর করার জন্যে সাবজেক্ট বাছতে ভুল করেনি, সেটা বুঝতে খুব বেশি সময় লাগল না।

আনডুই সেই ডাক্তার, যিনি টাকাইয়ামার ময়নাতদন্ত করেছিলেন। এবং, কাউরু যেমনটি সন্দেহ করেছিল, ভিডিওটেপের ব্যাপারটাতেও তিনি বেশ ভালোভাবে জড়িত। একটা ইউনিভার্সিটি হসপিটালের ফরেনসিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি, এবং এক সাইকোলজিস্ট বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এই ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়বেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

এখন পর্যন্ত ওরা জানতে পেরেছেন ভিডিও দেখে মারা গেছে মোট সাতজন। প্রথমে চার কিশোর, তারপর টাকাইয়ামা, সবশেষে আসাকাওয়ার স্ত্রী ও কন্যা।

প্রতিটি শরীরে নতুন জাতের ভাইরাসের উপস্থিতি দেখতে পেয়েছেন ওঁরা। বন্ধুর মুখে ভাইরাসের কথা শুনে খুব অবাক হলেন আনডু, কাউরুও কম অবাক হলো না। ওর সন্দেহ হলো, যে ভাইরাসটা বাস্তব দুনিয়াকে ক্ষতবিক্ষত করছে, তার সঙ্গে এটার সম্পর্ক আছে

একটা মেমো প্যাড টেনে নিয়ে খস খস করে লিখল কাউরু।

লূপে থাকা ভাইরাসের ডিএনএ বিশ্লেষণ করা দরকার।

দুটো ভাইরাসের সিকোয়েন্স এক হবে, এটা বেশি আশা করা হয়ে যায়, তবে কিছু মিল থাকতে পারে। লূপ জগতের একটা ভাইরাসের জেনেটিক তথ্য বিশ্লেষণ করা, তুলনায় কাজটা সহজই হওয়া উচিত।

আনডুর চোখ দিয়ে দেখা দুনিয়াটা বিরতিহীন দুঃখ-কষ্টের সমষ্টি। কাউরু এর কারণ বোঝে না। ভদ্রলোকের প্রকৃতিই কি এরকম, সবকিছুতে শুধু বিষাদের ধূসর

BanglaBook.org

ছায়া দেখতে পান? নাকি ব্যক্তিগত কোনো কারণ আছে? জীবনে অনেক আঘাত পেয়েছেন? হতে পারে। সেগুলো হয়তো সহ্য করার মতো নয়। কখনও দেখা যায় বিনা নোটিশে পানিতে ঝাপসা হয়ে যায় তাঁর রেটিনা। না, অন্তরের গভীরে খুব বড় কোনো দুঃখ না থেকেই পারে না। আনডুর বর্তমান নিঃসঙ্গ জীবন দেখে তার কিছু কিছু আভাস পায় কাউরু।

আনডুর বিষণ্নতার মাত্রা লক্ষ করে কাউরু এতটাই বিস্মিত, সিদ্ধান্ত নিল এর কারণটা ওকে জানতে হবে। তা জানতে হলে ভদ্রলোকের অতীত সম্পর্কে খবর নিতে হয়।

তবে ঠিক এখন তাঁর অতীতে তল্লাসি চালানোর মতো সময় কাউরুর হাতে নেই। কারণ, আনডু এইমাত্র জানতে পেরেছেন তাঁর প্রিয় এক তরুণী নিখোঁজ হয়েছে। সেই তরুণীর খোঁজে এখনই তিনি বেরোচ্ছেন।

নিখোঁজ তরুণীর নাম মাই টাকানো, টাকাইয়ামার ছাত্রী। একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে একাই থাকত সে। আনডু বহু চেষ্টা করেও তার সঙ্গে গত সপ্তা থেকে যোগাযোগ করতে পারছেন না।

টাকাইয়ামা আর আসাকাওয়া, দুজনের সঙ্গেই মাই টাকানোর সম্পৃক্ততা ছিল, আর তাই আনডু সন্দেহ করছেন ওদের মতো তারও কিছু হলো কিনা। ভিডিওটপটা সেও হয়তো দেখেছে কোথাও।

সরাসরি টাকানোর অ্যাপার্টমেন্টে যাচ্ছেন আনডু। বলা যায় না, নতুন ভাইরাসে সেও হয়তো আক্রান্ত হয়েছে।

মাই টাকানোর অ্যাপার্টমেন্ট খালি পেল ওরা। তবে সেই ভিডিও, যেটা কেউ দেখলে এক সপ্তা পর মারা যাবে, টাকানোর ভিসিআর-এ ঢোকানো অবস্থায় পাওয়া গেল। সন্দেহ নেই, দেখেছে সে। এবং, মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাদ রেখে, বাকি সবটুকু মুছে ফেলা হয়েছে।

ব্যাপারটা থেকে কি বুঝবেন, ভেবে পাচ্ছেন না আনডু। টাকানো যদি ভিডিওটা দেখে থাকে, তার বাঁচার কোনো আশা নেই। সে হয়তো এরইমধ্যে কোথাও মরে পড়ে আছে। শুধু তার লাশটা এখনও পাওয়া যায়নি।

এখন পর্যন্ত ভিডিওটা দেখেছে অথচ মারা যায়নি, এরকম লোক বলতে মাত্র একজনকেই বোঝায়–আসাকাওয়া। আসাকাওয়া বেঁচে গেছে, কারণ ওই ভিডিওর একটা কপি তৈরি করেছিল সে। কিন্তু তার স্ত্রী ও কন্যাও ভিডিওর কপি করেছিল, অথচ তারা বাঁচেনি।

ঠিক কি চাইছে ভিডিওটা? ব্যাপারটা স্রেফ খেয়াল-খুশি, তার ইচ্ছে কাউকে মারবে, কাউকে মারবে না। যুক্তিসঙ্গত একটা ছক বা ধারা যদি থেকে থাকে, এখনও সেটা পাওয়া যায়নি।

ঠিক মাই টাকানোর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরোবার মুহূর্তে, এমন একটা অস্তি

BanglaBook.org

ত্বের উপস্থিতি অনুভব করলেন আনড্রু, আগে যা কখনও করেননি। ছোট কিছু একটা, পিচ্ছিল, যেটা একটা মেয়ের মতো হাসছে।

ডিসপ্লেতে আঠার মতো সেঁটে থাকা অবস্থায় কাউরুও সেটার অস্তিত্ব অনুভব করল। কিছু একটা ওর গোড়ালি স্পর্শ করল– তেলতেলা একটা অনুভূতি হলো ওর।

ভয়ে অস্থির, সদর দরজা খুললেন আনড্রু।

কিছু একটা আছে এখানে ।

হোঁচট খেতে খেতে কামরা থেকে বেরোবার সময় উপলব্ধি করলেন তিনি।

ইতিমধ্যে, ভার্সিটিতে, ভাইরাসের বিশ্লেষণ দ্রুতগতিতেই এগোচ্ছে।

খবরের কাগজের এক রিপোর্টার আনড্রুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তিনি সাক্ষাৎ দিতে রাজি হলেন, কারণ রিপোর্টার বলেছে আসাকাওয়া তার সহকর্মী ছিল।

রিপোর্টার তাঁকে একটা ফ্লপি ডিস্কের কথা জানাল, তাতে এই কেসের সমস্ত ঘটনার বিবরণ সাজানো আছে, লিখেছে আসাকাওয়া নিজে। তবে ফ্লপি ডিস্কটা কোথায় আছে তা রিপোর্টারের জানা নেই।

আনড্রু অবশ্য আন্দাজ করতে পারলেন কোথায় সেটা থাকতে পারে। একটু চেষ্টা করতে সেটা তাঁর নাগালের মধ্যে চলে এল।

দুর্ঘটনার সময় আসাকাওয়ার গাড়িতে একটা ওয়ার্ড প্রসেসর ছিল। সেটা এখন তার ভাইয়ের কাছে আছে। ওই ওয়ার্ড প্রসেসরে পাওয়া গেল ডিস্কটা।

ডিস্কের ফাইল খুলে পড়তে শুরু করলেন আনড্রু। ডকুমেন্টের শিরোনাম দেয়া হয়েছে: *রিং*। বেশ সুন্দর করে সাজানো।

যে-সব ঘটনা এতে রেকর্ড করা হয়েছে, সবগুলোর সঙ্গে কাউরু পরিচিত: টাকাইয়ামা আর আসাকাওয়ার চোখ এবং কান দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও, তার বর্ণনা এগুলোর সঙ্গে মিলে গেল।

তাতে করে, আসাকাওয়ার ইন্দ্রিয় মারফত যে-সব তথ্য জেনেছে কাউরু, এখন তার লেখার মাধ্যমে সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। ভিডিওটেপের বিষয়বস্তুকে ডকুমেন্টে রূপান্তর করে নাম দেয়া হয়েছে *রিং*।

এই পর্যায়ে আনড্রু একটা মেসেজ পেলেন, তাতে একটা ডিএনএ সিকোয়েন্স কোড করা আছে

মিউটেইশন [রূপান্তর]

এই সংকেত পেয়ে আনড্রুর মনোযোগ আরেক দিকে ঘুরে গেল। টাকানোর কামরায় ফেলে রেখে যাওয়া ভিডিওটেপ মুছে ফেলা হয়েছে বাকি দুটো কপি কোনো না কোনোভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ওই ভিডিওর আর কোনো অস্তিত্ব নেই মূল ভিডিওটার শেষ কিছুটা অংশও মুছে ফেলা হয়েছিল, কাজটা সম্ভবত ওই

BanglaBook.org

চার কিশোরের, দেখার পর মুছে ফেলেছিল ওরা। ডিএনএ টার্মে– জেনেটিক ম্যাটিয়ারিয়াল অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

আনড্রু চিন্তা করতে গিয়ে দেখলেন, ভিডিওটেপটা নিজেকে কপি করার জন্যে তৃতীয় পক্ষের যে সাহায্য নিচ্ছে, এই আচরণের সঙ্গে ভাইরাসের মিল আছে জেনেটিক ম্যাটিয়ারিয়াল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, ধারণা করলেন তিনি, ভিডিও নিজেকে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। সে নতুন একটা প্রজাতি হিসেবে নিজের পুনর্জন্ম দিয়েছে। পুরোনো প্রজাতি, ভিডিওটেপ, তার কাজ শেষ করেছে। পুরোনো প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলে নতুনগুলোর কিছু আসে যায় না।

দুটো জরুরি প্রশ্ন দেখা দিল।

ভিডিওটার যদি পুনর্জন্ম হয়ে থাকে, কিসের ভেতর হয়েছে?

এবং:

আসাকাওয়া এখনও বেঁচে আছে কেন?

তারপর আরেকটা সূত্র হাজির হলো। অবশেষে মাই টাকানোর লাশ পাওয়া গেছে।

প্রায় ভেঙে পড়া একটা অফিস বিল্ডিংয়ের ছাদে, শাফটের ভেতর আটকে ছিল ওটা। টাকানো খিদেতে মারা গেছে, নাকি খোলা জায়গায় থাকায়, নিশ্চিত হওয়া গেল না। ময়নাতদন্তে হার্ট অ্যাটাকের কোনো লক্ষণ ধরা পড়ল না। তার মৃত্যু, তাহলে, বাকি সাতজনের সঙ্গে মিলল না। বলা যায় 'স্বাভাবিক' মৃত্যু হয়েছে তার। এগজস্ট শাফটে পড়ে না গেলে আজও বেঁচে থাকত টাকানো।

আরও হতবুদ্ধিকর তথ্য হলো, শাফটে পড়ার পরপরই সন্তানপ্রসব করেছে টাকানো। প্রমাণ দিচ্ছে ফুল ছিঁড়ে আনার ফলে সৃষ্ট ক্ষত। ফুলের সঙ্গে সংযোজক নালীর টুকরো-টাকরাও পাওয়া গেছে ওখানে।

এ-সব নতুন একটা প্রশ্ন তুলল।

টাকানো কী প্রসব করেছে?

আনড্রু, যিনি তাকে চিনতেন, চিন্তিত। শেষবার যখন দেখেছেন টাকানোকে, মোটেও তাকে গর্ভবতী বলে মনে হয়নি।

সমস্যাটাকে নানাদিক থেকে দেখছে ওরা। ওই ভিডিওর সংস্পর্শে আসার পর যারা মারা গেছে তাদের সংখ্যা দাঁড়াল এগারো–এই সংখ্যায় এখন আসাকাওয়াও আছে, হাসপাতালে নিজের বিছানায় অজ্ঞান অবস্থায় মারা গেছে সে।

আনড্রু আর তাঁর বন্ধু সাইকোলজিস্ট এখন সম্পূর্ণ একমত, ভিডিওটেপটা দেখার কারণেই ভিক্টিমের রক্তস্রোতে ওই ভাইরাস পৌঁছেছে। তাঁরা আরও আবিষ্কার করলেন, লক্ষ করার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ওটার। আসলে ওটা নয়, ওগুলো, কারণ এই ভাইরাস দু'রকমের দেখতে। একটা বৃত্ত বা রিং আকৃতির, আরেকটা সুতো আকৃতির বা ছেঁড়া বৃত্তের মতো।

BanglaBook.org

সুতো টাইপের ভাইরাস আসাকাওয়া আর টাকানোর শরীরে বেশি পাওয়া গেল, যারা হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়নি। বাকি ন'জনের শরীরে পাওয়া গেছে শুধু বৃত্ত আকৃতির ভাইরাস। মনে হচ্ছে এটাই তাহলে মূল কারণ, ঠিক করে দিচ্ছে ভাইরাস কাকে মারবে বা মারবে না; বৃত্ত যদি ছিঁড়ে যায়, সংক্রমিত ব্যক্তি বেঁচে যাবে; আর যদি বৃত্ত না ছেঁড়ে, এক সপ্তা পর মৃত্যু এসে হানা দেবে।

যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলেন আনডু। এ সময় আরও একটা অদ্ভুত কোইন্সিডেন্স আবিষ্কার করলেন তিনি।

সুতো আকৃতির ভাইরাস স্প্যামেটোজোয়া-র মতো নড়াচড়া করে।

লক্ষণ দেখে বোঝা গেছে টাকানো সন্তানপ্রসব করেছে। সে যখন ভিডিওটা দেখছিল, তখন যদি তার ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে? কি ঘটতে পারে, যদি সদ্য তৈরি ভাইরাস তার ডিম্বাণুর দিকে রওনা হয়, তার করোনারি আর্টারির পরিবর্তে?

দেখা যাচ্ছে সে গর্ভবতী হয়েছিল, এবং কিছু একটার জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু কী?

জিনিসটা যাই হোক, টাকানোর অ্যাপার্টমেন্টে সেটার অস্তিত্ব টের পেয়েছেন তিনি।

এই একই যুক্তি আসাকাওয়া প্রসঙ্গেও ব্যবহার করলেন আনডু। *পুরুষমানুষ হিসেবে, নিজ গর্ভে আসাকাওয়া সন্তান ধারণ করতে পারত না। তার বদলে কী ধারণ করেছিল সে?*

প্রশ্নটার উত্তর খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন আনডু।

তাঁর সঙ্গে এক মহিলা দেখা করতে এলেন। নিজের পরিচয় দিলেন টাকানোর বড় বোন বলে। যে বিল্ডিংয়ের ছাদে টাকানোর লাশ পাওয়া গেছে, সেখানে আগেও তাঁকে দেখেছেন আনডু। এবার দুজনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলো।

মহিলা শাওয়ার নিচ্ছেন, ঘরে বসে এক প্রকাশনা সংস্থার ক্যাটালগে চোখ বুলাচ্ছেন আনডু। বইয়ের নাম দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা বই বেরোতে যাচ্ছে, নাম–রিং।

আনডু বিস্মিত হয়ে দেখলেন আসাকাওয়ার লেখা সেই রিপোর্টটা একটা বই হিসেবে ছাপা হচ্ছে, এবং সেটা প্রচুর সংখ্যায় চারদিকে বিলি করা হবে।

রিং!

এটাই তাহলে আসাকাওয়া জন্ম দিয়েছে রূপান্তরিত ভিডিওটেপ, পুনর্জন্ম পেয়েছে একটা বই হিসেবে, এবং সেটা এখন প্রচুর সংখ্যক বিলি করা হবে। ওটা লেখার মাধ্যমে ওই পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিরাট একটা ভূমিকা রেখেছে আসাকাওয়া।

ঠিক তখনই সাদাকু ইয়ামামুরার একটা ফটো পেলেন আনডু। একবার চোখ

BanglaBook.org

বুলিয়েই বিস্ময়ের প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন তিনি। সাদাকু ইয়ামামুরা আর এই মহিলা, এই মাত্র যিনি তাঁর শাওয়ার থেকে বেরিয়ে এলেন, যিনি নিজেকে মাই টাকানোর বোন বলে দাবি করছেন, দুজন হুবহু এক রকম দেখতে।

সাই তাহলে কি জন্ম দিয়ে গেছে?

সাদাকু।

সাদাকু, যে নারী বিশ বছর আগে একটা পাহাড়ী কুয়ার তলায় পড়ে পচে শেষ হয়ে গেছে, সে-ই নিজের পুনর্জন্মের জন্যে মাই টাকানোর গর্ভ ধার নিয়েছিল! কিন্তু এই ব্যাখ্যা মাথায় আসার আগেই আনডু জ্ঞান হারালেন।

আনডুর যখন জ্ঞান ফিরল, ইয়ামামুরা তাঁর সহযোগিতা চাইল। সে নিশ্চিত করল ভিডিওটেপটা বই হিসেবে পুনরুৎপাদিত হয়েছে, এবং এখন সেটার বিরাট সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, এবং সে চায় না আনডু তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ান।

সম্ভাব্য সব রকম নতুন আকৃতিতে নিজেকে বদলে ফেলতে তার পাঠকদের ব্যবহার করবে রিং। যে-সব নারীর ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নির্গত হচ্ছে, ওই সব আকৃতির সংস্পর্শে এলে সবাই তারা গর্ভবতী হয়ে পড়বে, এবং পেটে ধারণ করবে আরও সাদাকু, বাকি শুধু তারাই বাঁচবে যারা তাকে তার পুনরুৎপাদনে সাহায্য করবে।

রিং একটা বই হতে যাচ্ছে, তারপর সিনেমা হবে, ভিডিও গেইম হবে, একটা ইন্টারনেট সাইট–মিডিয়ার প্রতিটি শাখার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকে পুরোপুরি গ্রাস করবে।

ব্যাপারটার পরিণতি কতটা ধ্বংসাত্মক হতে যাচ্ছে, আনডুর কল্পনাশক্তি তা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারল না। সহজ ভাষায়, তিনি ধারণা করলেন যে নারী-পুরুষের একটা মিশ্রণ, অর্থাৎ সাদাকু ইয়ামামুরা, নিজের অনন্য জেনেটিক কোড নিয়ে পুনরুৎপাদিত হতে থাকবে, ওদিকে রিং ভাইরাস সারাক্ষণ রূপান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে পড়বে।

বিভিন্নতা সত্যিকার অর্থে জীবনের মশলা: শুধুমাত্র জেনেটিক বিচিত্রতা প্রাণীসত্তাকে নিজ অস্তিত্ব থেকে আনন্দ আহরণের সুযোগ করে দেয়। যদি সমস্ত বিচিত্রতা একটিমাত্র জেনেটিক ব্লুপ্রিন্টে জড়ো করা হত, জীবন তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলত। সাদাকু হয়তো পরমায়ু পেয়েছে, কিংবা পরমায়ুর সমতুল্য কিছু, তবে প্রাণের বাকি সমস্ত প্রকার ধাওয়া খেয়ে যেখানে পারে আশ্রয়ের জন্যে লুকোবে, এবং শেষ পর্যন্ত খুঁজে নিয়ে সেগুলোকে বিলুপ্ত করা হবে।

আনডুর সামনে দুটো পথ, একটাকে বেছে নিতে হবে তাঁর। সাদাকুকে সাহায্য করতে পারেন তিনি, কিংবা তার দ্বারা কবরে চলে যেতে পারেন।

BanglaBook.org

সহযোগিতা করার পুরস্কারটা অসম্ভব বড়।

আমার ছেলের পুনর্জন্ম।

আনডুর গোটা অস্তিত্ব জুড়ে যে বিষণ্নতা অমোচনীয় কালির মতো লেপ্টে আছে, তার কারণ দু'বছর আগে ওঁর সন্তানের অকাল মৃত্যু।

আনডু আর তাঁর ডাক্তার বন্ধুদের দক্ষতা, সেই সঙ্গে সাদাকু ইয়ামামুরার অনন্যসাধারণ গর্ভ, আনডুর পুত্রসন্তানের পুনর্জন্মকে সম্ভব করে তুলবে। সাগরে হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে, ছেলেটার মাথার কয়েক গোছা চুল ছিঁড়ে এসেছিল হাতে। ওগুলো এখনও আনডুর কাছে আছে। ছেলের জেনেটিক ইনফরমেশন হারিয়ে যেতে দেননি তিনি।

আনডুর আসলে বাছাই করার সুযোগ নেই। জীবন বলতে দুনিয়া এখন যা বোঝে সেটার সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে, তাঁর সাহায্য পাক বা না পাক। সেক্ষেত্রে, ছেলের সঙ্গে পুনর্মিলনের সুযোগ গ্রহণ করে দুনিয়ার সমাপ্তিই চাইবেন তিনি–দু'বছর ধরে সে প্রার্থনাই তো করছেন।

কাউরু তাঁকে দোষ দিতে পারছে না। তিনি যে ছেলেকে জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যে কতটা ব্যাকুল, তা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছে ও। এই একই পরিস্থিতিতে ও নিজে কি করত, ভেবে কূল খুঁজে পাচ্ছে না!

আনডুর টিম সাদাকু ইয়ামামুরার একটা নিষিক্ত ডিম তুলে আনল, সেটার নিউক্লিয়াস বদল করল আনডুর মৃত ছেলের সেল থেকে পাওয়া নিউক্লিয়াসের সঙ্গে। এক সপ্তা পর সাদাকুর পেট থেকে জন্ম নিল আনডুর ছেলে।

দুনিয়াটা সাদাকুর কাছে বেচে দিলেন আনডু, দু'বছর আগে হারিয়ে যাওয়া একটা জীবনের বিনিময়ে।

রিং প্রকাশ পেল। খুব দ্রুতই প্রায় বিশ হাজার নারী পাঠিকা গর্ভবতী হলো। তারা প্রত্যেকে সাদাকুর জন্ম দিল। সহযোগিতা পাওয়ায় এক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে সরে যাচ্ছে রিং, আরও বেশি মানুষকে সংক্রমিত করছে, ফলে পুনরুৎপাদন ঘটছে বিস্ফোরণের মতো! দাবাগ্নির গতি নিয়ে পৃথিবীর জেনেটিক কাঠামো একটিমাত্র প্যাটার্নে সীমিত হয়ে পড়ল।

রিং ভাইরাস বুদ্ধিহীন লাইফ ফর্মকেও আক্রমণ করল, গোটা জীবমণ্ডলের জেনেটিক বিচিত্রতা নিঃশেষে মুছে ফেলছে।

বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা হারিয়ে, তার বিনিময়ে জীবন পেল অমরত্বঃ বিশৃংখলার সর্বশেষ কিনারায় পৌঁছে অবশেষে অর্জন করল চূড়ান্ত স্থিরতা।

জীবনের অগ্রগতি মানে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে একের পর এক খাড়া চূড়া পার হওয়া। ওই চূড়াগুলো একবার সরিয়ে নিলে, উপত্যকার মেঝেতে একবার স্বর্গ আবিষ্কার করে বসলে, তারপর সেটাকে স্থায়ী আবাস বলে দাবি করলে, বিবর্তন একটা পাও তুলতে পারবে না।

BanglaBook.org

সেই থেকে লূপের অধিবাসীরা পুনরাবৃত্তিবহুল, অপরিবর্তনীয়, একঘেয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। ওরা উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা হয়ে উঠেছে ক্যানসার।

আনড্রুর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে কয়েকটা কমান্ড টাইপ করল কাউরু। বলা যায়, ও এখন অনেক উঁচু থেকে নীচে তাকিয়ে; প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি এলাকা দেখতে পাচ্ছে, যেন ক্রমশ স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে। ওপর থেকে বিব্রত অবস্থায় জড়োসড়ো লূপের লাইফ ফর্মকে দেখতে চাইছে ও। একা ওগুলো অতি ক্ষুদ্র, একটা দলে সারাক্ষণ মোচড় খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন তাদের যে প্যাটার্ন দাঁড়িয়েছে তা সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যবিবর্জিত এবং অসুন্দর।

তবে এরকম আগেও দেখেছে কাউরু। ইউনিভার্সিটি হসপিটালের প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টে বসে পেট্রি ডিশে ভর্তি ওর বাবার ক্যানসার সেল দেখছিল ও, মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে। ওর মনে আছে ক্যানসার সেলগুলো কি রকম নোংরা আগোছাল চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ওপর থেকে এখন ঠিক ওরকম দেখাচ্ছে লূপকে।

মাথা থেকে হেলমেট ডিসপ্লে খুলল কাউরু, বিড়বিড় করছে।

লূপ ক্যানসারাস হয়ে গেছে।

অবশেষে বুঝতে পারছে কথাটা দিয়ে আসলে ঠিক কি বলতে চাওয়া হয়েছিল। বুঝতে পারছে কীভাবে এটা ঘটেছে।

নয়

সময় সম্পর্কে ওর অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। ওর কোনো ধারণা নেই মাথায় হেলমেট ডিসপ্লে আর হাতে ডেটা গ্লাভ পরে কমপিউটারের সামনে মোট ক'ঘণ্টা বসে আছে। আসল সময় আর লূপের সময় আলাদা, এটা একটা ব্যাপার, আরেকটা বিষয় হলো যে বেযমেন্টে বসে আছে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছুতে পারে না। এখানে এমন কিছু নেই যা ওকে সময়ের প্রবাহ সম্পর্কে একটা ধারণা দেবে।

দাঁড়াতে গিয়ে দেখল পা দুটো কেঁপে উঠল। মনে হলো যেন কয়েক দিন খাওয়াদাওয়া করেনি। অসম্ভব ক্লান্ত বোধ করছে। পানির পিপাসায় ফেটে যাচ্ছে ছাতি।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বুঝল ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। ধাপ বেয়ে বেযমেন্ট থেকে উঠে এল। বাইকের ব্যাগেজ র‍্যাকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো মিনারেল ওয়াটার আছে। পানিশূন্যতা এড়াবার জন্যে প্রথম কাজ ওটার কাছে

BanglaBook.org

পৌঁছুনো।

মরুভূমিতে ভোর হতে যাচ্ছে। বাতাসে হিম। মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা পেল কাউরু। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করল, তারপর এক ঢোকে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল। তাতে লাভ হলো এই যে নতুন করে উপলব্ধি করল সত্যিসত্যি বেঁচে আছে।

এতটা দীর্ঘ সময় লূপ জগতে তাকিয়ে থাকার পর ওর সন্দেহ হচ্ছিল বাস্তব দুনিয়ার কিনারাগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। যে জমিনে বাস করে ও, পায়ের তলায় সেটাকে এখন আর নিরেট লাগছে না। রিয়্যালেটি এবং ভার্চুয়ালিটি ভীতিকর ঝাঁকি দিয়ে ঘন ঘন যুক্ত আর বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

বাইকের সিটে নিতম্ব ঠেকিয়ে বোতলের বাকি পানিটুকু খেলো কাউরু। তৃষ্ণা মিটল। শরীর এখন কথা শুনছে। জানে আশপাশে কেউ নেই, ওখানে দাঁড়িয়েই পেশাব করল। পানিগ্রহণ বা পানিত্যাগ অবশ্য প্রমাণ করে না রক্ত-মাংসসহ ওর একটা অস্তিত্ব আছে।

খালি বোতলটা হাতে, সিঁড়ির মাথায় ফিরে গিয়ে বেযমেন্টের দিকে অর্ধেকটা নেমে একটা ধাপের ওপর বসল। ও নিজের চোখে এইমাত্র দেখেছে লূপ কীভাবে ক্যানসারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কি যেন একটা খুঁত আছে বলে মনে হয়েছে ওর। যেন একটা গল্প। যে-সব ইমেজ দেখেছে, সেগুলো হুবহু বাস্তব জগতের সঙ্গে বদলে নেয়া যায়, কিন্তু তারপরও গোটা ব্যাপারটার মধ্যে অসম্ভব কি যেন একটা আছে।

একটা ভিডিওটেপ তার দর্শককে এক সপ্তা পর মেরে ফেলছে? এ-ধরনের ব্যাপার সহজেই হজম করা যায় একটা ইলেকট্রনিক পরিবেশে। এও সহজ একটা কৌশল, ভিডিওটা যে কপি করবে সে মারা যাবে না। দরকার শুধু প্রোগ্রাম অনুসারে মৃত্যু ঘটানোর জন্যে সঠিক প্যারামিটার সেট করা, নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর নির্ধারিত অ্যাকশন নেয়া হলে ওই মৃত্যুকে এড়ানো যাবে।

সমস্যা হলো, লূপের ভেতর যে-সব পাত্র-পাত্রী বাস করে তারা শুধু তাদের নিজস্ব যোগ্যতা দিয়ে এ-সব তৈরি করতে পারবে না। অন্য ভাষায়, বাস্তব দুনিয়ার সাহায্য ছাড়া টেপটা না সম্ভব তৈরি করা, না সম্ভব ধ্বংস করা।

লূপের ভেতর যতগুলো মৃত্যু ঘটতে দেখেছে কাউরু, বেশিরভাগ ভিডিওটেপ দেখার ফল হিসেবে ঘটেছে।

তারপরও, মনে হলো, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার দরকার ওর। শরীরটা পাথরের মতো ভারি লাগলেও, উঠতে বাধ্য করল নিজেকে। আবার কমপিউটারের সামনে বসল।

ভিডিও দেখাটাই যদি, লূপের ভেতর, মৃত্যুগুলোর ট্রিগার টানার কাজ করে থাকে, তাহলে সেই মুহূর্তগুলোয় একটা চিরনি-অভিযান চালিয়ে দেখা দরকার হবু

BanglaBook.org

ভিক্টিমরা ঠিক কখন ওই ভিডিও দেখেছিল।

তল্লাশি শুরু করল কাউরু। লূপবাসীরা ভিডিও দেখবে, প্রতিটি ঘটনার আগের দৃশ্য চোখের সামনে নিয়ে আসছে ও।

প্রথমে এল চার কিশোরের দল. দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে। চার জোড়া চোখের দৃষ্টি আঠার মতো আটকে আছে টিভির পরদায়। পাহাড়ী এলাকার একটা রিসর্টে, লিভিংরুমে বসে রয়েছে ওরা।

এক কিশোর নিজের ভয় চেপে রেখেছে, হেসে উঠে সঙ্গীদের দিকে তাকাল; তার হাসি আর উচ্ছ্বাস যে জোর করা, বুঝতে কারও অসুবিধে হলো না। তার হাসিতে যোগ দিল না কেউ।

ভিডিও শেষ হওয়ার পর কিশোরীদের একজন মড়ার মতো সাদা মুখে বলল, 'ইইই!' তারপর একদম চুপ।

যে ছেলেটা জোর করে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিল সে ভাবল মেয়েটির গলার ওই শব্দ সবাইকে ভয় পাইয়ে দেবে। তাড়াতাড়ি মুখ খুলল সে। 'আরে, ধ্যাত্, এটা স্রেফ ভুয়া একটা ব্যাপার!'

টিভির পরদা লক্ষ্য করে শূন্যে পা চালাল সে।

'তবে শেষে ওটা কিন্তু খুব বাজে একটা হুমকি,' দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, 'রীতিমতো ভয় লাগে।' যদিও চেহারায় ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। মুখ নয়, যেন মুখোশ, সিগারেটে টান দিয়ে টেপ রিওয়াইন্ড করছে।

তারপর, এটাই যেন একমাত্র করণীয়, সবার চোখের সামনে টেপের ওই অংশটুকু মুছে ফেলল, যেখানে মৃত্যুকে এড়ানোর ফর্মুলাটা লেখা হয়েছে। কেউ তাকে বাধা দিল না বা কিছু বলল না।

'টেপটা আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাই চলো, বন্ধুদের ভয় দেখানো যাবে,' আবার বলল মেয়েটি।

তবে এবার বাধা দিল বাকি ওর তিন সঙ্গী। আজ রাতের পর ওই ভীতিকর জিনিসটার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না ওরা, মেয়েটি যতই ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করুক।

কেন ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ওরা, যেখানে বলা হচ্ছে ওটার সঙ্গে একটা অভিশাপ জড়িয়ে আছে? ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেয়ে মেয়েটি আর কিছু বলল না।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বাকি তিনজন বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে, তবে নির্লিপ্ত চেহারার মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল।

'হ্যালো?'

তার প্রতিক্রিয়া বলে দিল অপরপ্রান্ত থেকে জবাব আসছে না।

'হ্যালো? হ্যালো!' মেয়েটির গলায় বিরক্তি, তবে ক্ষীণ একটা কম্পন ধরা

BanglaBook.org

পড়ল একটা ঢোক গিলে হুকে ঝুলিয়ে রাখল রিসিভার। ঘুরল সে, গলা চড়িয়ে বলল, 'আসলে কী ঘটছে এখানে?'

কাউরুর মনে হলো, কোনো কারণ ছাড়াই বেজে ওঠা ফোনটার চারপাশের শূন্য জায়গা যেন বাঁকা আছে।

এরপর রিসর্টে গিয়ে ভিডিও দেখবে আসাকাওয়া। ওর পরে দেখবে টাকাইয়ামা। এই দুজনকে যেহেতু কাউরু ভিডিওটেপ দেখতে দেখেছে, ওদেরকে বাদ দিয়ে পরবর্তী দর্শকদের বেছে নিল ও।

ওরা আসাকাওয়ার স্ত্রী আর কন্যা।

টেপটা খোলা জায়গায় স্রেফ ফেলে রাখা হয়েছে, দেখতে পেয়ে হাতে নিল তার স্ত্রী। ভিসিআর-এ ঢোকাল, যদিও সবটুকু দেখার ইচ্ছে নেই।

শুরু হলো ওটা।

বাচ্চাটাকে পাশের চেয়ারে বসিয়ে কাপড় ইস্ত্রি শুরু করল মহিলা। তারপর স্ক্রিনের দিকে তাকাল হঠাৎ কি হলো, আর চোখ সরাতে পারছে না। একই অবস্থা তার মেয়েরও। চেয়ারে অটল বসে আছে, টিভির দিকে মুখ করে।

ওটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিভিং রুমে ঝন ঝন করে বেজে উঠল ফোনটা। ভিডিও এখনও সচল, ছুটে লিভিং রুমে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল মিসেস আসাকাওয়া। 'মিসেস আসাকাওয়া বলছি।'

কোনো সাড়া নেই।

'হ্যালো?'

ফোনের রিসিভার আঁকড়ে ধরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল মহিলা। এবং ঠিক আগের মতো, কাউরু দেখতে পেল, ফোনের চারপাশের জায়গা বাঁকা একটা আকৃতি পেয়েছে। জিনিস-পত্র মনে হলো অতি ক্ষীণ ভাঁজ খেয়ে গেছে। সরল রেখা কেঁপে উঠল।

আকৃতির বিকৃতি এখানে এত সামান্য যে সহজে কারও চোখে ধরা পড়বে না, যদি না আপনি জানেন কি খুঁজতে হবে।

এখানে কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে।

কাউরুর হিসেবে এরপর ভিডিও দেখবেন মিসেস আসাকাওয়ার মা-বাবা। কিন্তু ওর হিসেবে ভুল আছে

পরবর্তী দৃশ্য দেখা গেল টাকাইয়ামার অ্যাপার্টমেন্টে। দিন আর সময় চেক করে কাউরু বুঝতে পারল, ও আসলে পৌঁছে গেছে টাকাইয়ামার মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে।

টাকাইয়ামা ভিডিওটা দেখছিল, এই সময় মারা গেছে।

BanglaBook.org

দৃশ্যটা একটু পেছাল কাউরু। এখন খুঁটিয়ে দেখতে পারছে, বিচলিত করতে পারে এমন মৃত্যুর ভয়ে না থেকে।

নিজের ডেস্কে বসে আছে টাকাইয়ামা, একমনে কি যেন লিখছে। মাথাটা নুয়ে আছে, ভঙ্গিটা যেন বসে বসে ঝিমোচ্ছে হঠাৎ তার কাঁধ দুটো কেঁপে উঠল, লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে। তার ঘাড়ের পেশি টান টান হয়ে আছে, খাড়া হয়ে গেছে মাথার সব চুল। পেছন থেকে দেখে কৌতুক জাগানো একটা চরিত্র বলে মনে হচ্ছে তাকে।

ডিসপ্লেটা কোনদিকে রাখবে, নিজের সঙ্গে তর্ক করছে কাউরু। ওটা কি টাকাইয়ামার পিঠে ফোকাস করবে, নাকি তার সচেতনতার সঙ্গে জুড়ে দেবে?

আরও কিছুক্ষণ টাকাইয়ামার পেছনে ঘুরঘুর করার পর কাউরু সিদ্ধান্ত নিল, এবার সোজাসুজি তার ওপর ভর করা যায়। ওর নিজের সচেতনতা টাকাইয়ামার সচেতনতার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল।

টাকাইয়ামা বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। তার মন বলছে, শরীরে কিছু একটা ঘটছে। মৃত্যু প্রায় সমাগত, সেদিক থেকে বিচার করলে যথেষ্ট শান্ত দেখাচ্ছে তাকে, তবে খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে একসঙ্গে অনেকগুলো বিষয় মেলাতে চেষ্টা করছে সে। তার মাথায় অনেক প্রশ্ন জড়ো হয়েছে।

আমি কি তাহলে ভিডিওর ধাঁধা সমাধান করতে পারিনি?

যদি পেরে থাকি, তাহলে আসাকাওয়া এখনও বেঁচে আছে কেন?

এক কোনে রাখা ভিসিআর-এর দিকে তাকাল টাকাইয়ামা। টেপটা এখনও ওটার ভেতরে। ক্রল করে সেদিকে যাচ্ছে সে। হৃৎপিণ্ড যেন পাঁজরে হাতুড়ির বাড়ি মারছে। একচুল নড়তে গেলেও প্রচণ্ড ব্যথায় জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

কাউরু খুব ভালো করে জানে টাকাইয়ামার শরীরে কি ঘটছে। তার করোনারি আর্টারিতে একটা সার্কোমা তৈরি হয়েছে, এখন সেটা রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে। এই মুহূর্তে সে যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সেটা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ, খানিক খুন করবে পর তাকে।

ভিসিআর থেকে টেপটা খুলে নিয়ে পরীক্ষা করছে টাকাইয়ামা।

কাউরু জানে না কি ভাবছে সে।

টাকাইয়ামা কাঁপা কাঁপা হাতে টেপটাকে শক্ত করে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। ওটার মাথার দিকে তাকাল, তলার দিকে তাকাল, তারপর শিরদাঁড়ায় ছাপা লেখাটা পড়ল। দরদর করে ঘামছে সে।

সিলিংয়ের ওপর দ্রুত চোখ বুলাল টাকাইয়ামা, চোখ বুলাল জানালার বাইরে, দেয়ালের গায়ে, বুকশেলফে। কি যেন খুঁজছে সে।

অবশেষে হাতে ধরা টেপে ফিরে এল তার দৃষ্টি।

পরিষ্কার বোঝা যায় টাকাইয়ামা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে–তবে তার কারণ

BanglaBook.org

বুকের ব্যথা নয়। যে উত্তেজনায় তার হাত দুটো কাঁপছে, সেটা তাকে নিজের কথা ভুলিয়ে দিল।

ভিসিআর-এ টেপ ঢুকিয়ে প্লে বাটনে চাপ দিল সে।

ও মরতে যাচ্ছে। তাহলে টেপ দেখতে চাইছে কেন?

কাউরুর সামনে টেপের পরিচিত দৃশ্য আসতে শুরু করল।

নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল টাকাইয়ামা। ওটা খুলে ডেস্কের ওপর রেখেছে সে, বাজে ৯:৪৮।

ক্রল করে ফোনের দিকে এগোচ্ছে সে, মেঝেতে পড়ে রয়েছে সেটা। তার মরিয়া ভাব ধরতে পারছে কাউরু। তবে কি টাকাইয়ামা শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচানোর কোনো উপায় খুঁজে পেয়েছে?

রিসিভার তুলে তাড়াতাড়ি ডায়াল করছে সে। চারবার রিং হওয়ার পর একটা নারীকণ্ঠ সাড়া দিল।

'হ্যালো?'

এই কণ্ঠস্বর কাউরুর চেনা। এটা মাই টাকানো কথা বলছে। তাহলে, এরমানে, টাকানোর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ থাকা অবস্থায় মারা যাবে টাকাইয়ামা। তার সর্বশেষ চিৎকার শুনতে পাবে সে।

রিসিভার কানে চেপে ধরা, টাকাইয়ামা এখনও টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে। একটা লিড কন্টেইনারের চারদিকে ঘুঁটি উথলাচ্ছে, সংখ্যাগুলো ধরা পড়ছে চোখে–এক থেকে ছয় পর্যন্ত।

চেঁচিয়ে উঠল টাকাইয়ামা। তার চিৎকার টেলিফোনের তার হয়ে পৌঁছে গেল টাকানোর কানে।

'হ্যালো? হ্যালো?'

টাকাইয়ামাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন, উত্তর পাবার আশায় রয়েছে মাই।

কিন্তু টাকাইয়ামা নিজেই যোগাযোগ কেটে দিল, রিসিভারটা ঠকাস করে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।

সেই মুহূর্তে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে পেল সে। মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হয়ে কাউরু ভাবল ডিসপ্লেতে ও নিজের ছবি দেখতে পাচ্ছে। টাকাইয়ামার রেটিনা ফোকাস হারাতে শুরু করেছে, কাজেই টেলিভিশনের পরদা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না কাউরু। ওর হৃদ্‌পিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে, সেই সঙ্গে ওর রক্তনালীর ওপর চাপ এত বেড়েছে যে চামড়ার ওপর এখানে সেখানে খুদে ঢেউ তৈরি হচ্ছে।

টাকাইয়ামার দৃষ্টি, ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমশ, ভিসিআর-এর আশপাশে স্থির। অল্প একটু ধোঁয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে ওখানে, অলস ভঙ্গিতে পাক খাওয়া একটা সিলিন্ডারের মতো আকার নিচ্ছে সেই ধোঁয়া। শূন্য জায়গা মোচড় খাচ্ছে, ন্যাকড়া

BanglaBook.org

নিংড়ানোর মতো।

ফোনটা *ঠেলে* ওই বাঁকা শূন্য জায়গাটার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে টাকাইয়ামা, সেই সঙ্গে আরেকটা নম্বরে ডায়াল করছে।

চোখ নামিয়ে নীচে তাকাল কাউরু, নম্বরটা দেখার চেষ্টা করছে।

তবে সেজন্যে ফোনের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। সংখ্যাগুলো টিভির পরদায় ফুটে আছে। ঘুঁটিতে...

...৩৩২৫৪১৩৬২৪৫১৬৩৪২৩৪২৫৪১৩৬২৪৫১৬৩৪৩৪৩২৫৪১৩৬২৪৫১৬৩৪১৩৩২৫৪১৩৬২৪৫১৬৩৪২৩৪২৫...

টাকাইয়ামা আলাদা কোনো নম্বরে ডায়াল করছে না, পরদায় যা ফুটছে, সেটাই ফোনে টিপছে।

মৃত্যুর মুখে পৌঁছে গেছে সে, তাই হয়তো যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, ভাবল কাউরু।

এই সময় ওর স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল। কমপিউটারের পাশে রেখেছিল ওটা। বার কয়েক রিং হওয়ার পর খেয়াল করল কাউরু—বুঝতে পারল, এটা সত্যিকার আওয়াজ, টাকাইয়ামার অ্যাপার্টমেন্টের ফোন থেকে আসছে না।

ফোনটা তুলল কাউরু, হেলমেট ডিসপ্লে সরাল একপাশে, ওটা যাতে কানে ঠেকাতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পেল কাউরু; এত ক্ষীণ, যেন মনে হলো যেকোনো মুহূর্তে থেমে যাবে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, তবে একটা ছন্দ আছে, ডিসপ্লে থেকে যেটা আসছে সেটার সঙ্গে তাল মেলানো।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না কাউরু। এরপর শুনতে পেল একটা পুরুষকণ্ঠ, অটোমেটিক ট্রান্সলেইশন ডিভাইসের ভেতর দিয়ে আসায় ওটার মান বদলে গেছে।

'আপনি ওখানে আছেন? এই যে! আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আমি চাইছি আমার জন্যে একটা কাজ করবেন আপনি। আপনি যেখানে রয়েছেন, ওখানে আমাকে নিয়ে যান। আমি আপনাদের দুনিয়ায় যেতে চাই। এ থেকে আমি আর আপনাকে পালাতে দেব না।'

কাউরু হতভম্ব ডিসপ্লেতে টাকাইয়ামার বাঁ হাত দেখতে পাচ্ছে ও, টেলিফোন ধরে আছে। কোনো সন্দেহ নেই, ফোনটা সে-ই করছে এবং কাউরু স্বয়ং, এখানে এবং এখন, ওই কল রিসিভ করছে।

অবশ্যই হতভম্ব কাউরু। ওর মনে হলো ও-ই যেন ওকে ডাকছে।

লূপ থেকে তুমি বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার না।

BanglaBook.org

কাউরু বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আগে বিচ্ছিন্ন করে দিল যোগাযোগ। তবে, তারপরও টাকাইয়ামা গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও।

আপনার জায়গায় নিয়ে যান আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে নয়, তার এই কথার অর্থ কয়েক মিনিট পর ঢুকল কাউরুর মাথায়।

দশ

নিজের সাজানো যুক্তি বারবার খুঁটিয়ে দেখল কাউরু। তবে, সবশেষে, বুঝল নিজের থিয়রি পরীক্ষা করে দেখার একটাই মাত্র উপায় আছে।

প্রথম কাজ প্রফেসর অ্যামানোর সঙ্গে যোগাযোগ করা। তাঁকে অনুরোধ করতে হবে: রিং ভাইরাসের ডিএনএ বিশ্লেষণ করুন, তারপর সেটা তুলনা করুন এমএইচসি ভাইরাসের জেনেটিক সিকোয়েন্সের সঙ্গে।

খুব সহজ একটা কাজ এটা, কেননা এমএইচসি ভাইরাসের সিকোয়েন্স আগেই বের করা হয়েছে। ওই বিশ্লেষণের একটা কপি নিজের কাছে রেখে দিয়েছে কাউরু। রিং ভাইরাস একবার বিশ্লেষণ করা হয়ে গেলে খুব সহজেই মিলিয়ে দেখা যাবে ওটার সঙ্গে।

ওর ধারণা রিং ভাইরাসের জেনেটিক সিকোয়েন্স কোনোভাবে বাইনারি কোড থেকে এটিজিসি [ATGC] বেইস কোডে রূপান্তরিত করা হয়েছে একটা কমপিউটার তা চোখের পলকে করতে পারে।

কাউরু ভাবল, প্রফেসর অ্যামানোর জবাব পেতে একটু বোধহয় দেরি হবে, এই সময়টা একটু ঘুমিয়ে নেয়া যায়। মোটরসাইকেলের পেছন থেকে প্যাকটা খুলল, স্লিপিং ব্যাগ বের করে বেযমেন্টের মেঝেতে ভাঁজ খুলল সেটার, ডেস্কের ঠিক পাশে।

নতুন একটা বোতল থেকে পানি খেলো, সামান্য কিছু খাবারও পেটে দিল, তারপর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে চোখ বুজল।

দু'ঘণ্টা পর জ্যান্ত হলো কমপিউটার। ডিসপ্লে মিটমিট করছে, স্পিকার থেকে একটা সংকেত বেরোচ্ছে।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে ডেস্কে বসল কাউরু। মাত্র দু'ঘণ্টার ঘুম, তাতেই ঝরঝরে তাজা লাগছে শরীর। পরিষ্কার মাথা নিয়ে প্রফেসর অ্যামানোর পাঠানো রিপোর্টের মুখোমুখি হতে পারবে।

ডিসপ্লেতে রিং ভাইরাসের সঙ্গে এমএইচসি ভাইরাস একটা তুলনা আলোকিত হয়ে উঠল। দুটোর মধ্যে কি মিল, সেটা চিহ্নিত করা হয়েছে। মিলগুলো খুব কম

BanglaBook.org

নয়–মোটেও অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না।

এতটা মিলে যাওয়ায়, দুটোকে একই ভাইরাস বলে ধরে নিতে হয়, কিংবা এটা বলা আরও সঠিক হবে যে ওগুলো আদিতে একই ছিল, তবে রূপান্তরিত হয়ে আলাদা প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে।

কাউরুর এই উপসংহারে পৌঁছুতে পারা নিরাপদ বলে মনে হলো যে মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে রিং ভাইরাস থেকে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে কমপিউটার থেকে পিছিয়ে এল কাউরু, ডেটায় ভর্তি হয়ে আছে ওটার ডিসপ্লে।

ওর মনের একটা অংশ বলছে এটা একজন বোকার থিয়রি, হোক সেটা নিজের। সমস্ত কাণ্ডজ্ঞানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। যুক্তির মালায় কোথাও কোনো খুঁত নেই, সেখান থেকে অন্য কোনো অর্থ আসছে না।

কিন্তু তারপরও খুঁত খুঁত করছে ওর মন।

যুক্তির পথে থাকো, নিজেকে চোখ রাঙাল কাউরু। গ্রহণক্ষমতা বাড়ানোর সময় এখন, নির্দিষ্ট আইডিয়া ধরে বসে থাকার সময় নয়।

নিজেকে কাউরু টাকাইয়ামা হিসেবে কল্পনায় ধরার চেষ্টা করল, চিন্তা করছে স্বাভাবিক নিয়ম ধরে কি ঘটেছে তার কপালে। মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থান করছিল সে। জীবিত এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে মৃত্যুকে এড়াবার চেষ্টা করবে না। আদিম একটা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বোঝাপড়া চলছিল তার।

কাউরুর মনে একটা উপমা পরিষ্কার হতে যাচ্ছে।

টাকাইয়ামা এটা অন্তর্জ্ঞানবলে উপলব্ধি করেছিল, ঠিক মারা যাওয়ার আগে, তাই না?

সেটাই তার লাফ দেয়ার পয়েন্ট। টাকাইয়ামা উপলব্ধি করেছিল "এটা", উপলব্ধি করেছিল পুরো ব্যাপারটাই। ওটাই মূল চাবিকাঠি।

টাকাইয়ামা, লূপের একজন অধিবাসী, সবকিছু বুঝতে পেরেছিল।

ওটা ধরে নিয়েই এগোয় টাকাইয়ামা।

সন্দেহ নেই, টাকাইয়ামা এভাবে চিন্তা করছিল: আমি কেন মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, আসাকাওয়া যেখানে দিব্যি বেঁচে আছে? এই সপ্তায় নিজের অজান্তে কি সে করল, যা আমি করলাম না?

এই পর্যায়ে টাকাইয়ামা উপলব্ধি করেছিল ভিডিওটেপটা কপি করাই মৃত্যুকে এড়াবার একমাত্র উপায়। আসাকাওয়া তাকে টেপটার একটা কপি করে দিয়েছে, আর সেজন্যেই সে মারা যায়নি।

তবে শুধু এই একটা ব্যাপারই উপলব্ধি করেনি টাকাইয়ামা। এখন তার কাছে একটা থিয়রি আছে: ভিডিওটেপ এমন ব্যবস্থা করে যাতে এক সপ্তা পর একজন মারা যাবে, কেউ একজন যেভাবে ভিসিআর সেট করে সেটা যাতে একসময় নিজে

BanglaBook.org

থেকেই চলে, এবং ভিডিওটেপটা কপি করলে ঘটনাটা ঘটবে না

টাকাইয়ামা তার থিয়রিটাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে চেয়েছিল: নতুন একটা প্রশ্ন নিয়ে মেতে ওঠে সে। গোটা ব্যাপারটা সম্ভব হচ্ছে কীভাবে? জানা দরকার কি থেকে কি হচ্ছে।

'পৃথিবী একটা কাল্পনিক বিস্তৃতি [স্পেস]?'

নিজের জগতে এরকম একটা ধারণা নিয়েই বাস করে সে।

তার দুনিয়া যদি কাল্পনিক হয়, একটা ভার্চুয়াল রিয়্যালেটি, তাহলে কারও বোধবুদ্ধিহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করা খুবই সম্ভব, এবং একইভাবে সম্ভব সেই ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয়া। ব্যবস্থাটা তাহলে করছে কে? সবচেয়ে প্রভাবশালী যিনি, যিনি ভার্চুয়াল দুনিয়াটা সৃষ্টি করেছেন

ঈশ্বর

টাকাইয়ামার মাথায় শব্দটা আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে। তবে একটা দুনিয়া বানিয়ে সেটাকে চালু করা একজন ঈশ্বরের কাজ। লূপের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর স্বয়ং।

কাজেই টাকাইয়ামা, মৃত্যুর ঠিক আগে, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল। সেজন্যে তার দরকার ছিল–বাস্তবতা বলতে যা সে বোঝে এবং ঈশ্বরের দুনিয়া, এ দুটোর মাঝখানে একটা যোগসূত্র। মরিয়া হয়ে এই যোগসূত্রটা খুঁজেছে সে।

আর সেজন্যেই তার দৃষ্টি কামরার চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে– সিলিংয়ে, জানালায়, দেয়ালের গায়ে, বুকশেলফে। সরু একটা সুতো খুঁজছিল, যেটা তার দুনিয়া আর সেই দুনিয়ার ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে।

সন্দেহ নেই ভিডিওটেপটাকে একমাত্র সম্ভাবনা হিসেবে দেখতে পাচ্ছিল সে। যদি একটা ভিসিআর-এ ঢুকিয়ে টেপটা দেখলেই নিজের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেয়া যায়, তাহলে হয়তো সেটাই যোগসূত্র, কিংবা হয়তো সেটা তাকে যোগসূত্রের পথ দেখাবে। ফটকের কাছে বাঁকা হয়ে থাকা শূন্য জায়গা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে সে।

টাকাইয়ামা সিদ্ধান্ত নিল ভিডিওটেপের ওপরই সব বাজি ধরবে।

প্লে লেখা বোতামে চাপ দিল সে। পরদায় ছবি ফুটে উঠল। তার বুক কাঁপছে–জানা নেই তার অনুমান আর উপলব্ধি যদি সঠিক হয়ও, মৃত্যুকে এড়াবার মতো যথেষ্ট সময় হাতে আছে কিনা।

টাকানোকে ফোন করল সে। কিন্তু সারাক্ষণ তার চোখ চুম্বকের মতো আটকে আছে স্ক্রিনে। টেলিভিশন ওকে দেখাচ্ছে একটা লিড কন্টেইনারের চারদিকে চক্কর মারছে অনেকগুলো ঘুঁটি। ওর চোখে এক থেকে ছয় পর্যন্ত সংখ্যা ধরা পড়ছে।

একটা চিৎকার করল টাকাইয়ামা, তবে সেটার কারণ তার মৃত্যুযন্ত্রণা নয়। সে উপলব্ধি করেছে ঘুঁটিগুলো একই সংখ্যা বার বার দেখাচ্ছে।

BanglaBook.org

...৩৩২৫৪১৩৬২৪৫১৬৩৪২৩৪২৫৪১৩৬২৪৫১৬৩৪৩৪৩২৫৪১৩৬২৪৫১৬
৩৪১৩৩২৫৪১৩৬২৪৫১৬৩৪২৩৪২৫...

সে যদি তিনটে নম্বর, অর্থাৎ ১৩৩, ২৩৪, আর ৩৪৩ তুলে নেয়, টাকাইয়ামা উপলব্ধি করল, ঘুঁটিগুলো বিরতিহীন তেরো ডিজিটের একটা মালা বারবার দেখিয়ে যাচ্ছে: ২৫৪১৩৬২৪৫১৬৩৪।

টাকাইয়ামা, জেনেটিক সিকোয়েন্সিং সম্পর্কে জ্ঞান থাকায়, বুঝতে পারল এই তিনটে নম্বর হলো স্টপ কোড। টাকানোর সঙ্গে যোগাযোগ কেটে দিল সে, মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ডায়াল করল ডিজিটগুলো। যোগাযোগ স্থাপিত হলো, পরিক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে। লূপ থেকে সরাসরি বাস্তবতার নাগাল পাওয়া সম্ভব হলো। যেই মাত্র বুঝতে পারল পরম গুরুত্বপূর্ণ কারও নাগাল পাওয়া গেছে, অমনি নিজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল টাকাইয়ামা।

আপনার জায়গায় নিয়ে যান আমাকে।

জোরাল একটা অনুরোধ, যেকোনো বিজ্ঞানী এই একই অনুরোধ করতেন। যতটা মৃত্যুকে এড়াতে, তারচেয়ে আরও মহৎ কিছু অর্জন করার আশায়। জগতকে পেছনে ফেলে সীমাহীন বাইরে বেরোতে পারা, যে বাইরেটা তার জগতকে তৈরি করেছে, তারপর বুঝতে পারা মহাবিশ্ব কীভাবে কাজ করে, সেটার বিধি-বিধান, কে চালায়।

এটা কাউরুরও পুরোনো একটা স্বপ্ন।

টাকাইয়ামার স্বপ্ন পূরণ হত, সে যদি লূপ থেকে বেরিয়ে কাউরুর জগতে চলে আসতে পারত। লূপ কি নিয়ম-নীতিতে চলে, সব সে জানতে পারত। সে জানত লূপ প্রাণীদের সামনে যেমন মহাবিশ্বের কিনারা ছিল, সামনে সেরকম একটা মহাবিশ্বের কিনারা আছে। সে শিখত মহাবিশ্ব তৈরি হওয়ার আগে সময় আর বিস্তৃতি কেমন ছিল। সে জানতে পারত, সংক্ষেপে, সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর।

আপনার জায়গায় নিয়ে যান আমাকে।

প্রথমবার শুনলে শিশুসুলভ আকাঙ্ক্ষা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কাউরু ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে। সত্যি হলো, ওরও এই একই আকাঙ্ক্ষা। যদি কোনো ঈশ্বর থেকে থাকেন, যিনি দুনিয়াটার নকশা তৈরি করেছেন, ও খুবই চাইবে তাঁর দুনিয়ায় যেতে পারুক, এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করুক।

আবার, তাহলে, লূপ জগৎ।

ফোনটা করার পরপরই মারা গেছে টাকাইয়ামা, মনিটরে দেখা গেছে সেটা। কাউরু যেমন তার অনুরোধ সম্পর্কে জেনেছে, তেমনি লূপের অপারেটরদের মধ্যে থেকেও কেউ নিশ্চয় তা শুনেছে।

ওই শ্রোতা তাহলে কী করেছে?

টাকাইয়ামার আকাঙ্ক্ষা কি পূরণ করেছে সে?

BanglaBook.org

টাকাইয়ামার অন্তর্জ্ঞান বিস্ময়কর, সে শুধু ডিডিওর ধাঁধার সমাধান বের করেনি, এটাও উপলব্ধি করেছে যে তার দুনিয়া একটা ভার্চুয়াল দুনিয়া।

হতে পারে ওই ক্ষমতাগুলো সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিল কেউ।

হন্যে হয়ে ওর চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান ভাণ্ডারে তল্লাশি চালাচ্ছে কাউরু, দেখছে কোনো একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, যার সাহায্যে বাস্তব দুনিয়ায় পুনর্জন্ম পেতে পারে টাকাইয়ামা।

পেতে পারে বা পেয়েছে।

শুধুমাত্র ম্যালিকিউলার ইনফরমেশন বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তার পুনর্সৃষ্টি অসম্ভব, যেগুলো লূপে তার শরীর বানিয়েছে। তবে প্রোগ্রামটার মেমোরিতে তার জেনেটিক ইনফরমেশন তুলে রাখা আছে, সেটাকে ব্যবহার করা সম্ভব হলে বাস্তব দুনিয়ায় তার জন্ম দেয়ার একটা পথ খুলে যেতে পারে।

দু'হাজার মেগাবেইসিস সেট পর্যন্ত বানানো সম্ভব। জিনোম সিনথেসাইজার, যেগুলো ক্রোমাটিন কাঠামো পুনরুৎপাদন সম্ভব করে তোলে, চলতি শতাব্দীর শুরুতেই ডেভলপ করা হয়েছে। এর কিছুদিন পরই একটা টেকনিক আবিষ্কৃত হয়, জিএফএএম [GFAM: জিনোম ফ্রাগমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট মেথড] নামে পরিচিত, যেটা এই টুকরোগুলোকে জোড়া লাগার সামর্থ্য যোগায়। তার ফল হিসেবে, একজন মানুষের সমস্ত ক্রোমজোম পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব।

প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে মানুষের একটা নিষিক্ত ডিমকে প্রস্তুত করা। তারপর ওদেরকে সেটার নিউক্লিয়াস সরাতে হবে, তার জায়গায় ভরতে হবে ক্রোমজোম, যেগুলো ওরা টাকাইয়ামার জেনেটিক ইনফরমেশনের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করেছে ডিমটাকে ওরা স্বাগতিক মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপিত করবে। ন'মাস পর পৃথিবতে জন্ম নেবে টাকাইয়ামা। অবশ্যই একটা শিশু হবে সেটা। তবে, প্রজনন-শাস্ত্র অনুসারে ওই বাচ্চা হবে টাকাইয়ামা।

এটা করা যেতে পারে। তবে এতে হিসেবের গরমিল হয়ে যাওয়ার ভয় লুকিয়ে আছে। সত্যি যদি কেউ টাকাইয়ামা পুনর্সৃষ্টি করে থাকে, নারী হোক বা পুরুষ, একটা মূল ব্যাপার সে ভুলে গেছে।

টাকাইয়ামা রিং ভাইরাস বহন করছে। জিনোম সিনথেসাইজার যখন তার মলিকিউল পুনর্নির্মাণ করবে, পার হয়ে যাবে ওই ভাইরাসও। রিং ভাইরাস আর এমএইচসি ভাইরাসের মধ্যে যে মিল দেখা যায়, এটাই তার একমাত্র ব্যাখ্যা।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ওই মিল নিজেই প্রমাণ করছে টাকাইয়ামা বাস্তব দুনিয়ায় পুনর্জীবন লাভ করেছে। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে বোধগম্য ব্যাখ্যা: তার পুনর্জন্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে কোথাও, কেউ একজন সূক্ষ্ম পরিবর্তিত আকৃতিতে রিং ভাইরাস ছেড়ে দিয়েছে।

তাহলে কে টাকাইয়ামাকে ডেকে আনল?

BanglaBook.org

তা কাউরুর জানা নেই। কি আশা পূরণের জন্যে কে কাজটা করেছে তাও ওর জানা নেই। একটা ভার্চুয়াল অস্তিত্বকে বাস্তব দুনিয়ায় নিয়ে এসে কার কী লাভ হতে পারে?

ছেলেবেলায় ভিডিও গেইম খেলেছে কাউরু। সত্যিকথা বলতে হলে, মেতে উঠত না, বরং একটু খেললেই ক্লান্ত বোধ করত। খেলার রাজকুমার আর রাজকুমারীর চেহারাগুলো স্মরণ করল ও–থ্রিডি কমপিউটার গ্রাফিক্স। সত্যিকার মানুষের চেয়ে পরিষ্কার আলাদা, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওখানে কিছু নারী চরিত্র ছিল যাদেরকে সত্যি সত্যি আশ্চর্য সুন্দর মনে হত ওর। এটা যেন সেরকম কিছু একটাকে জ্যান্ত করে তোলা। এবং ওই নারী যে কমপিউটার ভাইরাস বহন করছে সেটাকে বাস্তব বায়োলজিক্যাল ভাইরাস হিসেবে দুনিয়ার বুকে ছেড়ে দেয়া।

এভাবে চিন্তা করলে ব্যাপারটাকে অসম্ভব মনে হচ্ছে। কিন্তু লূপের মতো এতটা সুফিসটিকেটেড কমপিউটার সিম্যুলেশন পৃথিবী আর দেখেনিঃ এটা মনে রেখে কাউরু সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিতে পারছে না। থিয়রির পর্যায়ে, অন্তত, এটা সম্ভব।

তাহলে টাকাইয়ামা এখন কোথায়, কী করছে?

কাউরুর মনে হলো এখন বোধহয় সত্যের কাছাকাছি হচ্ছে ও। সর্বশেষ যোগাযোগে কেনেথ রথম্যান প্রফেসর অ্যামানোকে কি বলেছেন মনে পড়ে যাচ্ছে ওরঃ *এমএইচসি ভাইরাসের উৎস জানা গেছে। আর তার চাবিটা আছে টাকাইয়ামার কাছে।*

কাউরু নিজেই এখন ব্যাপারটা বিশ্বাস করছে।

এগারো

ধাপ বেয়ে বেযমেন্ট থেকে ওঠার সময় মনে হলো কমপিউটারে সাংঘাতিক একটানা কয়েক বছর কাটিয়েছে ও। সূর্য সরাসরি মাথার ওপর, আর তাপ পৃথিবীকে ভাজা ভাজা করছে। বিস্তৃতি আর আলো প্রসঙ্গে বলা যায়, বেযমেন্ট আর এই জায়গার মধ্যে দুনিয়ার পার্থক্য।

কাউরু অনুভব করল ওর শরীর বদলে গেছে, তার কারণ সম্ভবত অনেকগুলো জীবনে বাঁচতে হয়েছে ওকে। তবে বাস্তবে কমপিউটারে সময় কাটিয়েছে মাত্র বিয়াল্লিশ ঘণ্টা। ও আসলে বেশ ঘন একটা সময়ের ভেতর দিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

মোটর সাইকেলের গ্যাস ট্যাংকের গায়ে মিহি ধুলো জমেছে। নালার ভেতর বেশ জোরাল বাতাস বয়ে যাচ্ছে, ভাঙাচোরা বাড়ি-ঘরের ফাঁক গলার সময় বাঁশী বাজার মতো আওয়াজ করছে। চারদিকে ধুলো আর বালি। ট্যাংকের গায়ে মিহি ধুলো প্রমাণ করে বেযমেন্টে কত অল্প সময় ছিল ও।

বাইকে উঠে স্টার্ট দিল কাউরু।

পরিষ্কার ধারণা আছে এখন কোথায় যাওয়া উচিত ওর। নালাটাকে পাশে রেখে পশ্চিমে ছুটছে বাইক, তারপর ঝরনাসহ একটা পাহাড় টপকাল, সামনে পড়ল লম্বা দুটো চূড়া।

থামল ও।

কাউরু জানে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় এখন ওর উচিত হবে উন্নতমান শক্তির ওপর নির্ভর করা, এবং তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা। এটা পরিষ্কার, কিছু বা কেউ অবশ্যই নাক গলাচ্ছে।

ঠিক কখন শুরু হয়েছে, এই নাক গলানো? ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তা হয়তো দশ বছর ধরে জানা আছে তার, সেই যখন থেকে ওদের পরিবার এখানে বেড়াতে আসার কথা ভাবছে। হয়তো দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি করা প্ল্যানটা এখন শুধু কার্যকর করছে সে।

যাওয়া যাক।

হ্যান্ডেলবার শক্ত করে ধরল কাউরু, দ্রুত একটা ইউ-টার্ন নিল, ফেলে আসা পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে।

ওর প্ল্যান হলো প্রধান সড়কে ফিরে একটা হোটেল খুঁজে বের করা, যেখানে বিশ্রাম নিতে পারবে, ট্যাংকে গ্যাস ভরা যাবে, সংগ্রহ করা যাবে রসদ। তারপর মরুযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে, সেই রাস্তা ধরে যেটা আদৌ কোনো রাস্তা নয়।

ওয়েন'স রক ত্যাগ করার দুদিন পর, অবশেষে হাইওয়ে ছেড়ে মরুভূমিতে নামল কাউরু।

সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে দশ মাইল এগোল। সামনে পড়ল মাঝারি একটা পাহাড়, সেটার পাশ বেয়ে ছুটল ওর মোটরসাইকেল।

যত ওপরে উঠছে ততই জমাট বাঁধছে নীরবতা। ঝরনার প্রবাহ সরু হয়ে এল, কানে আসছে গাছাপালার চাপা ফিসফিসানি। এখানে ঝোপ-ঝাড় বেশ স্বাস্থ্যবান, মনে একটা তাজা ভাব এনে দিচ্ছে।

গাছপালার নিঃসরণ আলতো স্পর্শ করছে ওর ত্বক। এগিয়ে যাচ্ছে ও—আরও উঁচুতে, নীরবতার আরও গভীরে।

মরুভূমির মাঝখানে এত সবুজের সমারোহ আশা করা যায় না।

তারপর যখন উপত্যকাটা চোখে পড়ল, ঠিকভাবে আন্দাজ করতে পারল না

BanglaBook.org

ওটা আসলে কত বড়। তবে একেবারে কাছে চলে আসায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ বা ঝোপ নয়, পুরোদস্তর একটা জঙ্গল দেখতে পাচ্ছে–পুরোটাই জায়গা করে নিয়েছে বিশাল এক গিরিখাদের ভেতরে।

গাছপালা শুধু খাদের ভেতর দিকের ঢালে জন্মেছে, চারদিকের বাকি অংশ শুকনো খয়েরি মরু, এত গভীর উপত্যকায় লুকানো যে ওর সন্দেহ হলো আকাশ থেকে এই বনভূমি দেখতে পাওয়া যায় কিনা।

গাছপালার মাঝখান থেকে মাথাচাড়া দিয়ে আকাশ চিরে ফালা ফালা করেছে অসংখ্য এবড়োথেবড়ো বোল্ডার। এই বাইক নিয়ে আর এগোনো সম্ভব নয়। জমিন ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা পাথর জোড়া লেগে একটা শাখা নদীকে এগোবার পথ করে দিয়েছে, আরও সরু হতে হতে দূরে হারিয়ে গেছে পানির স্রোত, সেটার কিনারা ধরে যাচ্ছে কাউরু।

এবার ওকে বাইক থেকে নামতে হবে।

গাছপালা ঘেরা একটা ঝোপের গায়ে আস্তে করে ওর বাহনকে শুইয়ে রাখল কাউরু। ওটার পেছন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস ভর্তি প্যাকটা নিয়ে কাঁধে ঝোলাল। রাইডার বুটের বদলে পায়ে গলাল স্নিকার তারপর চারদিকে চোখ বুলাল, জায়গাটা চিনে রাখছে, আবার যাতে খুঁজে বের করতে পারে।

বাকি পথ পাড়ি দেয়ার জন্যে নিজের পা দুটোর ওপর ভরসা করতে হবে ওকে।

মাঝে মধ্যে থেমে বিশাল গিরিখাদের মাথার দিকে তাকাচ্ছে কাউরু, পাহাড়ী ঝরনার খরস্রোতা একটা প্রবাহ মাটি আর পাথর খুঁড়ে তৈরি করেছে এটাকে। সেই প্রবাহই এখন ওর রাস্তা চিহ্নিত করছে।

এই ক্যানিয়ান তৈরি হতে কত হাজার বছর লেগেছে, কয়েক হাজার গজ গভীর? কি রকম সময় আর শক্তি ব্যয় হয়েছে, ভাবতে গিয়ে ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

অগুণতি বছর আর অগুণতি পুনরাবৃত্তি। টোকিওতে কাউরু যে আকাশছোঁয়া বাড়িতে থাকে, এই উপত্যকায় সেটাকে অনায়াসে বেমালুম লুকিয়ে ফেলা যাবে। ওটা তৈরি করতে তিন বছর সময় লেগেছে। কিন্তু এই উপত্যকা–এটা তৈরি হতে সময় লেগেছে হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ বছর; এবং এখনও নিজের কাজ শেষ করেনি পানির প্রবাহ, একটু একটু করে চালিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমে এখন সূর্য ডুবছে। ভেতরে ঢোকা রোদ এখন গিরিখাদের গা বেয়ে ওপর দিকে উঠছে, উপত্যকার পাশগুলো চাটছে যেন প্রকাণ্ড একটা প্রাণীসত্তা

এক পাথর থেকে আরেক পাথরে, লাফ দিয়ে পার হচ্ছিল কাউরু। হঠাৎ একবার থামল, পাথরের কিনারায় বসে দু'হাতের আঁজলা ভরে ঝরনার পানি খেলো। খুব ঠাণ্ডা! আহ্, কি শান্তি। গলা বেয়ে পেটে নেমে যাওয়াটা অনুভব

BanglaBook.org

করল। পাশে এই শাখা ঝরনা পাওয়া একটা উপরি; তৃষ্ণায় ওকে কষ্ট পেতে হবে না ; আরও খানিকটা পানি খেলো, তারপর দম ফিরে পেতে পাথরের ওপর আরাম করে বসল।

প্রবেশ নিষিদ্ধ গহ্বরে চুপচাপ একটা বাতাস ঝুলে আছে। হঠাৎ সাদৃশ্য আছে এমন স্মৃতি ফিরে এল মনে। এরকম অপার্থিব বাতাসে আগেও একবার শ্বাস নিয়েছে ও। মা জননী প্রকৃতির কোনো গভীর কুলুঙ্গি নয় সেই জায়গা; সভ্যতার অত্যাধুনিক কিছু অবদান জড়ো করা হয়েছে, এমন এক কামরায়। একটা নি. প. কেন্দ্রে।

যখনই আরও কর্কট কোষ মারার প্রয়োজন পড়ত, ওর বাবাকে নিয়ে যাওয়া হত নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে। বদ্ধ সেই ছোট্ট বিস্তৃতিতে, একমাত্র শব্দ বলতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সহায়ক যন্ত্রের ছন্দ, রোগীদের মাংস এতটাই স্থিরতায় মোড়া থাকে যে তারা বেঁচে আছে না মারা গেছে বোঝার কোনো উপায় থাকে না।

ওখানে যতবার বাবাকে দেখতে গেছে কাউরু, প্রতিবার একই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে–ওই জায়গায় মেশিনগুলোই যেন শুধু জ্যান্ত–মানুষগুলো সব অজৈব স্তরে নেমে গেছে।

মুখ আর মাথা থেকে বেরোনো টিউবগুলোর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল কাউরুর, নিশ্চয়ই খুব ব্যথার মধ্যে থাকতে হয়েছে বাবাকে–টিউবের সংখ্যা যত বাড়ত ততই যেন ওগুলো বলতে থাকত তোমার বাবার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসছে। এই উপত্যকার জমাট নিস্তব্ধতার ভেতর এমন কিছু একটা আছে, ওকে সেই নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

কে জানে কেমন আছে বাবা।

এখন যখন শয্যাশায়ী বাবার কথা মনে পড়ে গেছে, কাউরু অনুভব করল ওর পক্ষে আর বিশ্রাম নেয়া সম্ভব নয়। যতদিন না দেশে ফিরছে ও, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে বাবাকে–তা না হলে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে ওর আসাটাই বৃথা হয়ে যাবে।

মার কথা ভেবেও উদ্বিগ্ন কাউরু। মা কি এখনও তাঁর সেই উত্তর আমেরিকার কিংবদন্তি নিয়ে পড়ে আছেন, প্রার্থনা করছেন একটা মিরাকলের, যেটা তাঁর স্বামীকে সুস্থ করে তুলবে? মা আরেকটু বাস্তব ঘেঁষা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালে স্বস্তি বোধ করত কাউরু।

আর রাইকোর ব্যাপারটা?

তার কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতর একটা চাপ অনুভব করল।

বুকপকেট থেকে রাইকোর ফটো দুটো বের করে দেখছে। একটা হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় তোলা। তাতে কাউরু মাথা উঁচু করে আছে, ওর

BanglaBook.org

কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইকো। ছবিটা তুলেছিল রিয়োজি।

এই ফটো তোলার সময় কি চলছিল তার মাথায়? মার ভঙ্গিমাতেই স্পষ্ট কাউরুর প্রতি তার আকর্ষণ বা স্নেহ গোপন কোনো বিষয় নয়। এই ছবিতে মাতৃসুলভ নয়, বরং নারীসুলভ আবেগ প্রকাশ পেয়েছে এমনিতেই বলে দেয়া যায় এই দৃশ্য দেখে রিয়োজি খুশি হতে পারেনি।

যখনই রাইকোর কথা চিন্তা করে, ফটো দুটো বের করে দেখে কাউরু, কিন্তু হাতে যার ফটো থাকে তার কথা ভুলে যায়, ওর মন তখন গভীর বিষাদে ভরে ওঠে রিয়োজির জন্যে।

দ্বিতীয় ছবিটার দিকে তাকাল। এতে রাইকো মেঝেতে, পুরু কার্পেটের ওপর, একা বসে আছে, সম্ভবত নিজেদের বাড়ির লিভিং রুমে। বসার ভঙ্গিটা সাধারণ, ভাঁজ করা পা দুটো একপাশে, হাত দুটো পেছনে। ওর চুল সাজানোর ধরনটা অন্যরকম লাগছে। ফটোটা দুই কি তিন বছরের পুরোনো, তবে রিয়োজি অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে না পরে তোলা হয়েছে, তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

ওদের সম্পর্কটা শারীরিক হয়ে ওঠার কিছুদিন পরই, রাইকোর পুরোনো একটা ফটো দেখতে চেয়েছিল কাউরু। ওর জানা নেই, চাওয়ার ভাষা বা ভঙ্গিটা বোধহয় ঠিক ছিল না।

'তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুড়ি হয়ে গেছি?' তিরস্কারের সুরে জানতে চেয়েছে রাইকো, কাউরুর পাঁজরে আঙুলের খোঁচা মেরে। তবে পরদিনই বেশ কয়েকটা ফটো এনে দিয়েছিল ওকে।

তার মধ্যে একটা ছবি ছিল: নিজের বাড়িতে পার্টি দিয়েছে রাইকো, বন্ধুরা তাকে ঘিরে রেখেছে, তার হাতে গ্লাসভর্তি শ্যাম্পেন। মদ্যপান করায় টকটকে লাল হয়ে আছে ফরসা মুখ।

আরেকটা ছবি: এক হাত ওপরে তুলে, অপর হাত কোমরে রেখে সম্ভবত কোনো অতিথি ক্যামেরাম্যানকে পোজ দিচ্ছে।

আরেকটায়: খুব দামী এবং চোখ জুড়ানো কিমানো পরে একটা ক্রিস্যানথেমাম পুতুলের পাশে শান্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

আরও একটায়: কিচেন সিঙ্কে দাঁড়িয়ে বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে রাইকো। নিখুঁত ছবি, কারও ডাক শুনে সবে মাত্র ঘাড় ফিরিয়েছে।

কাউরুর আন্দাজ, এই ছবিটা রিয়োজি তুলেছে। সে টিপে টিপে মার পেছনে এসে 'ও মা!' বলে ডেকেছে, মা যেই ঘুরেছে অমনি শাটার টেনে দিয়েছে। রাইকোর প্রতিক্রিয়ায় ভণিতা নেই–হাসির সঙ্গে বিস্ময় মিশে অসাধারণ একটা ভাব তৈরি হয়েছে। মূল্যবান একটা ফটো, তাতে তার এমন একটা দিক ধরা পড়েছে যেটা সাধারণত কারও দেখার সুযোগ ঘটে না।

BanglaBook.org

বিশেষ করে এই ছবিটা ভীষণ পছন্দ করে কাউরু, কিন্তু মরু অভিযানে বেরোবার আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সঙ্গে করে ওটা আনবে না। আনেওনি। রাইকোর মাত্র দুটো ফটো এনেছে–একটায় ওরা দুজন আছে, আরেকটায় সে একা মেঝেতে বসে। এগুলো নিজের পকেটে খুব সাবধানে রাখে ও

তো ওই দ্বিতীয় ছবিটায় দেখা যাচ্ছে হাতে রোনা একপ্রস্থ ড্রেস পরে আছে রাইকো। কোমর থেকে ওপরের অংশ একটা সোয়েটারের মতো দেখাচ্ছে; আসলে, এটা যুৎসহ কোনো পরিচ্ছদ নয়, শুধু লম্বা একটা সোয়েটার বলাই উচিত। U আকৃতির গলাতে ভীরুতার ছাপ স্পষ্ট, স্তনের ফোলা ভাব মোটেও ফোটেনি। তারমানে এই নয় যে তার স্তন খুব বড়। ওগুলোর আকার–ওর দু'হাতের তালুতে জায়গা হয়ে যায় আর কি। যদিও ওগুলোর নিখুঁত আকৃতি আর নিরেট ভাব ওকে মুগ্ধ করে।

পরিচ্ছদটা রাইকোর নিতম্বও ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তার বদলে প্রেমিকার পা দুটোর দিকে চোখ আটকাল কাউরুর।

রাইকোর বসার ধরন দায়ী, পরিচ্ছদের কিনারা হাঁটুর খানিক ওপরে উঠে গেছে। পেছন দিকে হেলান দিয়ে আছে সে, হাঁটু দুটো কার্পেট থেকে সামান্য তোলা দুই হাঁটুর মাঝাখানের ওই ফাঁকে যে অন্ধকার জমে আছে, তা অনেকটা পেছন পর্যন্ত বিস্তৃত। বার বার ওই নরম উপত্যকায় মুখ ডুবিয়েছে কাউরু।

দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে ওরা, হাসপাতালের কর্মীরা কখন এসে টেস্ট করাতে নিয়ে যাবে রিয়োজিকে। তারপর দিনের উজ্জ্বল আলোয় রাইকোকে বিছানায় শুইয়েছে কাউরু, তার স্কার্ট টেনে ওপরে তুলেছে, নীচে নামিয়েছে প্যান্টি, এবং পরীক্ষা করেছে তার যৌন অঙ্গ। তার শরীর গঠন করতে অনেকগুলো অঙ্গ লেগেছে, ওটা সেগুলোর মধ্যে একটা ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাখ্যাতীত মুগ্ধতা গ্রাস করত ওকে। তার প্রতি ওর ভালোবাসা ওটার কারণে অমূল্য হয়ে ওঠে।

তার দু'পায়ের মাঝখান থেকে যখন মুখ তুলেছে কাউরু, পর্দা সরানো জানালায় আলোটাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বলে মনে হয়েছে। সূর্যের পূর্ণ আলো ওকে যেন বলতে চেয়েছে, ভয়ানক কোনো অনৈতিক কাজ করছে ও। কিন্তু এই একটা প্রবল ঝোঁক ওর সাধ্য নেই এড়ায়। আবার মুখ নামিয়েছে কাউরু. রোদ এড়িয়ে, জিভ দিয়ে রাইকোর রস আস্বাদন করার সময় প্রার্থনা করেছে এই মুহূর্ত যেন কখনও শেষ না হয়।

এবং এখন, ওই রকম একটা মুহূর্তের ফল হিসেবে, রাইকো ওর সন্তান ধারণ করছে।

ফটোর দিকে চোখ রেখে রাইকোর সরু কোমর দেখছে কাউরু।

আমি ভাবছি ওটা এখন কত বড়।

BanglaBook.org

ওর অনুমান: এখন হয়তো এক ইঞ্চির চারভাগের একভাগ হয়েছে, দেখতে মোটামুটি খুদে সি-হর্সের মতো। এই মুহূর্তে ওর জিনবাহী অস্তিত্বের প্রতি ভালোবাস অতটা নয় যতটা রাইকোর প্রতি, যে ওটাকে বহন করছে।

তবে এখন আর ওর পাথরের ওপর বিশ্রাম নেয়ার সময় নেই। যতগুলো মুখ মিছিল করছে ওর মনের পরদায়, সব কটা মিনতির সঙ্গে তাড়াহুড়ো করতে বলছে ওকে।

সিধে হলো কাউরু, চূড়ার দিকে উঠছে।

বারো

দূর পাহাড়সারির পেছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। হাঁটার গতি বাড়াল কাউরু। সমতল একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল, তিন দিকে প্রকাণ্ড সব পাথর। চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাওয়ার আগেই রাতের মতো ক্যাম্প ফেলার জন্যে ভালো একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

এখানে আগেও একবার আসা হয়েছে কাউরুর। একজন ইন্ডিয়ান হিসেবে, পরিত্যক্ত ওয়েন'স রকের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া কমপিউটারের মধ্যে দিয়ে যার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল ও। ওদের গোত্র একটা জায়গার ভেতর দিয়ে গিয়েছিল, সেটা হুবহু এরকম দেখতে।

যে আদিবাসী আমেরিকান কিংবদন্তি ওর মা ওকে দেখিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছে একজন যোদ্ধার নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে কোনো যোদ্ধা ওর সামনে হাজির হচ্ছে না, তবে হাজির হলে পথ দেখিয়ে যে জায়গায় কাউরুকে নিয়ে যেত, সেটা এরইমধ্যে ওর স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে। এখন শুধু স্মৃতির আঁশ অনুসরণ করতে হবে ওকে, সেগুলো এক এক করে বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে হবে, তাহলেই পেয়ে যাবে নিজের পথ।

এখন আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই! জায়গাটা এই সামনের উঁচু কোথাও থেকে ওর সামনে উদয় হবে। যদিও, আজ রাতে, অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে ওকে। কাঁধ থেকে প্যাক নামিয়ে পা দুটোকে বিশ্রাম দিচ্ছে কাউরু।

এ পর্যন্ত আসতে প্রতিটি পদক্ষেপ কাউরুর ইন্দ্রিয়গুলোকে জাগিয়ে দিয়েছে। কোনো কারণ বা অর্থ ছাড়াই একের পর এক অনুভূতি আলোড়ন তুলেছে ওর সচেতনতায়। আতঙ্ক, ঈর্ষা, উল্লাস অনুভব করেছে ও, অনুভব করার কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও–ওগুলো স্রেফ আছড়ে পড়েছে ওর স্নায়ুর ওপর, উত্তেজিত করেছে ইন্দ্রিয়গুলোকে। কাউরু সন্দেহ করছে, ও যদি

BanglaBook.org

নাছোড়বান্দার মতো পিছু নিয়ে ওগুলোর উৎসের খোঁজে অতীতে চলে যেতে পারত, শেষ পর্যন্ত একসময় দেখতে পেত নিজের জন্মমুহূর্তে পৌঁছে গেছে।

সমতল একটা পাথরের ওপর মাদুর বিছাল কাউরু, তারপর স্লিপিং ব্যাগে শুলো। এখন খুব একটা ঠাণ্ডা না লাগলেও, ও জানে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির তাপমাত্রা গোত্তা খেয়ে নীচের দিকে নেমে যাবে। শুয়ে শুয়েই রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরছে, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কিতে।

হঠাৎ উঠে বসে দ্রুত চারদিকে তাকাল কাউরু। পরিষ্কার একটা স্পর্শ অনুভব করেছে, কিংবা কল্পনায় অনুভব করেছে, ওর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ।

মাদুর আর স্লিপিং ব্যাগের ভেতর দিয়ে পাথরের ঠাণ্ডা ভাব পাচ্ছে কাউরু। নিঃশ্বাসটা ছিল নিয়মিত, ছন্দময়, যেন সচল একটা রেসপারেটার—শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সহায়ক একটা যন্ত্র—কিংবা, শিকার করে খেতে অভ্যস্ত কোনো প্রাণী শিকার দেখতে পায়, ফলে তার শরীর আর আত্মা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, এখন তা কমাতে চেষ্টা করছে।

কাউরু অনুভব করল ওই একই দিক থেকে কিছু একটা লক্ষ করছে ওকে। এর পেছনের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও। দৃষ্টিটা ওর ঘাড়ের গোড়ায় বিঁধছে, গতি তুলছে ওর পালসে।

এ আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাল কাউরু।

ও দেখল, খুব বেশি হলে দশ গজ দূরের একটা গাছের ছায়ায়, নগ্ন একজন মানুষ; মাটিতে এক হাঁটু গেড়ে রেখেছে, হাতে তীর-ধনুক, ওর দিকে তাক করা। লোকটার গায়ের রঙ কালো, এত কালো যে অন্ধকারের সঙ্গে একদম মিশে আছে, তবে তারপরও কীভাবে যেন তাকে আলাদা করতে পারছে কাউরু।

তার লম্বা চুল এক করে পেছনে বাঁধা, মাথায় কোনো আবরণ কিংবা পালক নেই। মাঝারি আকৃতি, মাঝারি কাঠামো, পেশিও তেমন ফোলা নয়, তবে হাতের অস্ত্র ধরে আছে দক্ষ তীরন্দাজের ভঙ্গি নিয়ে।

নড়তে চেষ্টা করে কাউরু দেখল, পারছে না। এ যেন সেই আধো জাগা অবস্থা, যখন মাথা সচল থাকলেও শরীর চলে না। ও শুধু তীরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে।

লোকটার ডান হাতের বুড়ো আঙুল বাঁকা হয়ে আছে ঠিক যেখানটায় ধনুকের ছিলা টেনে ধরেছে। সে লক্ষ্যস্থির করেছে কাউরুর খুলি। তীরের মাথাটা কালো কাঁচের মতো আগ্নেয় শিলা। এক পলক দেখেই কাউরু বুঝতে পারল, ওটা রাবারের খেলনা নয়।

লোকটার চেহারা নির্লিপ্ত। সেখানে কোনো বৈরি ভাব দেখতে পাচ্ছে না

BanglaBook.org

কাউরু, তবে কোমলতাও অনুপস্থিত। মোটেও খুশি নয় সে। নিজের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে দৃঢ়প্রত্যয়ী একজন শিকারির প্রতীক।

তীরের মাথাটা অলস ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাচ্ছে, সেটার দিকে তাকিয়ে আছে বোবা কাউরু। তবে ওর ভয় লাগছে না। মনের দূর এক কোনে বিশ্বাস জন্মেছে, এটা বাস্তব নয়।

কিন্তু যখন দেখতে পেল ধনুকে প্রয়োগ করা শক্তি প্রায় সর্বশেষ মাত্রায় পৌঁছে গেছে, অকস্মাৎ মাথার ভেতর একটা বিস্ফোরণের মতো ওর নিজের স্বরূপ বদলে গিয়ে একটা পশুর আকৃতি নিল। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিতে মাথা নিচু করতে চাইল কাউরু। কিন্তু তীরটা এরইমধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নীরবে ঘুরতে থাকা ওটার ডগা বড় হতে হতে ওর দৃষ্টিক্ষেত্র গ্রাস করে নিচ্ছে। সামনের দিকে ঝুঁকল ও, যেন তীরটার দিকে ছুঁড়ে দিল নিজেকে, তারপর সচেতনতা ওকে ছেড়ে গুটিয়ে গেল।

মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে অজ্ঞান ছিল কাউরু। সচেতন হওয়ার পর কিছুক্ষণ স্রেফ শুয়ে থাকল ওখানে, ওর ওপর টাওয়ার হয়ে থাকা একটা গাছের কাণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর ধারণা ছিল সামনের দিকে পড়েছে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে, কীভাবে যেন, পাথরে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে। একটা হাত তুলে ডান চোখে আনল, তীরটা যে চোখে বিদ্ধ হওয়ার কথা। কোনো জখম নেই! সিধে হয়ে পেছন দিকে তাকাল তীরন্দাজ লোকটার খোঁজে। নেই। সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

কাউরু বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হয়েছিল সে। এর জন্যে দায়ী হয়তো উপত্যকার অদ্ভুত পরিবেশ...হতে পারে বহু আগে ওর মগজে গেঁথে যাওয়া একটা ছবি অবচেতন থেকে সচেতনতায় উঠে আসতে চেষ্টা করায় ব্যাপারটা ঘটেছে! মিশমিশে কালো লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, ওর মন জুড়ে রেখে গেছে মৃত্যুর প্রবল একটা বোধ। অনুভব করছে, মৃত্যুকে যেন সরাসরি হজম করে নিয়েছে ও, এক ধরনের রেডিয়েশনের মতো।

তবে ভূতটা যতই কাল্পনিক হোক, নীরবে ঘুরতে থাকা তীরের মাথা ওর চোখে বিঁধতে যাচ্ছে, ওকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে—চেষ্টা করেও মন থেকে এসব তাড়াতে পারছে না কাউরু। মৃত্যুর রিহার্সেল ছিল ওটা, ওর পায়ের ছাপ ধরে পিছু নিয়েছিল। ব্যথা কিছু না, কিছুই কিছু না, ও উপলব্ধি করছে মৃত্যু যে নিমর্ম ফাঁকাভাব তৈরি করে, সেটার অস্তিত্ব অনুভব করছে ও, সেই ফাঁকা জায়গাটা অতল আতঙ্কে ভরিয়ে তুলছে ওকে।

প্রতিবার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হওয়ার সময় জীবনের পরিপূর্ণতার কথা ভেবে নতুন করে কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে যায় কাউরুর অন্তর। জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খায়, মেলামেশা করে। এই প্রথম পুনর্জন্ম সম্পর্কে আগাম সতর্কতা

BanglaBook.org

অনুভব করল কাউরু।

শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। শান্ত হওয়ার পর আবার শুয়ে পড়ল, হাতে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। উপত্যকার একদিকের কিনারায়, একটা ফাঁকে, মস্ত থালার মতো চাঁদ উঠল মানুষ একসময় ওই চাঁদের বুকে দাঁড়িয়েছে, কয়েক যুগ আগে। ফলস্বরূপ, চাঁদের সত্যিকার অস্তিত্ব এখন মানুষের জ্ঞানের পরিসীমায় স্থান পেয়েছে। খুব সম্ভবত সূর্যও ওখানে সত্যি সত্যি আছে, সৌরজগতের মাঝখানে।

কিন্তু লূপের সূর্য আর চাঁদও ওটার অধিবাসীদের জন্যে বাস্তব, কিন্তু কাউরু এবং অন্যান্যরা জানে তা বাস্তব নয়, ব্যাপক অর্থে নয়।

চিন্তার এই ধারা কাউরুকে মনে করিয়ে দিল, ওর বাবা ওকে একবার একটা উদ্ধৃতি শুনিয়েছিলেন। চাঁদে নেমেছিলেন এমন একজন অ্যাস্ট্রনটের মন্তব্য ছিল সেটা।

সিম্যুলেশনে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি, মন্তব্য করার জন্যে চাপ দেয়া হলে বলেছিলেন তিনি।

কথাটা কাউরুর মনে গেঁথে আছে মূল অভিযান শুরু হওয়ার আগে, জানা কথা, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে নানা ধরনের বিশদ সিম্যুলেশনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে অ্যাস্ট্রনটদের, যার অনেকগুলোই ছিল আমেরিকার বিভিন্ন মরুভূমিতে। প্রথমে চাঁদের অনুকরণে তৈরি করা পরিবেশে বহুবার হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে, শুধু তারপরই বাস্তবে চাঁদে হাঁটার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা।

ওই অ্যাস্ট্রনট যেটা বলতে চাইছিলেন, তা হলো, রিয়্যালেটি ছিল হুবহু ভার্চুয়াল রিয়্যালেটির মতো। তবে, হিসেবটা যতই সূক্ষ্ম হোক, কিছু না কিছু পার্থক্য না থেকে পারে না।

কাউরুর মনে পড়ল বাইবেলে আছে, ঈশ্বর বলেছেন, দুনিয়াকে তিনি নিজের চেহারার আদলে বানিয়েছেন। সমাপ্তি ঘটার সময় লূপ ঠিক বাস্তব দুনিয়ার মতো দেখতে হয়েছিল, এর দ্বারা ঠিক কি বোঝানো হয়? লূপের আদিযুগে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রাণের উন্মেষ ঘটেনি। তারপর গবেষকরা আরএনএ [RNA] লাইফ ফর্ম সরবরাহ করেন। আর সেগুলোই লূপের ভেতর সমস্ত প্রাণীকুলের বীজ হয়ে ওঠে– ওগুলো একটা জীবনবৃক্ষ তৈরি করে, ঠিক বাস্তব দুনিয়ার মতো: এক প্রাণ থেকে আরেক প্রাণ, তা থেকে আরও নানা প্রজাতি, এভাবে ক্রম ধরে সাজিয়ে দেখানো হয়। লূপ আর বাস্তব দুনিয়াকে যদি একই পদার্থ দেয়া হয়, তাহলে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু থাকে না যে দু'জায়গার জীবমণ্ডল একই ধরনের আকৃতি নেবে। তবে, অ্যাস্ট্রনট যেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন, অন্তত অল্প কিছু পার্থক্য কি থাকা উচিত না?

BanglaBook.org

এটা কি কোনো স্বর্গীয় পরিবেশনা? অবতার রূপে আবির্ভূত হওয়ার কোনো ঘটনা?

এই চিন্তাটা কোনোভাবে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না কাউরু যে এই বাস্তব দুনিয়াও আসলে একটা ভার্চুয়াল দুনিয়া। যুক্তি দিয়ে এটাকে খণ্ডন করা যায় না।

একজন ঈশ্বর। পরম ক্ষমতাধর কেউ জীবন এধরনের একটা অস্তিত্বের সৃষ্টি, এটা মেনে নিতে কাউরুকে কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। এটা যদি স্রেফ একটা ভার্চুয়াল দুনিয়া হয়ে থাকে, তাহলে তো শেষপর্যন্ত পবিত্র মাতার পক্ষে সম্ভব, কুমারী মাতা হিসেবে, ঈশ্বর-পুত্রের জন্ম দেয়া। কিংবা ঈশ্বরপুত্রের পক্ষে সম্ভব, একবার মারা যাওয়ার পর এক সপ্তার মধ্যে আবার জীবিত হয়ে ফিরে আসা...

মানবজাতি যেখানে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, ঈশ্বরের উপস্থিত হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। সব যদি এভাবেই চলতে থাকে, গোটা দুনিয়া ক্যানসারাস হয়ে উঠবে। অদৃশ্য জগতের কোথাও থেকে নিশ্চয়ই সব দেখছেন ঈশ্বর।

তারাজ্বলা আকাশে একদৃষ্টে তাকিয়ে কিছুই দেখছে না কাউরু, ঈশ্বরের আবির্ভাব নিয়ে চিন্তা করছে।

তেরো

মজুদ খাবারের অর্ধেক খরচ করে ফেলেছে কাউরু, তবে গভীর নালা পেছনে ফেলে উঠে এসেছে শৈলশিরায়। এবার উত্তর দিকে রওনা হবে ও, লক্ষ্য পাহাড়চূড়া।

চারপাশের সমস্ত দৃশ্য ওর স্মৃতিতে তালা দিয়ে রাখা আছে। মাঝে মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হয়ে আদিবাসী লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে. তাতে খুলে যাচ্ছে তালা, এক পলকে ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে কোনদিকে ওর যাওয়া উচিত মাথাটা খালি করে দিয়ে দেখানো পথ ধরে এগোচ্ছে কাউরু।

কখনও এই আদিবাসী লোকটাকে ওর সামনে কোথাও একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কাউরুর দিকে তাকিয়ে থাকবে সে, যতক্ষণ না ওর পুরো মনোযোগ নিজের দিকে টানতে পারে, তারপর ওর উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সামনের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এখন আর একবারও ওর দিকে তীর তাক করে না সে। তার সংকেত খুব সহজেই অনুবাদ করা যায়।

BanglaBook.org

আমার পিছু নাও।

কখনও শুকনো নালার গভীর তলায়, যে নালা কিছুদূর গিয়ে পথ হারিয়েছে, খিলান আকৃতির খয়েরি পাথরের গায়ে নানা আকৃতির ছবি দেখতে পাচ্ছে কাউরু, যেগুলো ওর মনকে উদ্বেগে ভরিয়ে তুলছে। ওর ধারণা, এগুলো আদিবাসী আমেরিকানরা বহুযুগ আগে এঁকেছিল, এখানে যারা বসবাস করত–মানুষ আর পশুর বিমূর্ত চিত্র। কিছু জ্যামিতিক প্যাটার্ন, যেগুলো–নির্ভর করে আপনি কীভাবে দেখছেন– ডিএনএ [DNA] -র মলিকিউল কাঠামো, অর্থাৎ একজোড়া লূপ আকৃতির সঙ্গে মেলে। কাউরু উপলব্ধি করল, গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে ও।

কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করল কাউরু, আদিপুরুষরা বিশাল একটা গুহার ভেতর বসবাস করছেন, ধরে রাখার চেষ্টা করছেন সাধারণ জীবনধারা। ধারণা করল, ও যেখানে যাচ্ছে সেটা একটা অচিহ্নিত এলাকা, গোপন রহস্যে মোড়া। ওখানে আদিপুরুষরা উদ্ভিদের মতো অকৃত্রিম জীবনযাপন করতেন, পরতেন গাছের ছাল। তাঁদের মিশন ছিল যারা সন্ধানে থাকে তাদেরকে সেই জ্ঞানের খোঁজ দেয়া, যে জ্ঞান হাজার হাজার বছর ধরে সংরক্ষণ করছেন তাঁরা...

কিন্তু কাউরুর প্রত্যাশা পূরণ হলো না। একদিন আর একরাত হাঁটল ও, কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনভর্তি কোনো গুহা ওর নজরে পড়ল না।

এবার খাবার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। সব যদি শেষ হয়ে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। যদি ফেরার ইচ্ছে থাকে, তাহলে এখনই সময়।

অল্প যেটুকু খাবার আছে, যেখানে মোটরসাইকেল রেখে এসেছে সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্যে তা যদি যথেষ্ট হয়, জানে তারপর আর বিপদে পড়তে হবে না। বাইকের ট্যাংকে প্রচুর গ্যাস ভরা আছে, আর সবচেয়ে কাছাকাছি শহর মাত্র বিশ কি বাইশ মাইল দূরে, দু'চাকার ওপর ভর করে সহজেই পৌঁছুনো যাবে। ওর বোধহয় ফিরে গিয়ে রসদ সংগ্রহ করা উচিত।

পরিস্থিতি যেটা দাবি করে সেটাই করবে কাউরু, নিজেকে শান্ত করার জন্যে বিড়বিড় করল। *কানাগলির ফাঁদে পড়তে দেবে না।*

আসলে 'প্রাচীন প্রবীণদের' কথা ভাবছে কাউরু, এদিকে যাঁদের আনাগোনা আছে। প্রশ্ন হলো এই প্রাচীনতম প্রবীণদের সঙ্গে কীভাবে দেখা করা যায়, দেখা করে কীভাবে শিখে নেয়া যায় দুনিয়াটা কীভাবে চলছে। এটার ওপর নির্ভর করছে ওর বাবার জীবন, ওর মার জীবন, রাইকোর জীবন।

আসার পথে কখন থেকে যেন এই প্রাচীন প্রবীণদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দেখতে শুরু করেছে কাউরু তবে নিজেকে বলছে, বিপরীত সম্ভাবনাটাও ওর বিবেচনার মাধ্য থাকা উচিত। এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে কি যে মানুষের

BanglaBook.org

প্রতি তাঁরা সদিচ্ছা পোষণ করেন?

যেন অশুভশক্তির আভাস দেয়ার মাধ্যমে ওর ভাবনাকে সমর্থন করা হলো, হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এল ঘন কালো মেঘ, গোটা আকাশ ভরে ফেলছে। মরুভূমিতে পা ফেলার পর থেকে আকাশের দিকে খুব একটা তাকানো হয়নি ওর। দিনের পর দিন পরিষ্কার, উজ্জ্বল আবহাওয়া ভুলিয়ে রেখেছিল ওকে।

শৈলশিরার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশের দৃশ্য তিনশ ষাট ডিগ্রি উন্মোচিত হয়ে আছে ওর চোখের সামনে–মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। এখন হঠাৎ করে ওর দৃষ্টিসীমা কেটে ছোট করে দিল ছুটন্ত সব মেঘের দল। আকাশের রঙ এখন ঘন ছাই।

কয়েক স্তরে ভাগ হয়ে ছুটছে মেঘগুলো, সীমাহীন আকাশে নিচু হয়ে ঝুলে ঝুলে; কাউরুর ভয় হলো সব না হুড়মুড় করে ওর মাথার ওপর ভেঙে পড়ে। চাপটা ঠিকমতো শ্বাস নিতে দিচ্ছে না।

যেকোনো মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হবে, শৈলশিরার ওপর একটা আশ্রয় খুঁজছে কাউরু। এতটা ওপরে বলেই কিনা, এদিকের গাছপালা সব বেঁটে, পাতাগুলো গা ঘেঁষা নয়, ওগুলোর নীচে দাঁড়ালেও ভিজতে হবে ওকে। বোল্ডারগুলোর ফাঁকে ফাটল ধরনের কিছু পাওয়ার আশায় আছে। নদী ধরে উজানের দিকে আসার পথে কিছু গুহা দেখেছিল, কিন্তু ওগুলোকে পাহাড়ের অনেকটা নীচে ফেলে আসা হয়েছে। এখানে, চূড়ার কাছাকাছি শৈলশিরায়, ওর পছন্দমতো একটা গুহা বা সুড়ঙ্গ খুঁজে পাওয়া এত সহজ নয়। কাজেই ভয় পাচ্ছে ও।

এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল কপালে। শরীর টান টান হলো, ছুটে গিয়ে কোথাও আশ্রয় নেয়ার জন্যে তৈরি কাউরু, কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছে না, চারদিকে শুধু নুড়ি পাথর ছড়িয়ে আছে

ওর মাথায় আরও কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। তারপর দুনিয়া কাঁপানো বজ্রপাতের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তুমুল বর্ষণ। দৃশ্যপট এতটাই বদলে গেল, প্রকৃতির আগের চেহারাটা মনে হলো দৃষ্টিবিভ্রম ছিল।

প্রথমে শুকনো খটখটে জমিন সব বৃষ্টি শুষে নিল। তবে খানিক পরই আর নিতে পারল না, এবার ছোট ছোট প্রবাহ সৃষ্টি হতে দেখছে কাউরু।

ওখানে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া ওর কোনো উপায় নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে এড়ানো যাচ্ছে না। জীবনে এই প্রথম বৃষ্টিকে ভয় পাচ্ছে কাউরু।

ওর রাকস্যাকে প্ল্যাস্টিক ব্যাগ আছে, মাত্র কয়েকটা, তবে কি কাজেই বা লাগবে ওগুলো? ওর সঙ্গে তাঁবু নেই। তাঁবু থাকলেও কিছু লাভ হত না মুহূর্তের মধ্যে ওর গা ভিজে গেছে।

বোকার মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটছে কাউরু। কাপড়চোপড় ভিজে যাওয়ায় ভারি লাগছে ওগুলো। কোথায় যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে

BanglaBook.org

না, বুঝতে চাইছেও না। শুধু ভয় পাচ্ছে হঠাৎ একটা প্রবল স্রোত এসে ওকে না টেনে নেয়। কিংবা যে প্রবাহ বইছে, হোঁচট খেয়ে তার একটায় না পড়ে যায়। সামান্য একটু উঁচু জায়গা দরকার এখন, পা রাখতে চায় নিরেট কিছুতে, যেখানে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে পারবে।

ওর শেষ পাউরুটিটা রাকস্যাকে, প্ল্যাস্টিকে মুড়ে রেখেছে, কিন্তু জানে ভালো করে মোড়া হয়নি। ওটা ভিজতে বাধ্য, তারপর নরম কাদা হয়ে পানির সঙ্গে ধুয়ে যাবে। এরকম ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে কিছু খাওয়াও সম্ভব নয়। দাঁড়িয়ে পড়ল কাউরু। শেষ খাবারটুকু গলে যাচ্ছে বুঝতে পারলেও ওর কিছু করার নেই। নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করল, অন্তত প্রচুর পানি আছে। মুখ খুলে তার কিছুটা পানও করল।

তবে বৃষ্টিটা যে মাত্রায় ঝরছে, প্রায় নির্দয়ই বলা যায়। বৃষ্টির দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকাটা বেশ কঠিন লাগল। নুড়ি পাথরের ওপর উবু হয়ে বসল কাউরু।

বৃষ্টি এবার ওর নগ্ন ঘাড়টাকে পেয়ে বসল, ফোঁটাগুলো রীতিমতো ব্যথা দিচ্ছে। ব্যাকপ্যাকটা আরও ওপরে তুলে ঘাড় ঢাকল কাউরু, তারপর হাঁটু দুটোকে শক্ত আলিঙ্গনে বাঁধল, কখন বৃষ্টি ছাড়বে তার অপেক্ষায় আছে। ওর ধারণা মরুভূমির ঝড়-বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না।

এটা থাকল। বৃষ্টির ফোঁটা ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে। এক সময় মিহি কণায় পরিণত হলো, দেখতে লাগছে গাঢ় কুয়াশা। কিন্তু তারপর, না থেমে, কাউরুকে বিস্মিত ও হতাশ করে দিয়ে আবার ফিরে পেল আগের সেই রূপ আর প্রচণ্ডতা, মাটিকে চাবকাচ্ছে। কাউরুর মনে হলো বিরূপ প্রকৃতি ওকে যেন ব্যঙ্গ করছে!

ওর ভয় আরও বাড়ছে। বৃষ্টিটা ওর শরীরের সমস্ত উত্তাপ শুঁষে নিয়েছে, শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে ও। তার ওপর, বেলা শেষ হতে চলেছে। অন্ধকার, খিদে আর ঠাণ্ডা। ওর মনে হলো বৃষ্টিটা সারারাত নাও থামতে পারে। চিন্তাটা ওকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলল।

বাতাসের তাপমাত্রাও কমে যাচ্ছে। গোধূলির ছায়া ছায়া ভাব দ্রুতই কালো হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে বৃষ্টির আওয়াজ কি কারণে কে জানে আরও বেড়ে গেল কিছু দেখতে পাচ্ছে না কাউরু, কিন্তু পরিষ্কার অনুভব করছে ওর কাছাকাছি কেউ আছে, ওর পিঠে আঘাত করল, তারপর মাথায়। কিছু লোকজন চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরে লাথি আর কিল-ঘুসি মারছে। বিনা বিচারে যারা মৃত্যুদণ্ড দেয় তাদের খপ্পরে পড়ে গেছে ও। পাইকারী পিটুনির শিকার।

তবে ওর জন্যে এরচেয়েও ভয়াবহ দুর্ভোগ অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ করে ঘোলা পানির স্রোত বইতে শুরু করল ওর পায়ের চারধারে চমকে উঠে লাফ

BanglaBook.org

দিয়েছে, প্যাকটা ফেলে দিল। ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় শরীরটা মোচড়াল, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, পড়ে গেল। পড়ল মাটিতে দু'হাত দিয়ে। চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় একটা বৃত্ত তৈরি করে চারপাশটা হাতড়াল, কিন্তু হাতে কিছু ঠেকল না। ওর নাগালের একটু হয়তো দূরে আছে, কিংবা হয়তো পানির স্রোতে ভেসে অনেক দূরে চলে গেছে। ওর জন্যে দুটোই সমান: প্যাকটা গেছে।

চারপাশে গাঢ় অন্ধকার, নিজের ইচ্ছেমতো নড়াচড়া করতে পারছে না। এখন শুধু স্পর্শ আর শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে ওকে। পায়ের চারধারে ঘূর্ণি তোলা পানি যদি ওর গোড়ালি ডুবিয়ে দেয়, সিদ্ধান্ত নিল, এই জায়গা ছেড়ে সরে যাবে ও, কিন্তু কোথায়? পানি এতটা গভীর নয় বোঝার জন্যে শব্দ আর স্পর্শের সাহায্য নিতে হবে ওকে।

ও যেন একটা পোকা, কাদার মধ্যে মোচড় খাচ্ছে। এরকম পোকা দেখেছে কাউরু–কয়েকদিন ধরে তুমুল বৃষ্টির পর অ্যাসফল্টের ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে, শুধু জ্বলন্ত সূর্যের আঁচে নিজেকে শুকানোর জন্যে। আচ্ছা, বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর মাটির নীচে থেকে কি কারণে বেরিয়ে আসে ওরা? একটা থিয়রি হলো, ওরা আসলে পানিতে মিশে থাকা কারবনিক অ্যাসিড গ্যাস এড়াবার চেষ্টা করে; কাউরুর অবশ্য জানা নেই কতটুকু সত্যি এটা। বেচারা পোকা–প্রথমে ওরা মাটি থেকে ওঠে, তারপর বৃষ্টির পানি থেকে ওঠে, শুধু অতিবেগনি রশ্মিতে গোসল করার জন্যে। এই রশ্মিই কি ওদেরকে বের করে আনে?

এই মুহূর্তে এক বিন্দু আলো পেলেও খুশি হত কাউরু। কয়েক ঘণ্টা হতে চলল নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে আছে। কত ঘণ্টা, ওর জানা নেই, সময়জ্ঞান পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি ঘড়ির কাঁটাগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না।

চারধারের জমিন সম্পর্কে ধারণা না পেলে কীভাবে হাঁটবে কাউরু? এখানে ওঠার পথে একশ গজ গভীর খাদ দেখেছে, এত বেশি যে গুণে শেষ করা যাবে না। এখন যদি বোকার মতো হাঁটা শুরু করে, ওরকম একটা হাঁ চোখের পলকে গিলে ফেলতে পারে ওকে।

কাছাকাছি কোথাও মনে হলো পাথর নড়ে ওঠার আওয়াজ হয়েছে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল শরীর। আবার কয়েকটা নুড়ি গড়াল। বড় পাথরের ধাক্কা খেয়ে কিছু ছোট পাথর গড়াচ্ছে। নিশ্চয় পানির কাজ, জমিনকে আলগা করে দিয়েছে, এই ভূমিধস তারই ফল। কিন্তু আবার হঠাৎ করেই পাথর গড়ানোর আওয়াজটা থেমে গেল, ঠিক ওর সামনে পৌঁছে।

এর মাত্র একটা ব্যাখ্যা থাকতে পারে: ওর সরাসরি সামনে অবশ্যই একটা নালা আছে। পাথর যখন শূন্যে লাফ দেয়, তখন আর শব্দ করে না। কাউরুর মনে কোনো সন্দেহ নেই। ও এখন হাঁ করা একটা গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

জমিনে পিঠ ঘষে পিছাচ্ছে কাউরু। খাদটা কত গভীর জানা নেই, তবে কিনারা থেকে অবশ্যই নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকা উচিত। পুরো ব্যাপারটা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হচ্ছে ওকে। একবার ওর পা পিছলে গেল, নরম কাদায় ফুট দুয়েক নামল শরীরটা, তাতেই থর থর করে কাঁপতে শুরু করল ওর নিতম্বের পেশি।

বৃষ্টির পুরোটা এখন মুখে নিচ্ছে কাউরু। তারপর একসময় গালে-কপালে ওগুলোর পতন খেয়াল করছে বলে মনে হলো না। সন্দেহ নেই বৃষ্টির সঙ্গে চোখের পানিও গড়াচ্ছে, তবে কাউরুর এই কান্নাটা যেন অন্য কেউ কাঁদছে।

ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রমের শিকার কাউরু, অলৌকিক একটা শক্তি যেন ওকে নিয়ে খেলছে। নিজের তিনপাশে আকাশ ছোঁয়া ছুটন্ত ঢেউ দেখতে পাচ্ছে, পাহাড়প্রাচীরের গা থেকে বেরোনো একটা পাথর ধরে ঝুলে আছে ও, ঢেউগুলো ওর কোমরের নাগাল পেয়ে যাচ্ছে। তারপর দৃশ্যপট বদলে গেল, তলাবিহীন একটা জলাভূমিতে রয়েছে ও, যতই ধস্তাধস্তি করছে ততই গভীরে টেনে নেয়া হচ্ছে ওকে।

যতবার এসব বিভ্রমজনিত উপদ্রব ঝেড়ে ফেলতে পারল কাউরু, শক্ত করে আঁকড়ে ধরল বাস্তবতাকে, ততবার মন জুড়ে আসন গাড়ল প্রবল মৃত্যুচিন্তা। ওর শরীর প্রায় বরফে পরিণত হয়েছে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় অকেজোই বলা যায়।

এই বৃষ্টি আমাকে মেরে ফেলবে।

কাউরু কখনও, সারাজীবনে একবারও, বৃষ্টিকে ভয় পায়নি। বৃষ্টি কাউকে খুন করতে পারে, এটা স্রেফ কখনও ভাবেনি ও। এই চিন্তাটা আসলে একটা কৌতুক। পৃথিবীর সবাই যখন ক্যানসারে মারা যেতে বসেছে, ঠিক তখন সে কিনা সামান্য বৃষ্টিতে মারা যাচ্ছে।

কাউরু মনে করতে পারছে না এর আগে শেষ কবে বৃষ্টিতে ভিজেছে মাসখানের আগের কথা স্মরণ হলো, শেষ বিকেলের বৃষ্টি ছিল সেটা। হাসপাতালের টপ ফ্লোরে, জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল ও, বৃষ্টি দেখছিল। মোটা কাঁচের ওপারে এক মুহূর্তে বদলে গেল মেঘের রঙ, পরের মুহূর্তে নীচের রাস্তা ভিজে গেল। ভেতর আর বার, দুটোর মাঝখানে জানালার কাঁচ ছাড়া আর কিছু ছিল না, অথচ ওপারে ওটাকে অন্য এক জগৎ বলে মনে হচ্ছিল।

ওর সঙ্গে রাইকো ছিল। কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করিডরে দাঁড়িয়ে ওরা। বৃষ্টি দেখে কাউরু ভারি খুশি, কারণ অনেক দিন বৃষ্টি হচ্ছিল না। সে সময় ওটাকে আশীর্বাদ হিসেবে দেখেছিল। রিয়োজি তখনও বেঁচে। আর এখন নতুন একটা প্রাণ এসেছে রাইকোর গর্ভে।

বৃষ্টি তো বৃষ্টিই, কিন্তু একসময় যেটাকে স্বর্গীয় বলে মনে হয়েছিল, এখন সেটাকে মনে হচ্ছে নারকীয়।

BanglaBook.org

নেতিবাচক সব চিন্তা খেদাবার জন্যে মনের দেয়ালে রাইকোর মুখটা টাঙাল কাউরু। মা-বাবার কথা ভাবছে। নিজেকে সাজেশন দিল, আমাকে সাহসী হতে হবে। তবে খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। যেই মুহূর্তে সতর্ক প্রহরায় একটু ঢিল পড়েছে, অমনি মৃত্যুচিন্তা ফিরে এল।

এখন শুধু একবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে হয়, সব উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা ওর ব্যবস্থা করবে, অন্ধকার ওকে বয়ে নিয়ে যাবে।

সচেতনতা ধরে রাখার জন্যে নিজের সঙ্গে লড়ছে কাউরু।

কখনও হুঁশ থাকছে, কখনও থাকছে না। যখন সচেতন হচ্ছে, মাঝে মধ্যে মনে করতে পারছে না কোথায় রয়েছে। যদি অনেকক্ষণ জ্ঞান না ফেরে, মৃত্যু নিয়ে যাবে ওকে।

শীতে ঠক ঠক করে কাঁপার সময় কখন ভোর হবে ভেবে কাতর হয়ে পড়ল। একবার সূর্য উঠলে তাপমাত্রা বাড়তে বাধ্য। তখন, আর কিছু না হোক, এই ভীতিকর অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবে সে।

অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার ভৌতিক আনাগোনার জন্যে আদর্শ। কাউরু অনুভব করছে ওর কাছাকাছি কেউ একজন আছে। পরিচিত সেই আদিবাসী ইন্ডিয়ান লোকটা নয়, এ এমন কেউ যার গন্ধ অনেক বেশি জোরালো, ওর নাকের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কে জানে কারা ফিসফাস করছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর, লিঙ্গ অনিশ্চিত। অন্তত দুজন ওরা, সংলাপে একজোড়া ছায়া।

'কেউ আছ ওখানে?' যত জোরে পারা যায় গলা চড়িয়ে জানতে চাইল কাউরু, যাতে বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে, যাতে অশুভ আত্মাকে খেদিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু ছায়াগুলো পিছু হটছে না। তার বদলে বাড়ল ওগুলো। ছায়া এখন তিনটে না, চারটে। পাঁচটা। ওকে ঘিরে ফেলল তারা, বিড়বিড় করে কি সব বলছে। চেষ্টা করেও কাউরু ওদের কথা বুঝতে পারছে না। এমনকি, কি ভাষায় কথা বলছে তাও ওর জানা নেই। গলার স্বর শুনে মনে হলো, ওর প্রতি তাদের সহানুভূতি আছে। তবে, ওই সুর বিদ্রূপেরও হতে পারে। হয়তো ওর এই দুর্দশা দেখে হাসছে তারা।

তারপর একসময় বৃষ্টির প্রচণ্ডতা কমে এল, ফিকে হতে শুরু করল গাঢ় অন্ধকার। ধীরে ধীরে নিজের চারপাশ দেখতে পাচ্ছে কাউরু এখন পর্যন্ত সবই ধূসর কিংবা কালচে–দূরের ওই চূড়া, আকাশের গায়ে ধর্মীয় মনুমেন্টের মতো খাড়া হয়ে আছে, ওটার রঙ হওয়ার কথা লালচে খয়েরি, কিন্তু দেখতে লাগছে স্রেফ কালো একটা আকৃতি। অদৃশ্য দুনিয়ার চেয়ে একই রঙের বিভিন্ন মাত্রা দিয়ে সাজানো দুনিয়া অনেক ভালো।

BanglaBook.org

চারদিকে তাকিয়ে জগৎকে দেখতে পাচ্ছে, কাজেই কাউরুর সাহস বাড়ার কথা। ভোর হয়ে গেছে। বৃষ্টি ধরে আসছে। কিন্তু ঠাণ্ডায় কাঁপছে ও। ওর বোধহয় জ্বর আসছে, মনটা আচ্ছন্ন, শরীর ক্লান্ত।

ডাক্তার হতে যাচ্ছে সে, কিন্তু তারপরও নিজের অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে সমস্যা হচ্ছে তার।

কাউরু ধারণা করল ওর স্রেফ ঠাণ্ডা লেগেছে। তবে ফুসফুসে কর্কশ, ঘরঘরে একটা আওয়াজ আছে। সাধারণ ঠাণ্ডায় এরকম লক্ষণ আগে কখনও দেখেনি ও। নিউমোনিয়া নয়তো? হাত রাখল কপালে, বুকে, বগলের তলায়–তাপমাত্রা বোঝার চেষ্টা করছে। মনে হলো জ্বর খুব বেশি নড়াচড়া করতে পারছে না সে।

বৃষ্টি থামল, তারপর সকাল হলো, কিন্তু কাউরু এখনও কাদার মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে। খানিক পর একটা চিংড়ির মতো চরতে শুরু করল, স্থির পানি থেকে সরে যেতে চেষ্টা করছে।

এখন শুধু রোদ চাইছে কাউরু। রোদ পেলে তার ভেতর এ-পাশ ও-পাশ করবে, তাতে ওর শরীর আর কাপড়চোপড় শুকিয়ে যাবে। ওর ভেজা কাপড় এখন গরম, তবে সেটা জ্বর থাকায়। গায়ে ওগুলোকে কাউরু সহ্য করতে পারছে না।

কাপড়চোপড় খুলে নিংড়াল। শরীর এত দুর্বল, এইটুকু কাজ করতেই হাঁপিয়ে গেছে। নিরাবরণ ত্বকে বাতাস লাগতে এমন শিউরে উঠল, প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। তবে গা থেকে ভেজা কাপড় নামিয়ে ফেলায় হালকা বোধ করছে ও।

নালা ধরে ছুটে আসা বাতাস এড়াতে হামাগুড়ি দিয়ে বড় দুটো বোল্ডারের মাঝখানে চলে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছে। দিনের উষ্ণতা না বাড়া পর্যন্ত শক্তি ধরে রাখতে হলে শরীরটা স্থির রাখতে হবে।

পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে আছে, জ্বরে পুড়ছে, দেখতে পাচ্ছে ওর চারপাশে দুনিয়ার বদলে যাওয়া এখনও থামেনি। রঙ দেখা দিল, স্পষ্ট হলো দূরের জিনিস।

সব দেখছে কাউরু, অপেক্ষা করছে মেঘ কখন বিচ্ছিন্ন হবে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তারপর পরিবেশ উষ্ণ হতে শুরু করল। অল্প কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারল কাউরু। যতবার চোখ খুলল, শূন্যদৃষ্টিতে মেঘের নড়াচড়া দেখল। সূর্য এখনও মুখ দেখাতে পারেনি।

ওর ঘুম ভাঙল একটা গর্জনে। গতরাতের ভোগান্তির কথা মনে পড়ে গেল, আতঙ্কে উঠে বসল ঝট করে।

দেখল আকাশে কি যেন একটা ঝুলে আছে। ওটার ঠিক পেছনে, অবশেষে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। মেঘ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, শূন্যে ভেসে থাকা

BanglaBook.org

জিনিসটায় লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রখর রোদ। উজ্জ্বলতা সহ্য করতে না পেরে চোখ কোঁচকাল কাউরু, আকাশের দিকে মুখ তুলে কালো জিনিসটা দিকে তাকিয়ে আছে।

কাউরু যা কল্পনা করেছিল আকাশে উদয় হওয়া জিনিসটা তা নয়। এমন একটা ধ্বংসাবশেষ আশা করেছিল ও, যেটা বলবে সময় কখন শুরু হয়েছিল; আশা করছিল এমন একদল মানুষ, যাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গোপন রহস্যে মোড়া। তার পরিবর্তে, এই মুহূর্তে আকাশে ঝুলে আছে, সূর্যের আলোয় আলোকিত, আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান: একটি জেট হেলিকপ্টার।

আদিবাসী ইন্ডিয়ান লোকটা যেমন ওর দিকে তীর তাক করেছিল, এই চপারের সামনে থেকে বেরোনো অ্যান্টেনাটাও সরাসরি ওর দিকে তাক করা রয়েছে।

ওটার রোটর থেকে ধেয়ে আসা বাতাস নাস্তানাবুদ করছে কাউরুকে! যেভাবে হাজির হয়েছে, তারা যেন ওর আসার অপেক্ষায় ছিল। কিছুক্ষণ একই জায়গায় স্থির ভেসে থাকল কপ্টারটা, ইঞ্জিনের গর্জন ওর কানের পরদা ফাটাচ্ছে। তারপর ঘুরল ওটা, আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে।

মেঘ সরিয়ে দিয়ে উঠছে ওটা, যে গর্ত দিয়ে রোদ ঢুকছিল সেটাকে আরও বড় করছে। যে আলোটা বেরোচ্ছিল, কাউরুর দৃষ্টিতে সেটাকে এখন একটা বলয় বলে মনে হচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাতালে শূন্যতার বিস্তৃতি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এক

চোখ খোলার পর প্রথম যেটা দেখল কাউরু, মাথার ওপর সাদা সিলিং। পরে এক এক করে চারটে দেয়াল। তারপর দৃষ্টিসীমার ভেতর যা কিছু আসে।

কামরাটা পুরোপুরি বন্ধ করা, একটা জানালা পর্যন্ত নেই। সিলিংয়ের একধারে চৌকো আকৃতির ছোট একটু ফাঁক আছে, লোহার জাল দিয়ে ঘেরা, সম্ভবত আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অংশ। নিশ্চয় ওটার কারণেই আরামপ্রদ তাপমাত্রা সব সময় একরকম থাকছে।

দুদিকের দেয়ালে চৌকো আকৃতি নিয়ে ফাটল। দরজা, সন্দেহ নেই, কিন্তু দেয়ালের মতো একই রঙের হওয়ায় কাউরু দেখতেই পেত না, যদি না ওই ফাটল থাকত। একটা দরজায় নব আছে, ধারণা করল এটা দিয়ে হলওয়েতে যাওয়া যায়। অপর দরজায় ছোট হাতল, তালা দেয়ার ব্যবস্থা আছে বলে মনে হলো না, চৌকাঠের ওপারে বোধহয় বাথরুম।

দেয়ালগুলো ওয়ালপেপার দিয়ে নয়, ঢাকা হয়েছে লেদার দিয়ে। প্রথমে সাদা বলে ভুল করলেও, পরে যখন চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে উঠল, দেখল রঙটা আসলে সাদাটে রূপালি।

এসব দেখতে দেখতে কাউরু উপলব্ধি করল, ওর সচেতনতা পুরোমাত্রায় ঠিকঠাক আছে। এখনও বেঁচে আছে, অন্তত উল্টোটা মনে হচ্ছে না।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল, এটা-সেটা দেখা বন্ধ করে তার বদলে নিজের শরীরের একটা করে অঙ্গের দিকে মন বসাচ্ছে। বুক, পেট, হাত, পা, সবশেষে আঙুলগুলোকে নড়াচড়া করার নির্দেশ দিল। সবগুলোর সাড়া পাওয়ায় ভারি স্বস্তি বোধ করছে।

যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে সেটা নিজের কাছে ব্যাখ্যা করা খুব সহজই। ছোট একটা কামরায় শুয়ে আছে, দেয়ালগুলো চামড়া দিয়ে মোড়া। এতটাই সহজ। কামরায় কাউরু একা।

হাসপাতালের কেবিন? প্রশ্ন জেগেছে মনে, তাতে আবার আন্দাজ করা কঠিন হয়ে উঠল জায়গাটা কোথায় হতে পারে।

আমেরিকায় কাউরু একা এসেছে, তারপর মরুভূমির একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে মোটরসাইকেল চালিয়ে–এটা ঠিক তো? এসব বাস্তবে করেছে ও, নাকি

BanglaBook.org

স্বপ্নের ভেতর? জোর করে কিছু বলতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। এই মুহূর্তে ওর পক্ষে বরং বিশ্বাস করা সহজ যে বাবার হসপিটাল রুমে রয়েছে ও, এবং গোটা ব্যাপারটা আসলে উদ্ভট স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

শৈলশিরা ধরে হাঁটছিল কাউরু. একটা গুহার খোঁজে, যেখানে দীর্ঘজীবীরা বসবাস করেন, এগোবার পথে চোখে পড়েছে রক- পেইন্টিং, ছোট ছোট গুহার দেয়ালে প্রাচীন আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা এঁকেছে। প্রতিটি অঙ্কন দুর্নিবার রহস্যে পরিপূর্ণ, এবং সম্ভবত পাতালপুরির যে বিস্তৃতি ওর সামনে উদ্ভাসিত হবে বলে ওর বিশ্বাস, ওগুলোয় তারও পূর্বাভাস আছে। কিন্তু তারপরই শুরু হলো তুমুল ঝড়-বৃষ্টি, আতঙ্কের গভীরে টেনে নিয়ে গেল ওকে, নির্যাতন চালিয়ে আধমরা করে ফেলল।

ভোরে যে শব্দ শুনেছে তার প্রতিধ্বনি এখনও ওর মাথার ভেতর বাজছে, ঠিক সূর্য ওঠার আগে। বিকট গর্জন, পরিবেশের সঙ্গে বেমানান একটা জিনিস ঝুলে আছে শূন্যে। অত্যাধুনিক জেট হেলিকপ্টার, ইস্পাতনীল রঙ। এখন ওর মনে হচ্ছে, ওটা ওপরে উঠে উড়ে যাওয়ার পরপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

যা কিছু মনে আছে সব এক সুতোয় গাঁথতে পারবে কাউরু, কিন্তু সেগুলো বাস্তব কি অবাস্তব তা যাচাই করার কোনো উপায় নেই। রিয়্যালেটি আর ভার্চুয়ালিটি, দুটোতে এমন প্যাঁচ লেগে গেছে যে নিজের স্মৃতিকে কাউরু বি শ্বাস করতে পারছে না।

সবকিছু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার এখন একমাত্র উপায় তৃতীয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ। কিন্তু ওর ঘুম ভাঙার পর একঘণ্টা পার হয়ে গেছে, এখনও কাউকে দেখেনি ও।

আমার হয়তো উঠে পড়া উচিত, দরজা খুলে নিজেই বের হই, ভাবল কাউরু। ধীরে ধীরে উঠে বসল। শরীরে কোনো ব্যথা নেই, তবে উঠে বসার মতো সামান্য একটা কাজ করতে গিয়ে যেরকম কষ্ট পেল, বোঝা যায় ওর শরীরটা এখনও খুব ক্লান্ত। ওখানে, বিছানার ওপর বসে, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে কাউরু–গলার পেছনে ঘরঘরে একটা আওয়াজ হচ্ছে। উঠে বসা এক জিনিস, ঘুরে বেড়ানো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার

নীচে তাকাতে দেখতে পেল বিছানার পাশে ওর জন্যে একজোড়া স্যান্ডেল রাখা আছে। ওগুলো ওর নয়। কেউ ওখানে রেখেছে। বিরাট স্যান্ডেল। ওগুলোর ভেতর ওর পা বামুন লাগবে।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওই স্যান্ডেল জোড়াই কিছু একটা করার আবেদন জানাচ্ছে ওকে। নিজের সমস্ত ইচ্ছেশক্তি এক করে বেড থেকে নীচে নামাল পা দুটো। স্যান্ডেলের ভেতর পা গলাবার পর ঢিলে লাগল, আকার অনুসারে ওগুলো খুব ভারিও।

BanglaBook.org

স্যান্ডেল পরে কামরায় হাঁটার চেষ্টা করছে কাউরু। গন্তব্য স্থির করল সবচেয়ে দূরে: বাইরে বেরোবার দরজা।

কিন্তু ওর পা খুব ক্লান্ত, আর পাদুকাজোড়া ঢাউস ও ভারি। পা টেনে টেনে হাঁটতে হচ্ছে ওকে। ওর সাদা গাউনের কিনারা ফাঁক হয়ে গেল, উরু দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণে উপলব্ধি করল, গাউনের নীচে আন্ডারপ্যান্ট পরেনি। পাতলা সাদা গাউনটা বাদ দিলে, সম্পূর্ণ নগ্ন কাউরু।

দরজা এখন সরাসরি ওর সামনে। ওটা খুলল, তারপর কি করবে ওর কোনো ধারণা নেই; ও শুধু জানতে চায় কোথায় রয়েছে। এটাই ওর একমাত্র মোটিভ। এটা কী ধরনের জায়গা? ও জানতে চায় এই জায়গার বাইরে কি আছে। আর, যদি কেউ থাকে ওখানে, সে যেই হোক, ও শুনতে চায় কি বলার আছে তার।

দরজার নবে হাত রাখল কাউরু। এর আগে পর্যন্ত ওর মনে এ প্রশ্ন জাগেনি যে দরজায় তালা দেয়া আছে কিনা। নবে হাত দেয়া মাত্র ওর ষষ্ঠইন্দ্রিয় বলে দিল, তালা দেয়া। নব ঘুরিয়ে চাপ দিল, তারপর টান দিল, দরজা নড়ল না।

ওকে যে পরিস্থিতিতে নিয়ে এসে ফেলা হয়েছে, সে সম্পর্কে ওর ধারণা আরেকটু পরিষ্কার হলো। এখানে ওকে আটকে রাখা হয়েছে।

শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটাও কঠিন লাগছে ওর। কাউরু বুঝতে পারছে বাইরে বেরোবার আশা বাদ দিয়ে বিছানায় ফিরে যাওয়া উচিত ওর। নব ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার ওপারে কারও উপস্থিতি অনুভব করল কাউরু। আবার ঘুরল ও, স্থির পাথর হয়ে থাকল, শুনতে পেল ক্লিক করে খুলে গেল দরজার তালা।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কবাট খোলার অপেক্ষায় রয়েছে কাউরু। কে বা কি উপস্থিত হতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে ওকে কোনো তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। ওই ব্যক্তি দরজা খুলে বলতে পারে, তারা মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে, কাউরুর তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। ওখানে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে বলে ভেবেছিল কাউরু, তার বদলে দেখল কিছু একটা বসে আছে: হুইলচেয়ারের ওপর প্রবীণ এক ব্যক্তি, নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে।

'দেখতে পাচ্ছি তুমি জেগেছ,' ইংরেজিতে বললেন তিনি। উত্তরে মাথা ঝাঁকাল কাউরু।

'তুমি কাউরু ফুতামি। তোমার সান্নিধ্যে আমি আনন্দ পাচ্ছি। আমার নাম ক্রিস্টোফ এলিয়ট।'

করমর্দনের জন্যে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলেন প্রবীণ ভদ্রলোক। চোখ নামিয়ে হাতটা দেখল কাউরু। আকারে ওটা অস্বাভাবিক বড়।

BanglaBook.org

হুইলচেয়ার থেকে চাকার সামনে বাড়িয়ে দেয়া পা দুটোও তাই। বসে থাকলেও, তাঁর আকার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে পারছে কাউরু। এমনিতে তিনি প্রকাণ্ডদেহী নন, বরং ছোটখাটোই বলতে হবে, শুধু হাত-পা চোখে লাগার মতো বড়।

কাউরু এবার নিজেকে নিয়ে চিন্তা করছে, কেন তাঁর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছে ও? ওর তো এখন বিস্মিত হওয়া উচিত এ-কথা ভেবে যে *তিনি ওর নাম জানলেন কীভাবে।* ওর সমস্ত কাগজ, পরিচয়-পত্র ইত্যাদি রাকস্যাকের সঙ্গে হারিয়ে গেছে।

করমর্দন করছে কাউরু, খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে ভদ্রলোককে। ডিম আকৃতির মাথা, তাতে একটা চুলও গজায়নি সাদা ত্বক চীনামাটির মতো মসৃণ আর চকচকে। ওই চামড়া দেখে বিচার করলে তাঁকে প্রবীণ বলা অন্যায় হবে। আবার, গলায় আর বাঁ গালে কালো দাগ দেখা যাচ্ছে, এসব দাগ বৃদ্ধ মানুষের গায়েই সাধারণত দেখা যায়। ত্বকের মান খুব ভালো হওয়ায় ওগুলো চোখে লাগছে।

ভদ্রলোক যেভাবে ওর হাত ধরেছেন, কাউরু বুঝতে পারল ওর প্রতি তাঁর কোনো বৈরি ভাব নেই। কাজেই, ভাবল, মনে উঁকি মারা প্রশ্নটা করা যেতে পারে।

'এই জায়গাটা কী?'

এলিয়টের ধূসর চোখ সরু হয়ে গেল, হাসির ক্ষীণ একটা রেখা খেলা করছে তাঁর ঠোঁটের কোনে।

'এটা সেই জায়গা, যেখানে তুমি পৌঁছুতে চেষ্টা করছিলে।'

কিন্তু কাউরু পৌঁছুতে চেষ্টা করছিল গ্রাম সহ বিশাল একটা গুহার ভেতর, যেখানকার লোকজন অসম্ভব দীর্ঘায়ু নিয়ে বেঁচে আছে।

কামরার চারদিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কাউরু। বদ্ধ একটা ছোট্ট কামরা, সাদাটে রূপালি রঙের দেয়াল—না, এ হতে পারে না। ও যা কল্পনা করেছিল তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

কাউরুর হতবিহ্বল ভাব লক্ষ করলেন ভদ্রলোক, বিরাট তর্জনী তাক করে নিজেই একটা প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের ওপরে কী আছে বলে মনে করো?'

সিলিং, তার ওপারে—কী? কাউরু তা জানবে কীভাবে?

কাউরু কিছু বলছে না দেখে তিনি নিজেই জবাব দিলেন।

'পানির একটা মোটা স্তর।'

কাউরু ভাবল—ট্যাংক নয়, পানির স্তর। ভদ্রলোক ঠিক কি বলতে চাইছেন, ওর বোধগম্য হলো না তিনি কি বৃষ্টির সাংকেতিক কোনো নাম ব্যবহার করছেন? গত কয়েকদিন যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে ওর।

BanglaBook.org

ওই একই আঙুল নীচের দিকে তাক করলেন এলিয়ট।

'বলো, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ তার নীচে কী আছে?'

ছোট্ট এই কামরার নীচে কি থাকতে পারে? মাটি, আবার কি। তবে সোজা উত্তরটা উচ্চারণ করতে রাজি নয় কাউরু। ও চুপ করে থাকল।

নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন এলিয়ট।

'বিশাল শূন্যতা।'

ওকে কি বলা হলো বুঝতে পারছে কাউরু: পানি আর শূন্যতার মাঝখানে ঝুলে আছে ও। তবে তাতেও অর্থটা পরিষ্কার হচ্ছে না।

তবে এ থেকে কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। এলিয়ট যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তাহলে এই এলাকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তীব্রতা অস্বাভাবিক কম হবে। যে সব জায়গার নীচে বিপুল মাত্রায় পদার্থ বা বস্তু থাকে সেখানকার মাধ্যাকর্ষণশক্তি বেশি হয়, এবং বিপরীত ক্ষেত্রে কম হয়। ওর পায়ের নীচে বিশাল ফাঁকা বিস্তৃতির মানে হলো, গ্র্যাভিটেশন্যাল অ্যানমালি। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য।

তারপরও বিশ্বাস করতে পারছে না কাউরু। ও কি সত্যি ওর সেই গন্তব্যে পৌঁছেছে? তা যদি পৌঁছে থাকে, আন্দাজ করা গ্র্যাভিটেশন্যাল-অ্যানমালি ম্যাপে যে জায়গার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এটা যদি সেই জায়গা হয়ে থাকে, তাহলে এলিয়ট ওর নাম জানলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

প্রবীণ ভদ্রলোক আমাকে বলবার চেষ্টা করছেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এখানে কম। তিনি জানেন আমি এখানে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছিলাম।

বিভ্রান্ত বোধ করছে কাউরু, ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে দেয়াল ধরতে হলো ওকে। বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। তবে প্রশ্নটা ঠিকই করতে পারল।

'আপনি জানতেন আমি আসছি?'

প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে কাউরুকে ধরে ফেললেন এলিয়ট, তা না হলে পড়ে যেত ও। তারপর নরম সুরে বললেন, 'হ্যাঁ। এখানে তোমার আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

হঠাৎ খুব গরম লাগছে কাউরুর। নিশ্চয় জ্বরটা আবার ফিরে আসছে।

'আগে থেকে শুধু একটা কথা বলা সম্ভব হয়নি, ওই রেকর্ড ভাঙা ঝড়-বৃষ্টি।'

এখন কাউরু এমনকি এও বলতে পারবে না যে ওর শরীরটা পুড়ছে, না বরফে জমে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে জ্বর, কিন্তু হিম হয়ে আছে শরীরের অগভীর অংশ। দাঁড়াবার শক্তি নেই ওর। এলিয়টের কথা অস্পষ্ট লাগছে কানে।

এলিয়টের হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজের চেষ্টায় বিছানার দিকে ফিরছে কাউরু। অর্ধেক দূরত্ব পার হয়ে এসে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল

BanglaBook.org

দুই

পরবর্তী তিনদিন কাউরুর কাজ হলো হারানো শক্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করা। এই সময় পার হলে, এলিয়ট ওকে সব কিছু ব্যাখ্যা করবেন। ওই ঝড়-বৃষ্টি না হলে তার অবশ্য দরকার হত না। আগে নিজের শারীরিক শক্তি পুরোপুরি ফিরে পাক কাউরু, তারপর ওর সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে। তার আগে পর্যন্ত এই ছোট্ট কামরায় আটক থাকতে হবে ওকে, নিজের সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ।

মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়ে ওকে দেখে যান এলিয়ট, তবে ওর যত্ন আর অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে নজর রাখছে হানা, একজন নার্স।

কাউরুর কাছে হানা নামটা দারুণ। জাপানি ভাষায় হানা মানে ফুল। তাকে জিজ্ঞেস করেছে ও, এটা তার আসল নাম কিনা। উত্তর শুধুই হেসেছে মেয়েটা। 'তা সে যাই হোক, আপনি আমাকে এই নামে ডাকতে পারেন আর কি।' তাই ডাকে কাউরু, অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর নামটা সহজই লাগে।

হানা...শব্দটা মালভূমিতে ফোটা বুনো ফুলের কথা মনে করিয়ে দেয় ওকে। ওদেরকে একা রেখে এলিয়ট বিদায় নেয়া মাত্র একের পর এক প্রশ্ন করে হানাকে অস্থির করে তোলে কাউরু। *এটা কি ধরনের ফ্যাসিলিটি? এলিয়ট কে? এসবের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে?*

মাথায় যত প্রশ্ন আসে সব জিজ্ঞেস করে ও। ওর অস্থিরতা দেখে হানা শুধু হাসে আর নিজের শান্ত ভাব ধরে রেখে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ে, বুঝিয়ে দেয় তার কাছ থেকে এসব প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যাবে না।

মুখ আর শরীর দেখে হানাকে একটা শিশু বলে মনে হয় চার ফুট দশ ইঞ্চির বেশি হবে না সে, গাল দুটো ফোলা, গোল গোল চোখ। সে তার রেশমি কালো চুল যদি এলো করে রাখে, কপালের ওপর থেকে পুরো পিঠ ঢাকা পড়ে যায়, তখন তাকে অনেক বড় একটা মেয়ের মতো দেখায়। কিন্তু তা না করে, সমস্ত চুল এক করে মাথার পেছনে বেঁধে রাখে সে, কপাল টান টান হয়ে থাকায় চাপা পড়ে যায় আসল বয়স। তার বুকের ফোলা ভাবটাও কিশোরী মেয়ের মতো, আধফোটা। তবে এর বেশি বড় হবে কিনা সন্দেহ আছে কাউরুর। ছোট স্তন অবশ্য তার একহারা পুবালি কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে গেছে।

কাউরু তার শিশুসুলভ চেহারা দেখে প্রথমে ভুল বুঝেছিল ধরে নিয়েছিল ওর একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিচ্ছে না সে, কারণ তার নিজেরই এসব জানা নেই। তার চেহারায় যে সরলতা আছে সেটাকে অজ্ঞতা বলে মনে হয়েছিল ওর। ফলে তথ্য চেয়ে না পাওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি ওর কোনো রাগ বা সন্দেহ হয়নি

কিন্তু নার্স হিসেবে হানার দক্ষতা এতটাই যে তার চেহারার সঙ্গে সেটা ঠিক মেলে না। ভালো একজন নার্স দেখামাত্র চিনতে পারবে কাউরু, কেননা বলতে

BanglaBook.org

গেলে সেই একেবারে ছোটবেলা থেকে হাসপাতালেই ওর জীবন কেটেছে ব্যাপারটা যেন, ওর ঠিক কোথায় কীভাবে চুলকাতে হবে হানার তা জানা আছে। পুরোপুরি দক্ষ সে. তার কোনো নড়াচড়া কখনও এতটুকু অপচয় হয় না।

ওর সব কাজই করে দেয় সে–শিরায় স্যালাইন দেয়ার জন্যে তৈরি করে ওকে, অ্যান্টিবায়োটিক পুশ করে, লক্ষ রাখে ওর যাতে যথেষ্ট ঘুম হয়।

নিজের কাজ করার সময় প্রায় নির্লিপ্তই থাকে হানা। তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় একটা ক্ষিপ্রতা লক্ষ করেছে কাউরু। মনে প্রশ্ন জেগেছে, যদিও হানার প্রতি সেটা অন্যায় হয়ে যায়, সে কি ওর শরীরের ছোঁয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে? কারণ, কাউরু খেয়াল করেছে, মাঝে মধ্যে ওকে স্পর্শ করতে গেলে ইতস্তত একটা ভাব চলে আসে হানার হাতে।

শুধু তাই নয়, কাউরু আরও লক্ষ করেছে, ওর দিকে চোরা চোখে তাকায় মেয়েটা, ও যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়, এলিয়েন বা অন্য কিছু। যত দিন যাচ্ছে, তত বেশি এসব লক্ষ করছে ও।

হানার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দুদিন পরের ঘটনা। শব্দ শুনে কাউরু বুঝতে পারল কামরার ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে সে। চোখের পাতা অল্প একটু খুলে ঘুমিয়ে থাকার ভান করল ও। দ্রুত হাতে স্যালাইনের ব্যাগ বদলের সময় কৌতূহলী চোখে ওকে দেখল হানা। তার চোখে ওটা যেন মনে হলো খুব অশুভ একটা কৌতূহল। ওকে যেন ভয় পায় মেয়েটা, একই সঙ্গে কাউরু যেন তাকে খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এতে করে কাউরুর আগ্রহ বেড়ে গেল। মুখে ওরকম একটা ভাব নিয়ে ওর সম্পর্কে ঠিক কি ভাবছিল হানা? ওর মধ্যে কি দেখে তার এই প্রতিক্রিয়া?

ব্যাগটা বদলে ওর দিকে ঝুঁকল হানা, নিতম্ব পেছনে ঠেলে দেয়া, নার্ভাস ভঙ্গিতে লক্ষ করছে ওকে। সন্দেহ নেই সে ধরে নিয়েছে ও ঘুমাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এত ভয় পাচ্ছে কেন সে? কি কারণে এত সতর্কতা?

ঝট করে চোখ খুলল কাউরু, হানার হাতটা প্রায় খামচে ধরল। ওর ইচ্ছে ছিল না তাকে চমকে দেয়, তবে দেখা গেল হানা ভীষণ চমকেছে। চিৎকার করতে চাইলেও, গলা থেকে কোনো আওয়াজ বের হলো না, গলার ভেতরই মরে গেল সেটা। শুধু হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল।

'আপনি আমার দিকে এভাবে তাকান কেন, যেন একটা ভূত দেখছেন?' ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে জানতে চাইল কাউরু। চাইছে আগে শান্ত হোক হানা। একটা হাত, যেটা ধরেনি ও, নিজের গালে চেপে ধরেছে সে। প্রায় কোনো বাধাই দিচ্ছে না ওকে। ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে না, ওর দিক থেকে মাথাটাও অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়নি। গলায় উঠে আসা চিৎকারটা গিলে ফেলল, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। সন্দেহ হলো হঠাৎ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কেঁদে ফেলতে পারে। এই ভাবটা তার শিশুসুলভ চেহারায় সম্পূর্ণতা এনে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

'আমি জানতে চাই ! আপনি আমার দিকে ওভাবে তাকান কেন?'

চেহারায় বিষণ্নতা, মাথা নাড়ল হানা। 'আমি দুঃখিত।' শব্দগুলো মনে হলো যেন অন্তরের গভীর থেকে উঠে এল. তবে তাতে প্রশ্নের উত্তর নেই ! কাউরু এর দুরকম অর্থ করতে পারে। ক্ষমা চাইছে হানা– হয় ভুত মনে করে ওর দিকে তাকানোর জন্যে, নয়তো উত্তর দিতে না পারার জন্যে। কিংবা হয়তো দুটোর জন্যেই।

হাতটা ছেড়ে দিল কাউরু।

তার কাজ শুধু স্বাস্থ্য ফিরে পেতে ওকে সাহায্য করা। অন্য কোনো বিষয়ে ওর কাছে মুখ খোলা তার নিষেধ। ওর দিকে তাকানোর ভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গেলে, ও যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে তার সবটুকু খুলে বলতে হবে, আর সেটা হানা পারে না। এটা বোঝার পর তার ওপর চাপ দেয়া বন্ধ করল কাউরু।

ছেড়ে দিলেও, ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হানা।

'কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না?' কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন সে, প্রথম সুযোগেই নিজের রোগী সম্পর্কে খবর নিচ্ছে।

কাউরু বলল, 'কথা বলতে *না* পারাতেই আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ, তাহলে, নিজের সম্পর্কে আপনি আমাকে সব বলছেন না কেন?' একটু হাসার চেষ্টা করল হানা।

'কী জানতে চান আপনি?'

'আসুন, দেখা যাক...আপনার জন্ম থেকে শুরু করলে কেমন হয়?'

'যদি জিজ্ঞেস করি, তাতে আপনার কি লাভ হবে?'

'খুব কম লাভটার কথাই যদি ধরি, আমি বোধহয় একটা ভুত মনে করে আপনার দিকে আর তাকাব না।'

অন্য ভাষায়, ওর সম্পর্কে হানা কিছুই জানে না। যদি কিছু জানত, তাহলে অবশ্যই ওকে নিজের মতো আরেকজন মানুষ হিসেবে দেখার কারণ খুঁজে পেত সে।

'প্রথমে আমি আপনার সম্পর্কে শুধু একটা কথা জানতে চাই,' বলল কাউরু।

কথা না বলে নিজেকে তৈরি করল হানা।

'আমার তরফ থেকে যদি বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়, আমি জানতে চাই আপনার বয়স কত?'

হেসে উঠল হানা। সন্দেহ নেই প্রশ্নটা বহুবার শুনতে হয়েছে তাকে।

'আমার একত্রিশ চলছে। আমি বিবাহিতা, দুই সন্তানের জননী। দুটোই ছেলে

বিস্ময়ে কাউরুর চোয়াল ঝুলে পড়ল। কিশোরী মনে হয় হানাকে, অথচ বলছে

BanglaBook.org

একত্রিশ। আবার দু'ছেলের মাও! এটা একদম অপ্রত্যাশিত।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'সবাই তাই বলে।'

'আমি নিশ্চিত ছিলাম আপনি আমার চেয়ে ছোট হবেন।' ওর বিশ চলছে, তারমানে হানার চেয়ে এগারো বছরের বড়।

'আপনার কত?'

বলল কাউরু। ভ্রূ কোঁচকাল হানা, নিচু গলায় বলল, 'সত্যি?'

'আমাকে দেখে আরও বড় মনে হয়, তাই না? তবে আমার সত্যি বিশ।'

নিজের গালে হাত বুলাল কাউরু। মরুভূমিতে আসার পর দাড়ি কামায়নি। তারমানে ওকে বোধহয় আরও বেশি বয়স্ক লাগছে।

হানার বয়স ওর চেয়ে কম, এটা এখনও ভুলতে পারছে না কাউরু। নিজেকে সতর্ক করে দিল, তার সঙ্গে এখন থেকে অন্যরকম আচরণ করতে হবে।

পরস্পরের বয়স জানার পর ওদের মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন এসেছে। ওই ঘটনার পর কাউরুর দিকে যখনই তাকায় হানা, নিজের সম্পর্কে তাকে আরও কিছু বলার সুযোগ খোঁজে ও।

ভালো শ্রোতা হানা। সারাদিনে অল্প কয়েকবার কামরায় ঢোকে সে, কথা বলার জন্যে সীমিত একটা সময় পায় ওরা, প্রতিবার হয়তো দশ মিনিট। তবে সেটা খুব ভালোভাবে কাজে লাগায় হানা, প্রসঙ্গ থেকে কখনও সরে না, সব সময় কাউরুর অতীত জীবন থেকে আরও কিছু বের করে আনে।

কাউরু দেখল, হানার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে ওর, তাকে সব কথা জানানোর মধ্যে উপভোগ্য কি যেন একটা আছে। ওর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করছে। হ্যাঁ, অবশ্যই, মনে সন্দেহও জাগে, তবে সে-সব একপাশে সরিয়ে দিয়ে থেমে থেমে নিজের কথা বলে যাচ্ছে।

হানাকে নিজের ছেলেবেলার কথা বলল কাউরু, তখন কি ভাবত, কি ধরনের স্বপ্ন দেখত। মা-বাবার সঙ্গে কাটানো জীবনের টুকুরো-টাকরা। সবাই একসঙ্গে আমেরিকার মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান।

কিছু বিষয়ে কথা বলতে খুব কষ্ট হলো। সবচেয়ে কষ্ট দিল ওর বাবার ক্যানসার: কীভাবে সেটা ওদের বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানটাকে বাতিল করে দিল, সেই থেকে কীভাবে তাদের সবার জীবন হাসপাতালকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করল। ক'বছর পর কীভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হলো, তাঁর ক্যানসারের জন্যে দায়ী মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাস, এবং তাঁর সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভবনাই নেই। কাউরুর মা ম্যাচিকো হাল ছাড়তে রাজি না হয়ে, আদিবাসী আমেরিকান লোককাহিনির ভেতর ডুব দিয়ে কি ধরনের মিরাকল ঘটার অপেক্ষায় আছেন বাবার অসুস্থতা আর মার আধ্যাত্মিকতার ভেতর ডুব দেয়া, কীভাবে কাউরু বাধ্য

BanglaBook.org

হয়েছে দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য আনার জন্যে অ্যাস্ট্রফিজিক্স বাদ দিয়ে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে।

কথা বলার সময় প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গের জন্যে একটা মন কেমন করা অনুভূতি হয়েছে কাউরুর, বলা যেতে পারে নস্টালজিয়া। চার দিনে, সব মিলিয়ে, দুই কি তিন ঘণ্টা হানার সঙ্গে কথা বলেছে ও। ওই সময়ের ভেতর জীবনের সব কথা হানাকে বলা নিশ্চয়ই ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না, অনেক কিছু বাদ দিতে হয়েছে, আবার কিছু কেটে-ছেঁটে সংক্ষেপ করতে হয়েছে। তবে এও ঠিক যে অনেক কথা নতুন করে মনে পড়ে গেছে ওর। মাঝে মধ্যে চোখের পানি আটকাবার জন্যে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, আবার কখনও বাবার কোনো পাগলামির বর্ণনা দিতে গিয়ে অদম্য হাসিতে ফেটে পড়েছে।

যে জীবন দু'তিনঘণ্টার মধ্যে বলে শেষ করা যায়–সেটা কি সত্যি বাস্তব হতে পারে? কথা বলার সময়, ওর আরও পুরোনো স্মৃতিগুলো ঝাপসা হতে শুরু করল।

'আপনি কখনও প্রেমে পড়েননি?'

ঠিক সময়ে প্রশ্নটা করেছে হানা। ওই মুহূর্তে কাউরু ভাবছিল রাইকোর কথা হানাকে বলবে কি বলবে না। মন চাইছিল প্রসঙ্গটা না তোলে, হানা জিজ্ঞেস না করলে বাদ দিয়ে যেত।

হানাকে রাইকোর কথা বলা মানে অবশ্যই রিয়োজির কথাও বলা। সেই অভিজ্ঞতা এখনও বিষণ্নতায় ডুবিয়ে রেখেছে ওকে। বিষণ্নতার চেয়ে ব্যথাটা কঠিন। প্রথমেই অনুশোচনায় ভোগে কাউরু, নিজের অবিবেচনাপ্রসূত আচরণের কথা ভেবে লজ্জা পায়। ও উপলব্ধি করে যে কামরায় রাইকোর সঙ্গে আনন্দ করেছে আর যে কামরায় এখন দিন কাটাচ্ছে, দুটো একই রকম। রিয়োজির কামরায় অবশ্য পশ্চিমমুখো বিরাট একট জানালা ছিল, ওখানে দাঁড়ালে সবুজ গাছগাছালিতে ভরা পার্ক দেখা যেত, অস্তগামী সূর্যের রশ্মি ঢুকত ঘরে; কিন্তু ওর এই কামরায় কোনো জানালা নেই। ওটা বাদ দিলে, আকার আর দেয়ালের রঙ, হুবহু একই রকম।

যতভাবেই চেষ্টা করুক কাউরু, রাইকো ওকে যে যৌনসুখ দিয়েছে হানাকে তা কক্ষনো বোঝাতে পারা যাবে না।

অনুভূতিটা সততার সঙ্গে স্বীকার করল ও। চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে মাঝে মধ্যে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল হানা, এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল, বলল, 'ওহ্, না,' সুরটা শোকে কাতর। তারপর যখন কাউরু প্রকাশ করল রাইকো ওর সন্তান ধারণ করছে, হানার চেহারা জমে গেল।

'আর এই বাচ্চা...জন্মাবে?'

প্রশ্নের ধরনটা অদ্ভুত, ভাবল কাউরু, তবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্যে থামল না।

'অবশ্যই, আমি চাই ওকে নিয়ে আসুক সে। সেজন্যেই এখানে আমি এসেছি।'

BanglaBook.org

চোখ বুজল হানা। তার ঠোঁট কাঁপছে, মনে হলো বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে সে, যদিও শব্দগুলো কাউরু শুনতে পাচ্ছে না।

জানালাবিহীন কামরায় সময় বোঝার একমাত্র উপায় ওর হাতঘড়ি। ওটাকে যদি বিশ্বাস করা যায়, আজ চতুর্থ দিনের সন্ধ্যা

রাইকো আর ওদের সন্তানের কথা শোনার পর হানা বলল, 'আজকের মতো এখানেই থামি আমরা।' নিজের সময় নিয়ে যা খুশি করার অনুমতি বোধহয় দেয়া হয়নি তাকে। ওদের আলাপের সময় যখন তার মনে হবে এটাই থামার আদর্শ জায়গা, তখনই থেমে যায় সে।

'তবে বাকিটা আমি কাল শুনব,' নরম সুরে বলল হানা।

এই মহিলা, যাকে কাউরু একসময় শিশু বলে মনে করেছিল, জননীসুলভ মমতা নিয়ে হাজির হয়েছে ওর জীবনে।

কাউরুর কনুই ধরল হানা, এক মুহূর্ত দেখল ওকে, তারপর ঘুরে দরজার দিকে এগোল। ওখানে পৌঁছে থামল একবার, কাঁধের ওপর দিয়ে বিছানার দিকে তাকাল, তারপর বেরিয়ে গেল হলওয়েতে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর সময় হানার চেহারায় যে ভাব দেখল কাউরু, জ্বলন্ত একটা ছাপের মতো গেঁথে গেল ওর মনে। এটা আগে কোথাও দেখেছে ও।

মুখের অভিব্যক্তি নিয়ে চিন্তা করছে কাউরু, সিদ্ধান্তে এল ওগুলো সাধারণত সীমিত কিছু শ্রেণীতে ফেলা যায়। মানুষ সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করে: উদাহরণ হিসেবে, ভালো একটা খবর শুনলে, মানুষ একটা লাফ দেয়। ও হিসেব করছে, হানার মুখভাব কোন শ্রেণীতে ফেলা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা মনে পড়ল, এমন কিছু যেটা সব সময় ওর সঙ্গে আছে।

সেই একই পরিস্থিতি। একজন নারী, হানার মতো সাদা কাপড় পরা, অসুস্থ কারও কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে, ঘাড় ফিরিয়ে শেষ একবার দেখে নিচ্ছে রোগীকে। একজন নার্স।

একবার, কদিনের জন্যে, ওর বাবাকে আরও বড় একটা কামরায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সার্জারির মাধ্যমে মলনালী থেকে মাত্র ক্যানসার সরানো হয়েছে, লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। চারজন থাকার মতো বড়সড় একটা কামরা ছিল ওটা, প্রতিটি বেডে একজন করে ক্যানসার রোগী।

ওই কামরায় যে-সব নার্স আসা-যাওয়া করত তাদের মধ্যে একজনকে খুব পছন্দ করত রোগীরা। দেখতে যে খুব সুন্দর, তা নয়, তবে তার চেহারাটা যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল, এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে ছিল ওই জাতের নারী যারা ভালোমানুষি আর মমতার আভা ছড়ায়। রোগীদের শত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করত সে, প্রতিটি অভিযোগ মন দিয়ে শুনত, তাঁদের সবরকম দাবি আর চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করত। কাউরুর বাবাও খুব পছন্দ করত ওই নার্সকে। তার সঙ্গে

BanglaBook.org

কৌতুক করতেন তিনি, হাত দিয়ে নিতম্ব ছুঁয়ে দিতেন, শুধুই একটা শিশুর মতো তার দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার জন্যে।

একটা সময় এল যখন হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেল ওই নার্স. তবে কিছুদিনের জন্যে। সেটা ছিল তার বিয়ের দ্বিতীয় বছর, পেটে সাত মাসের বাচ্চা। এক বছরের মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছে।

সেদিন শেষবারের মতো হাসপাতালে এসে কাউরুর বাবার কামরায় ঢুকেছে, বিদায় নেবে। ওই সময় বাবাকে দেখতে গেছে কাউরু। রোগীদের সবাইকে নার্স বলল, তার আশা আগামী বছর এসে সে যেন সবাইকে হাসিখুশি দেখতে পায়।

রোগীদের একজন কৌতুক করে জবাব দিলেন, 'তুমি যখন ফিরবে, মিষ্টি মেয়ে, এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব আমি।'

কাউরুর মনে আছে আরও দুজন রোগীও প্রায় এই একই রকম মন্তব্য করেছিলেন, তবে ওর বাবা নন। ওই রোগীরা কতটা আন্তরিক ছিলেন তা আসলে বলা সম্ভব নয়। যাই হোক, ঘুরে ঘুরে প্রতিটি বেডের পাশে গিয়ে বিদায় নেয়ার সময় একমত পোষণ করে মাথা ঝাঁকিয়েছিল নার্স।

তারপর, যখন সে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন ফিরে বিছানায় শুয়ে থাকা রোগীদের দিকে তাকাল, এইমাত্র ঠিক হানা যেভাবে ওর দিকে তাকিয়েছে। ওই সময় নার্সের চোখের ভাব কাউরুর দৃষ্টি এড়ায়নি: সে দৃষ্টিতে কাতরতা ছিল, রোগীদের মধ্যে তাঁরা আছেন এক বছর পর ফিরে এসে যাঁদেরকে সে দেখবে না, দেখতে পাবে না। আর, দেখতে পাবে না তারা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে বলে নয়, মারা যাবে বলে। তার ওই দৃষ্টিতে ছিল দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়ার বেদনা।

কাউরুর বাবার পাশের বেডের রোগী তখন সবেমাত্র জেনেছেন তাঁর ফুসফুসের ক্যানসার মগজেও পৌঁছে গেছে। তাঁর পাশের রোগী দিন কয়েক আগে প্রোস্টেট ক্যানসারের কাছে নিজের পুরুষত্ব খুইয়েছেন। ওই ক্ষমতা একা শুধু ওর বাবার অক্ষুণ্ন ছিল। বাকি সবাই দিনক্ষণ ধরে মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় ছিলেন।

নার্সের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল এই সচেতনতা। আর ওই একই দৃষ্টি দেখতে পেয়েছে কাউরু হানার দৃষ্টিতে, ওর দিকে তাক করা।

হানা আমার দিকে ওভাবে তাকাল কেন?

অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে কাউরু। সম্ভব হলে সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করত ও।

কিন্তু দেখা গেল, হানার সঙ্গে ওর আর কখনও দেখা হবে না।

পরদিন, যথা সময়ে, নক হলো দরজায়। হানাকে দেখতে পাবে আশা করে দরজা খুলল কাউরু, কিন্তু তার বদলে এলিয়টকে দেখতে পেল, তাঁর বিশাল পা হুইলচেয়ারের সামনে ফেলা, প্রকাণ্ড হাত জোড়া চাকার ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে।

BanglaBook.org

কাউরু দ্রুত ওর শক্তি ফিরে পাচ্ছে বুঝতে পেরে সন্তুষ্টচিত্তে মাথাটা একটু ঝাঁকালেন এলিয়ট।

'কেমন আছ তুমি?'

কাউরুর ধৈর্য প্রায় শেষসীমায় পৌঁছে গেছে। ওর মনে কত প্রশ্ন, অথচ দীর্ঘদিন হয়ে গেল সব একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে! হানার মমতা আর সহানুভূতি কিছুটা ভুলিয়ে রেখেছিল ওকে, কিন্তু এলিয়টের মুখোমুখি হয়ে বুঝতে পারছে, ওর পক্ষে আর ধৈর্য ধরা সম্ভব নয়, এবার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হবে ওকে।

আমি কেমন আছি? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন নাকি? সব সময় শুধু আমাকেই কেন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে? আমার শারীরিক শক্তি ফিরে এসেছে, কিন্তু এখানকার গতি যেরকম শ্লথ দেখছি আমি না নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের শিকার হতে হই। সত্যি কেমন আছি আমি!

রাগটা দমন করল কাউরু, তবে খুব একটা দক্ষতার সঙ্গে নয়। কথা বলার সময় ওর গলা কাঁপতে লাগল। 'আমি একদম ঝরঝরে।'

কাউরুর গলায় উত্তেজনা, টের পেলেন এলিয়ট। হাতটা উঁচু করলেন তিনি, যেন একটু থামতে বলছেন কাউরুকে। খানিক পর বললেন, 'বুঝেছি। তোমার অনুভূতি আন্দাজ করতে পারছি। সময় হয়ে এসেছে, এবার তোমার প্ল্যান ধরে কাজ শুরু করব আমরা।'

প্ল্যান? কিসের প্ল্যান? আর, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

চেহারায় কঠিন একটা ভাব নিয়ে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে এলিয়টকে চাপ দিল কাউরু। 'প্রথমে আপনি আমাকে জানান আমি কোথায় রয়েছি। তারপর বলুন আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী।'

দু'হাতের তালু এক করে চাপ দিলেন এলিয়ট।

'প্রথমে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছে কাউরু।

এরপর কথা বলার সময় এলিয়টের গলার আওয়াজ ভারি আর গম্ভীর শোনাল।

'তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

BanglaBook.org

তিন

এলিয়ট ওকে জানালাবিহীন একটা কামরায় নিয়ে গেলেন। পুরো এই জায়গাটা এভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছে কেন? জানালা ছাড়া কামরা খুব অপছন্দ করে কাউরু! তবে আগের কামরার চেয়ে বড় এটা। মাঝখানটা একটা লেদার লিভিং

রুমের মতো করে সাজানো।

কাউরুকে কাউচে বসতে ইঙ্গিত করলেন এলিয়ট। বসল ও। হুইলচেয়ার ছেড়ে ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এলিয়ট। দাঁড়ালেন তিনি, পেছনটা আরও পেছনে ঠেলে দেয়া, তারপর ক্র্যাচ কিংবা ছড়ির সাহায্য ছাড়াই থেমে থেমে এগিয়ে এসে কাউরুর সামনের কাউচে বসলেন।

ঠায় তাকিয়ে না থেকে উপায় কি কাউরুর। এলিয়ট যেহেতু হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন, ও ধরে নিয়েছিল তিনি হাঁটতে পারেন না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা তিনি পারেন: ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, তবে একবারও মনে হলো না যে পড়ে যাবেন।

কাউরুকে অবাক হতে দেখে এক ঝলক বিজয়ীর হাসি হাসলেন এলিয়ট। 'আগে থেকে ধারণা করে নিয়ে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ো না। কিচ্ছু বিশ্বাস করবে না।'

যদিও বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই, সবকিছুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে অনেক আগে থেকেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে কাউরু। মরুভূমি পেরোবার সময় একটা জিনিস শিখেছে ও—রিয়্যালেটি আর ভার্চুয়ালিটির মাঝখানে ঝাপসা রেখা ধরে হাঁটার সময় কীভাবে নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে হয়। শৈলশিরার ওপর তুমুল ঝড়-বৃষ্টির সময় সবচেয়ে বেশি চেয়েছে কাউরু ওই জিনিসটা যেন হারিয়ে না ফেলে।

'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কখন?' একটু মেজাজ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কাউরু, এলিয়টের প্রশ্নটা গ্রাহ্য না করে।

একটা হাত উঁচু করলেন এলিয়ট, যেন বলতে চাইলেন, *যখন তুমি বলবে।*

কত কিছু জানতে চায় কাউরু। ঠিক করল আপাতত মূল প্রশ্নগুলো একপাশে সরিয়ে রাখবে, জানতে চাইবে এলিয়টের তোলা একটা প্রসঙ্গে, শোনার পর থেকে খুব অস্বস্তির মধ্যে আছে ও।

'অনেক আগে থেকেই নিয়তি আমাকে এখানে নিয়ে আসতে চেয়েছে; আপনিও আমাকে সে-কথাই বলেছেন, ঠিক? আপনি বলেছেন, "এখানে তোমার আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।" '

কাউরু জানতে চায় কেন তিনি কথাটা বললেন। সন্দেহ নেই, এটা এলিয়ট স্রেফ একটা কথার কথা হিসেবে বলেছেন, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিটা কাউরুকে খুব অস্থিরতা মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

'সেটা ব্যাখ্যা করার সময় আরও একটু পরে আসবে। আমরা যদি নিয়ম-শৃংখলার ভেতর দিয়ে না যাই, দেখা যাবে তুমি শুধু চেঁচাচ্ছ।'

'সেক্ষেত্রে, বাকি সব কিছুর ব্যাখ্যা দিন আমাকে, আমি যাতে বুঝতে পারি কিসের মধ্যে এসে পড়লাম, কি ঘটতে চলেছে—আমি যাতে না চেঁচাই—ঠিক?'

আবার উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কাউরু। এলিয়টের কথা বলার ঘোরানো-পেঁচানো ধরন ভুল দিকে ঠেলে দিচ্ছে ওকে। কাউরু অনুভব করছে এই ব্যক্তি ওর

BanglaBook.org

জীবনের হাল ধরে রেখেছেন, এবং ওর মা-বাবার উদ্দেশে হাসছে, যাঁরা ওকে এই দুনিয়ায় নিয়ে এসেছেন।

'কাজটা করার এটাই একমাত্র উপায়। আমার সিদ্ধান্ত ছিল, এখানে আমি তোমাকে কখনোই জোর করে নিয়ে আসতে পারব না। তোমাকে আসতে হবে তোমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়। আর, এখন তোমার দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ভুল হয়নি।'

কথাগুলো এলিয়ট যেন নিজেকেই শোনালেন, তারপর ঠোঁট মুড়ে একটু হাসলেন। তাঁর শেষ কথাটা এমন সুরে বলা, তিনি যেন কাউরুর জীবনে হস্তক্ষেপ করছেন। ওই মুহূর্তে কাউরুর ইচ্ছে হলো তাঁর ঘাড় ধরে খুব জোরে মোচড় দেয়।

কাউরুর কঠিন দৃষ্টি গায়ে মাখছেন না এলিয়ট। কিছু সময় দুজনেই চুপ করে থাকল।

এলিয়টই আবার শুরু করলেন। 'লূপ সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি?' তাঁর হাত দুটো নিজের সামনে এক করা, চোখ তুলে কাউরুর দিকে তাকানোর মধ্যে ছেলেমানুষি একটা ভাব আছে।

'ওটা একটা কমপিউটার সিম্যুলেশন, ডিজাইনে উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়া হয়েছে।'

ভ্রূ কোঁচকালেন এলিয়ট, উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

'ডিজাইনে উৎকর্ষতা? এতে এমনকি অংশবিশেষও বোঝা গেল না। আমি যখন লূপ তৈরি করি, সমস্ত দিক থেকে নিখুঁত একটা দুনিয়া তৈরি করি।'

'লূপ আপনি তৈরি করেছেন?'

'আমার বোধহয় বলা উচিত, আমরা; তবে, সত্যি কথা, ওটার কাঠামো সম্পর্কে আমিই প্রাথমিক আইডিয়া দিয়েছিলাম।' এখন যখন তিনি লূপ সম্পর্কে আলোচনা করছেন, এলিয়টের কথার সুরে ক্ষীণ হলেও কানে বাজার মতো গর্ব প্রকাশ পাচ্ছে। কথাগুলো বেরিয়ে আসছে যেন বাঁধ ভাঙা জলোচ্ছ্বাস, চেহারায় মাঝে মধ্যে উল্লাসের মতো কিছু একটা প্রকাশ পাচ্ছে।

'আমি তখনও এমআইটি-র ছাত্র। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, আমি তখন তোমার বয়সী–তা সে প্রায় সত্তর বছর আগের কথা! দুনিয়ার তখন অ্যাস্ট্রনটদের সঙ্গে প্রেম চলছে–সবেমাত্র আমরা চাঁদে গেছি–সবাই বিশ্বাস করছে খুব তাড়াতাড়ি স্পেস স্টেশন পেয়ে যাব আমরা, স্পেস ট্যুরিজম শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু মহাশূন্য নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল না। আমার দৃষ্টি ফেরানো ছিল আরেক দুনিয়ার দিকে, যেটা আমি নিজে বানাতে চেষ্টা করছিলাম।'

একবারও না থেমে কথাগুলো বলার পর, মাথা নোয়ালেন এলিয়ট, ঠোঁট জোড়া একটু ভিজিয়ে নিলেন।

'ভালো কথা, তুমি জানো, দুনিয়াটা কীভাবে চলে?'

BanglaBook.org

'বাস্তব দুনিয়া, নাকি লূপ?'

লূপকে কী চালাচ্ছে তা তো সহজেই দেখতে পাওয়া যায়: ইলেকট্রিসিটি। কিন্তু বাস্তব দুনিয়া...সেটা সম্পূর্ণ অন্য গল্প।

কাউরুর প্রশ্ন শুনে হেসে উঠলেন এলিয়ট

'এক্ষেত্রে, দুটোয় প্রচুর মিল আছে। একই নিয়মে চলে ওগুলো। জগৎকে যে জিনিস চালায়–দুটো জগৎকেই–ফান্ডিং। আরও পরিষ্কার করে বললে–টাকা।'

এক মুহূর্ত থামলেন এলিয়ট, যেন কাউরুকে কথাটা হজম করার সময় দিলেন, তারপর আবার শুরু করলেন, 'অতিকায় লূপ প্রকল্পে টাকা ঢালা না হলে এই দুনিয়াটা অস্তিত্ব পেত না। না এই দুনিয়া, না ওই দুনিয়া, টাকা ছাড়া দুটোই একদম অচল।'

কাউরু এখন মন দিয়ে শুনছে, প্রবল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে এলিয়ট এরপর কি বলবেন শোনার জন্যে, দেখতে চায় এ-সবের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কোথায়।

শুধু যদি টাকা বা বাজেট থাকত, আমরা সবাই এখন স্পেস স্টেশনে থাকতে পারতাম। এলিয়ট ঠিক কথাই বলছেন। বিজ্ঞান, কাউরু জানে, সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবমুক্ত বদ্ধ শূন্যতার ভেতর একটা সরলরেখা নয়। বরং পরিস্থিতির চাপে পড়ে মাঝে-মধ্যে দিক পরিবর্তন করেছে। সরকার আর সমাজের মতামতের ওপর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বাজেট–কিসে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যেকোনো কালে, তা ঠিক হয়েছে মানুষ সবচেয়ে বেশি কি চায় তার ওপর ভিত্তি করে। সত্তর বছর আগে, ক্যানভাস ছিল মহাশূন্য, যার ওপর ভবিষ্যৎ আঁকা হবে বলে প্রত্যাশা করা হত। সবাই কল্পনা করত মানবজাতি চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহে বসতি গাড়বে, শাটলগুলো নির্দিষ্ট সময় ধরে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে আসা-যাওয়া করবে নিয়মিত। উপন্যাস আর সিনেমার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল এটা।

কিন্তু কাউরুর সময়ে এসে দেখা গেল, মানুষ শুধু যে মঙ্গলে যায়নি, তা নয়, সে এমনকি চাঁদেও ফেরেনি। শেষে দেখা গেল, পৃথিবীর স্যাটেলাইটে মানুষের উপস্থিতি ওই সেই সংক্ষিপ্ত, উজ্জ্বল মুহূর্তের মধ্যেই সীমিত থেকে গেছে। তার পর থেকে মহাশূন্য অভিযান গতি হারিয়েছে, প্ল্যান তৈরি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সবই সহজ একটা কারণে: ফান্ড নেই।

পেছনের দিকে তাকালে মনে হয়: আকস্মিক এই থেমে যাওয়াটা আগে থেকে কেউ আঁচ করতে পারেনি।

তবে, এলিয়ট দাবি করছেন, তিনি সত্যি সত্যি আঁচ করতে পেরেছিলেন। নিজের দূরদৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ভদ্রলোক, কারণ তিনি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পূর্ণ অন্য একদিকে কাজে লাগাচ্ছিলেন। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার বিষয় হিসেবে কমপিউটার আর মলিকিউলার বায়লজি বেছে নেন তিনি। এখন কাউরু যে

BanglaBook.org

কমপিউটার ব্যবহার করছে তার তুলনায় ওই আমলে ওগুলো ছিল আদিম পর্যায়ে। তবে বায়লজিতে, সবেমাত্র ডাবল হিলিক্স আবিষ্কৃত হওয়ার মাধ্যমে, তখন একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। প্রায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ষষ্ঠইন্দ্রিয় উসকে দেয় এলিয়টকে, উন্নতির ধারায় থাকা এই দুটো ক্ষেত্রকে এক করো। তাঁর প্রথম রিসার্চ প্রজেক্টে সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়েছিল: কমপিউটারের ভেতর আর্টিফিশাল লাইফ ফর্ম তৈরি করা সম্ভব কিনা।

নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকায় এক সময় ফল পেতে শুরু করলেন এলিয়ট। তিনি যেমন আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, চোখের সামনে ঘটতে দেখলেন সেটা: সমাজের আগ্রহ মহাশূন্য অভিযান থেকে সরে গেছে, তার বদলে বিপুল উৎসাহে চাক্ষুষ করছে ক্রেতা-বান্ধব তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ একটা জগৎ কীভাবে জন্ম নিচ্ছে। যুগের তারকা হয়ে দাঁড়াল কমপিউটার, এবং এলিয়ট হঠাৎ করে দেখতে পেলেন নিজের কাজ উপস্থাপন করার জন্যে কিছু ভেন্যু রয়েছে তাঁর, ওগুলোর মাধ্যমে তিনি শ্রোতাদের কাছেও পৌঁছুতে পারবেন।

পালে নতুন বাতাস নিয়ে প্রথম সেলফ-রেপ্লিকেটিং প্রোগ্রাম তৈরির কাজে হাত দিলেন এলিয়ট, আর তারপরই প্রথম সফটঅয়ার, যেটা আপনা থেকেই নিজের কপি তৈরি করতে পারবে। যা কিছু হচ্ছে, মূল প্রশ্ন ভুলে গিয়ে নয়: *কমপিউটারের ভেতর কৃত্রিম প্রাণ তৈরি করা সম্ভব?*

প্রত্যাশার চেয়ে আগেই কাছে চলে এসেছে তাঁর লক্ষ্য, এটা তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এসে। বললেন, শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে সম্ভব বলে ভাবেননি। নিজেকেও চমকে দেন তিনি। অবশ্যই, ওই পর্যায়ে যে অস্তিত্বকে তিনি প্রাণ বলে অভিহিত করতেন সেগুলোর কাঠামো ছিল একদম সহজ, অনস্ক্রিনের চারধারে এমনভাবে নড়াচড়া করত যে পরজীবী কীট ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে মিল দেখা যেত না।

তারপর তিনি নারী ও পুরুষ আনার ব্যবস্থা করলেন, এবং নতুন শতাব্দীর শুরুতে কমপিউটারের ভেতর নতুন প্রাণের আবির্ভাব ঘটল, নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে। নতুন কোষ বার বার ভাগ হচ্ছে, একসময় ডিসপ্লের চারদিক চরতে শুরু করল, ঠিক তাদের মা-বাবার মতোই এলিয়ট বললেন, দৃশ্যটা নতুন শতাব্দীর জন্যে উপযোগী এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ

এরপর সবকিছুতে গতি চলে এল। জীবনের সমস্ত প্রকারের জন্যে মূল প্রক্রিয়া একই রকম। মাছ কিংবা উভচর উৎপাদন স্রেফ অভিযোজন একত্রিত করার একটা ব্যাপার মাত্র–উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে জড়ো করা উপযুক্তকরণ পদ্ধতি নিয়ে কাজ করা।

এটুকু অর্জন করার পর এলিয়ট তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্যে একটা বিবর্তন ঘটানোর অনুমোদন পেলেন। এবার প্রশ্নটা দাঁড়াল: *ভার্চুয়াল স্পেসে পৃথিবীর মাপকাঠিতে*

BanglaBook.org

একটা জীবমণ্ডল সৃষ্টি সম্ভব কি?

এটাই হলো লূপ প্রজেক্টের উৎস বা সূচনা, এমন একটা আইডিয়া, ওই পর্যায়ে যেটার পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

এলিয়টের আমন্ত্রণে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা একটি মাত্র লক্ষ্যে কাজ শুরু করলেন। কমপিউটার বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, মলিকিউলার বায়লজিস্ট, ইভ্যুলুশনারি থিয়রিস্ট, অ্যাস্ট্রফিজিসিস্ট, জিওলজিস্ট, মিটিয়রলজিস্ট–বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা থেকে পণ্ডিতশ্রেণীর মানুষজন জড়িত হলেন এর সঙ্গে। তবে শুধু কঠিন বিজ্ঞানের ওপর সীমাবদ্ধ থাকল না দৃষ্টি–অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবেত্তা, রাজনীতিবিদ এবং সমাজের অন্য সব স্তরের বিজ্ঞানীরাও এটার দিকে মন দিলেন।

কারণ দেখা গেল একটা ভার্চুয়াল পৃথিবী তৈরি করতে হলে শুধু বিজ্ঞান দিয়ে কাজ হবে না, তার সঙ্গে আরও কিছু দরকার। এতে মানুষকে বোঝার ধরন-ধারণ আর সামাজিক বিজ্ঞানও থাকতে হবে। এ কারণে প্রত্যাশা করা হয়েছিল লূপ এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল সমস্ত ক্ষেত্রেই অবদান রাখবে। ক্রমবিকাশের মৌলিক ধারা আর জীববিজ্ঞানের রহস্য ভেদ করা ছাড়াও, আশা করা হয়েছিল একটা ভার্চুয়াল পৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণীসত্তা তৈরি করা গেলে সামাজিক সমস্যাগুলোর সূত্র পাওয়া যাবে, যেমন–যুদ্ধ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, এমনকি শেয়ার বাজারের ওঠা-নামা। এমন সব ক্ষেত্রের সমস্যা পরিষ্কার ধরা পড়বে, যেখানে কোনো নিয়ম-নীতি কাজে লাগানো যায় না। আর তাই বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা লূপ প্রজেক্টের যথাযোগ্য গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন।

তো একসময় আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করল লূপ, বাস্তব ক্ষেত্রে, একটা দেশের সমতুল্য বিরাট বাজেট নিয়ে।

সরকারের কিছু গোপনীয়তাপ্রিয় কর্তা ব্যক্তির কারণে প্রথম দিকে প্রজেক্টের অস্তিত্ব ও কাজকর্ম প্রকাশ করা হয়নি। কেউ আগে থেকে বলতে পারছিল না ওটা থেকে কি জিনিস বেরিয়ে আসবে–দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাবার জন্যে নতুন কোনো সংজ্ঞা, হয়তো–কাজেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল কাজটা করা হবে কড়া নজরদারির ভেতর। শেষে, তেমন কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই, যুক্তরাষ্ট্র আর জাপানের যৌথ উদ্যোগ হিসেবে প্রজেক্টটা যাত্রা শুরু করল।

এরপর যে নামটা উচ্চারণ করলেন এলিয়ট, কাউরুর খুবই প্রিয় একজন মানুষ তিনি।

'হাইডিউকি ফুতামি...হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত মেধাবি গবেষক ছিলেন। তরুণ–গ্র্যাড স্কুল থেকে মাত্র বেরিয়েছেন–কিন্তু জাপানের প্রজেক্টের তাঁরই সবচেয়ে বড় অবদান ছিল লূপ প্রজেক্টে, আমার ধারণা। এলিয়টের মুখে বাবার এত প্রশংসা শুনে খুশি হচ্ছে কাউরু, সন্দেহ নেই তিনি চাইছেনও তাই।

'আপনার সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল?' প্রশ্ন করল কাউরু, আগ্রহের আতিশয্যে

BanglaBook.org

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'মুখোমুখি ছিল না; তবে তাঁর সম্পর্কে আমি শুনেছি, তার কাজের কথা আমি জেনেছি–আমার সহকর্মীদের মুখে।'

লূপ সম্পর্কে হাইডিউকি কখনোই আলাপ করতেন না। কাউরুর এটা জানার খুব আগ্রহ, প্রজেক্টটায় ওর বাবা ঠিক কি ভূমিকা পালন করতেন; নিজেকে মনে করিয়ে দিল, এরপর দেখা হলে জিজ্ঞেস করতে হবে।

কাউরুর চিন্তায় বাধা দিয়ে এলিয়ট বললেন, 'আমার ধারণা, এরপর লূপের কি হলো তা তুমি জানো।'

'লূপ ক্যানসারাস হয়ে উঠল।'

'শেষদিকে, হ্যাঁ কিন্তু ওই পর্যায় পর্যন্ত ওটা ছিল অবিশ্বাস্য, স্রেফ অবিশ্বাস্য। ওটা যে অত দূর যেতে পারবে, আমরা কেউ সেটা আশা করিনি।'

চোখে একটা আলো নিয়ে কাউরুর দিকে তাকালেন এলিয়ট, যেন ওকে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিচ্ছেন।

'আপনার আভাস দিতে পারেননি, এমন কিছু?'

'ব্যাপারটা তোমাকে বিস্মিত করছে না? তুমি যেখানে লূপের অংশবিশেষ নিজের চোখে দেখেছ?'

'আমাকে এত বেশি জিনিস বিস্মিত করেছে যে একসময় আমি বুঝতে পারিনি কি দেখে আমার বিস্মিত হওয়া উচিত।'

এলিয়টের প্রবল উত্তেজনা কাউরুর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না, তাতে করে ভদ্রলোকের পালে যেন বাতাসের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছে, আধ খোলা মুখে ওখানে তিনি বসে থাকলেন, ঠোঁটের এক কোন থেকে ক্ষীণ লালা গড়াচ্ছে। ওই স্বচ্ছ লালা যখন সুতোর মতো নীচের দিকে লম্বা হতে শুরু করল, এতক্ষণে খেয়াল হতে শার্টের আস্তিন দিয়ে সেটা মুছলেন এলিয়ট।

'প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথিবীর মতো সমান হওয়ায় আমরা আশা করেছিলাম মোটামুটি একই ধরনের লাইফ ফর্ম দেখতে পাব আমরা। স্বপ্নেও কেউ ভাবিনি ওগুলো হুবহু একই রকম হবে। ওই সময় সবাই ভাবত ক্রমবিকাশের ধারাকে গাইড করেছে চান্স। এটা দ্বিতীয়বার একই ভাবে সম্ভব নয়।'

এই বিষয়টা আসলেও কাউরুকে খুব বিস্মিত করেছে। লূপের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ধারা হুবহু পৃথিবীর মতো, একেবারে সর্বশেষ খুঁটিনাটি পর্যন্ত। এবং হ্যাঁ, অবশ্যই, এটা ওকে বিস্মিত করে।

'তাতে আপনারা কি উপসংহারে পৌঁছুলেন?' প্রশ্ন করল কাউরু।

'একদম শুরুতে আমরা দেখলাম লূপে আপনাআপনি প্রাণের উন্মেষ ঘটছে না। কাজেই আমরা তার ব্যবস্থা করলাম। লূপে আরএনএ [RNA] ঢোকানো হলো, যেটাকে প্রাণের আদিমতম প্রকার বলা হয়। বীজ বপন, কৌতুক করে

BanglaBook.org

বলতাম আমরা, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও কৌতুক ছিল না! সমস্ত বাস্তব দিক থেকে আরএনএ ছিল একটা বীজ, তার নিয়তি নির্দিষ্ট একটা পরিষ্কার জীবনবৃক্ষ হয়ে বেড়ে ওঠা।'

এ-ধরনের আলোচনায় আগেও অংশ নিয়েছে কাউরু, ওর মনে পড়ছে। রিয়োজির সঙ্গে। ওদের কাছাকাছি ঘুমে ঢুলছিল রাইকো, আর ওরা দুজন বিবর্তন নিয়ে তর্ক করছিল। রিয়োজির যা বক্তব্য ছিল, শুনে মনে হচ্ছে এলিয়টও ঠিক যেন তাই বলতে চাইছেন।

'ঠিক কি বলতে চাইছেন আপনি?' গলার স্বর ঠাণ্ডা আর স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করল কাউরু, প্রবীণ ভদ্রলোক আবার না লালা ঝরাতে শুরু করে দেন। ওই দৃশ্য আর দেখতে চায় না সে।

'লূপ নিখুঁতভাবে পৃথিবীর সঙ্গে মিলে যায়। লূপে প্রাকৃতিকভাবে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেনি–সেজন্যে আমরা বীজ বপন করি। এর তাৎপর্য তুমি ধরতে পারছ না?'

এবার চট করে ধরে ফেলল কাউরু। মনে পড়ল ওদের দীর্ঘ আলোচনার শুরুতেই এলিয়ট ওকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন।

তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?

এটাই কাউরুকে উত্তর পাইয়ে দিল।

'বাস্তবতাও, মানে আমাদের এই দুনিয়াটাও, শুধু একটা ভার্চুয়াল দুনিয়া, তাই তো?'

'ঠিক তাই। পৃথিবীতেও নিজে থেকে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেনি। তাহলে আমরা এখানে কেন? আমরা এখানে, তার কারণ কেউ একজন এখানে প্রাণের বীজ বপন করেছিল। কে? যে অস্তিত্বকে আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর পৃথিবীর বুকে প্রাণ বিকাশের কারণ সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি আমাদেরকে তৈরি করেছেন নিজের আদলে। বাইবেল ঠিক বলেছে।'

এসব শুনে কাউরু মোটেও বিচলিত বোধ করছে না। এই অভিযানে আসার পথে ওর চিন্তা-ভাবনা বহুবার এই একই জায়গায় এসে থেমেছে, তবে এটাকে সে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারেনি। এটা সাজুয্য আর যোগসূত্রের সাহায্য নিয়ে সাজানো যুক্তি, তার বেশি কিছু নয়। এটার না আছে বাস্তব কোনো ভিত্তি, আর না যাচাই করা সম্ভব। শেষে এটা দাঁড়ায়, সব সময় যা ছিল, বিশ্বাস করা বা না করার ওপর নির্ভর করে।

'তবে তাতে কিছু বদলাচ্ছে না, ঠিক কিনা?'

কাউচের ভেতর সেঁধিয়ে গেলেন এলিয়ট, যেন কাউরুর যুক্তি ভেতরে ঠেলে দিল তাঁকে। 'এমনকি বাস্তবতা যদি একটা ঈশ্বরের তৈরি হয়ও, আমি এ-কথা বলছি না যে আমরা সেই একইভাবে কমপিউটারে ওটা তৈরি করতে পেরেছি।'

BanglaBook.org

এলিয়টের কথা শেষ হওয়ার আগেই কাউরু শুরু করল, 'আমার ধারণা, ঈশ্বরের দুনিয়াও নিশ্চয় ফান্ড ইস্যু দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।'

চোখ সরু করলেন এলিয়ট, তাঁর দৃষ্টি যেন ঠাণ্ডা আলো। 'তুমি আমাকে নিয়ে কৌতুক করছ তবে তাঁর কঠিন মনোভাব বেশিক্ষণ থাকল না। আবার তিনি আগের প্রশান্ত চেহারা ফিরে পেলেন।

চোখ তুলে দেয়ালঘড়ি দেখল কাউরু। আলোচনা শুরু হওয়ার পর তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ওর খিদে পেয়েছে, এবং শেষটা কোথায় দেখতে না পেয়ে খুব ক্লান্ত বোধ করছে।

এলিয়ট যেন বুঝতে পারলেন কাউরু কি ভাবছে। 'বুঝতে পারছি তোমার খারাপ লাগছে। এস, আমরা একটু বিরতি নিই; পুরোনো একটা মুভি দেখা যায়। লাঞ্চের কি ব্যবস্থা করা যায় দেখছি আমি।' তাঁর চেহারায় কোনো ভাব নেই—না রাগ, না উত্তেজনা। হাতে রিমোট কন্ট্রোল দেখা গেল; একদিকের দেয়ালের সামনে পরদা নামল। প্লে লেখা বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

তারপর ধীরে ধীরে সিধে হলেন, ফিরে গেলেন নিজের হুইলচেয়ারে, কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কাউরুর দৃষ্টি অনুসরণ করল তাঁকে। এলিয়টের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, তারপর তালা দেয়ার আওয়াজ ভেসে এল। ওর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু জানার সব জানিয়ে দিল ওই শব্দ।

এখনও এখানে বন্দি ও। ওকে জানতে হবে কেন।

পরদায় একটা ছবি শুরু হয়েছে। এটা সেই পুরোনো সায়েন্স ফিকশন, দশ বছর বয়সে মা-বাবা দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন ওকে। থিম সং এখনও ওর মুখস্থ। ছবিটা এত ভালো লেগে যায়, মাকে বাধ্য করেছিল সাউন্ডট্র্যাক কিনে দিতে, বার বার শুনত সেটা।

দশাসই একজন কালো লোক, পরনে সাদা পোশাক, তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। একটা স্যান্ডউইচ আর দুধ মেশানো চা রাখল কাউরুর সামনে।

খাওয়ার সময় চোখ বুজে সিনেমার মিউজিক শুনছে কাউরু। চোখের পাতায় নিজের ব্যক্তিগত মুভি চালু করে দিতে আরও কিছু স্মৃতি এসে ভিড় করল। সুখ আর শান্তির সময় ওদের পরিবার কেমন ছিল, বাবার ক্যানসার ধরা পড়ার আগের সময়টা।

দু'গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে ঠোঁট ভেজাবার আগে কাউরু বুঝতে পারেনি কাঁদছে সে। কোইন্সিডেন্স নিয়ে আবার চিন্তা করছে। যেকোনো একটা মুভি তুলে এনেছেন এলিয়ট, নাকি তিনি পুরোপুরি সচেতন এটা ওকে দেখালে ওর মনে এরকম কত স্মৃতি ভিড় করবে।

এলিয়ট যদি জেনেশুনে কাজটা করে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে এটা সাধারণ বন্দিদশা নয়, এর পেছনে গভীর কোনো উদ্দেশ্য আছে। এলিয়ট হয়তো শুরু

BanglaBook.org

থেকেই ওর ওপর নজর রাখছেন।

ছোটবেলায় প্রায়ই কাউরু অনুভব করত পেছন থেকে কেউ ওর ওপর নজর রাখছে। সব সময় স্রেফ কল্পনা মনে করে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতদিন পর আবার অনুভূতিটা ফিরে এল, এবং এখন এটাকে সত্যি বলে মনে হচ্ছে

কাউরুর খিদে নষ্ট হয়ে গেল।

চার

ওর লাঞ্চ শেষ হতে ফিরে এলেন এলিয়ট।

'উফ, সত্যি তোমার খিদে পেয়েছিল,' খালি প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'গুড। ভেরি গুড।'

'এসব ফালতু কথাবার্তা আমরা বাদ দিতে পারি না? এসব দেখে আমার কি অনুভূতি হচ্ছে, তাও আপনাকে আমি বলতে পারছি না।' আজ সকালের আলোচনা শেষে আগের চেয়েও বেশি প্রশ্ন জাগছে কাউরুর মনে। ওর এখন একমাত্র চাওয়া, এই প্রহসন এখানেই শেষ হোক। আচ্ছা, এখানে কি কারণে এসেছে ও? এমএইচসি ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। কাজেই এভাবে সময় নষ্ট করা ওর পোষাবে না।

'শোনো,' বললেন এলিয়ট, ধীরে ধীরে সোফায় বসছেন। 'বিকেলে আমরা তোমাকে নিয়ে, তোমার মিশন নিয়ে আলোচনা করব।' আবার মনে হলো তিনি যেন কাউরুর অন্তরের সবকিছু দেখে নিচ্ছেন। চাইলেও এখন কাউরু এখান থেকে চলে যেতে পারবে না।

'আমার মিশন?'

'হ্যাঁ। এখানে তুমি কেন এসেছ? মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার একটা উপায়ের খোঁজে, না?'

পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা।

নার্ভাস বোধ করছে কাউরু। এলিয়ট মনে হচ্ছে ওর সম্পর্কে সব তথ্যই জানেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই ওর জানা নেই। এটা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ব্যক্তির স্থান কোথায় সে-সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা করতে পারছে। তবে আরও ব্যক্তিগত বিষয় জানা দরকার। মানুষ হিসেবে তাঁর সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা থাকলে ওকে হয়তো এত দুশ্চিন্তায় পড়তে হত না।

'কুইজ চলবে তো?' কাউরুর চিন্তায় বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন এলিয়ট। ডান তর্জনী সিলিংয়ের দিকে খাড়া করলেন, যেন হঠাৎ করে শিক্ষকের ভূমিকা

BanglaBook.org

নিয়েছেন।

'যখন একটা নিউট্রিনোর সঙ্গে অন্য কিছুর মিথস্ক্রিয়া হয়, ওটার দোলন তখন ধীরে ধীরে থেমে যায়–এটা কোন বছর আবিষ্কার হয়েছে?'

নিউট্রিনো সম্পর্কে জানে কাউরু, এক ধরনের পারমাণবিক কণা। ওগুলোর মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিতে পারবে ও: ওগুলোর গতি আলোর সমান [সম্পাদকের মন্তব্য: নিউট্রিনোর গতি আসলে আলোর চেয়েও বেশি, তবে তা মাত্র কদিন আগে জানা গেছে] ; ওগুলোর কোনো ইলেকট্রিক চার্জ নেই; এবং ওগুলো শক্তির আধার। এভাবে দেখলে, ওগুলো আলোর মতোই। পরিষ্কার পার্থক্য হলো, ওগুলোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও, যেকোনো বস্তুকে ভেদ করে যেতে পারে। সূর্য থেকে ছড়ানো নিউট্রিনো পৃথিবীর ভেতর ঢুকে সোজা উল্টোদিক দিয়ে বেরোয়, তারপর সোজা অন্ধকার মহাশূন্যে হারিয়ে যায়।

কিন্তু এখানে নিউট্রিনোর সঙ্গে কিসের কি সম্পর্ক?

কাউরুর উত্তর আপনাআপনি বেরিয়ে এল। '২০০১।' তখনও কাউরুর জন্ম হয়নি, তবে বিজ্ঞানের ইতিহাস নামে একটা টেক্সটবুকে পেয়েছে এই তথ্য, এবং পরিষ্কার মনে আছে ওর।

'ঠিক বলেছ। চিরকাল মনে করা হয়েছে নিউট্রিনোর কোনো ভর নেই, মাত্র গত শতাব্দীর শেষদিকে আবিষ্কার হয়েছে তা সত্যি নয়, নিউট্রিনোর ভর আছে

'ইয়েস, অ্যান্ড?' কাউরুর অস্বস্তি আবার বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাধা দেয়ার প্রবণতাও। এলিয়ট অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

'স্রেফ একটু ধৈর্য ধরো। আমার কথা শেষ হোক। সবই জৈব সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, এবং আমাদের প্ল্যানের ওপর সেটার প্রভাব আছে। তুমি সম্ভবত কিছুই বুঝবে না এখন যদি আমি বলি যে নিউট্রিনোর চারিত্রিক পরিবর্তন আবিষ্কার না হলে, প্রায় ধরে নেয়া চলে যে তোমার অস্তিত্ব থাকত না।'

'আমাকে এবার রেহাই দিন। হাসি-ঠাট্টা অনেক হয়েছে। নিউট্রিনোর স্বভাবচরিত্রের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব থাকা না থাকার সম্ভাব্য কী সম্পর্ক থাকতে পারে?' বলা হয় সমস্ত পদার্থের শতকরা নব্বুই ভাগই নিউট্রিনো দখল করে আছে। এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ওগুলো নেই। তার সঙ্গে কাউরুর কী সম্পর্ক? এটা থেকে এর বেশি কিছু আর বের করতে পারবে না সে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি শুধু বলব, ওই আইডিয়াটা মনের এক কোনে রেখে দাও তুমি, আর বলব পরবর্তী তিন মিনিট আমার সঙ্গে থাকো, যতক্ষণ আমি নিউট্রিনো সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলি।'

এরপর এলিয়ট ব্যাখ্যা করলেন নিউট্রিনোর দশা পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে কি করা যেতে পারে।

দেখা গেছে, নিউট্রিনোকে একটা পদার্থের প্রতি নিক্ষেপ করে, ওগুলোর দশা

BanglaBook.org

বদলের মাপ নিয়ে, এবং তারপর ওগুলোকে আবার এক করে, একটা পদার্থের কাঠামো জানার জন্যে বিশদ ত্রৈমাত্রিক ডিজিটাল ছবি তৈরি করা সম্ভব। নিউট্রিনোকে জৈব-অজৈব নির্বিশেষে সমস্ত বস্তুর ভেতর দিয়ে পাঠানো যায়। তবে দুটো ক্ষেত্রে, মেডিসিন আর প্যাথলজি, এই আবিষ্কার সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করা যাবে বলে আশা করা হলো, কারণ হঠাৎ করে একটা জীবের সম্পূর্ণ মলিকিউলার মেকআপ-এর ডিজিটাল ছবি পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছে। সাধারণ ডিএনএ অ্যানালাইসিস, এবং এটা, দুটো আলাদা। একটা জীবের ডিএনএ সিকোয়েন্সিং করার সহজ অর্থ হলো প্রায় সীমাহীন সংখ্যক কোষের মধ্যে থেকে মাত্র একটি কোষ অ্যানালাইজ করা। নিউট্রিনোর দোলনকে কাজে লাগিয়ে একটা সাবজেক্ট সম্পর্কে সমস্ত কিছু রেকর্ড করা সম্ভব হলো–মগজের তৎপরতা থেকে শুরু করে হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা, এমনকি স্মৃতিশক্তি পর্যন্ত।

'লূপ প্রজেক্ট শুরু হওয়ার কিছুদিন পরই গবেষকদের আরেকটা টিম নিউট্রন স্ক্যানিং ক্যাপচার সিস্টেম নামে একটা ইকুইপমেন্ট তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন, সংক্ষেপে এনএসসিএস। ওটা আমাদেরকে তৎক্ষণাৎ একটা পদার্থের মলিকিউলার স্টাকচার ধরার সুযোগ করে দিল। বলাই বাহুল্য, ওঁদের প্রজেক্টেরও বাজেট ছিল বিরাট। এনএসসিএস প্রজেক্টের সঙ্গে সরাসরি আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না, তবে অবশ্যই যখন যা পেরেছি পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করিনি আমি।'

এখানে খানিক বিরতি নিলেন এলিয়ট।

'একটু চা খেলে কেমন হয়? এই তথ্য হজম করতে তোমার বোধহয় দরকার।'

বাধ্য ছেলের মতো চায়ের কাপ মুখে তুলল কাউরু। ঠাণ্ডা চা।

সারা জীবনে নিউট্রিনো সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছে ও, তবে এনএসসিএস সম্পর্কে এই প্রথম শুনছে।

'এসব শুনে নিজেকে যদি তোমার বিভ্রান্ত বলে মনে হয়, আমি দুঃখিত। আমার মনে হয়, এমএইচসি ভাইরাস নিয়ে এবার আলোচনা করা যেতে পারে। ওটা আমাদের সবার জীবন বিপণ্ন করে তুলেছে।'

'অবশেষে আমরা আসল কথায় ফিরছি।'

স্বস্তি বোধ করছে কাউরু। ওর ভয় লাগছিল এটাও বোধহয় কোথাও পৌঁছুবে না।

'হিউম্যান মেট্যাসটাটিক ক্যানসার ভাইরাস সম্পর্কে কি জানো তুমি?' জানতে চাইলেন এলিয়ট।

'আমি জানি ওটার জেনোম সিকোয়েন্স বের করা হয়েছে। ফলাফলটা আমি নিজে দেখেছি।'

'অথচ এখনও ওটার কোনো চিকিৎসা নেই, ওটাকে ঠেকাবার মতো কোনো ভ্যাকসিন নেই।'

BanglaBook.org

'এর কারণ কী?'

'একটা ভাইরাস কোথেকে এল, এটা জানতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। এমএইচসি ভাইরাসের ক্ষেত্রে লেগেছে অসম্ভব দীর্ঘ সময়।'

ইতিমধ্যে কাউরুর ধারণা হয়েছে সে জানে কোথেকে আসছে ভাইরাসটা।

'লূপ থেকে আসছে, ঠিক?'

কাউরুর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালেন এলিয়ট। 'এটা তুমি বুঝলে কীভাবে?'

এলিয়টের চোখে-মুখে নিখাদ বিস্ময় লক্ষ করে খুশি হলো কাউরু। উত্তর দিতে দেরি করে ভালো লাগাটাকে টেনে লম্বা করতে ইচ্ছে হলো ওর, তবে ধৈর্যে কুলাল না। 'এমএইচসি ভাইরাস খুব বেশি বড় নয়। ওটার মাত্র ন'টা জিন, ওগুলোর প্রতিটির আছে কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ বেইস। কিন্তু প্রতিটি জিনের বেইস সংখ্যা বেরিয়ে আসছে $2n \times 3$। এটা কোইন্সিডেন্স হতে পারে না।'

এলিয়ট প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন, 'Nice catch.

'এর মধ্যে গর্ব করার কিছু নেই, তবে সংখ্যার বিষয় হলেই ষষ্ঠইন্দ্রিয় আমাকে সাহায্য করে। এটা ধরতে খুব একটা সময় লাগেনি।'

'আর তা থেকেই তুমি আন্দাজ করে নিলে কোথেকে এসেছে ওই ভাইরাস?

'আচ্ছা, বলুন, ওগুলোর যোগফল $2n \times 3$ হচ্ছে কেন? এটাই হলো প্রশ্ন। তিনবারের ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যায়, যেহেতু একটা অ্যামিনো অ্যাসিড গঠন করতে তিনটে বেইস লাগে। কিন্তু ফর্মুলার অন্য অংশটার কি ব্যাখ্যা, 2? সন্দেহ নেই আমি লূপ প্রজেক্ট সম্পর্কে না জানলে আইডিয়াটা কখনোই পেতাম না। 2-কে আসতে হয়েছে কমপিউটার যে বাইনারি কোড ব্যবহার করে, সেখান থেকে। ভাইরাসটা কোনোভাবে লূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওটাই ওর জন্মস্থান।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' মুখে দুর্বল হাসি নিয়ে হাততালি দিলেন এলিয়ট। তাঁর এই প্রশংসা আন্তরিক হোক বা না হোক, কাউরুর মনে হলো ওকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে।

নিজেকে শান্ত প্রমাণ করার জন্যে গলা নামিয়ে কথা বলছে কাউরু। 'কাজেই আমরা জানি কোথেকে এসেছে ওটা। তাতে কি আমরা রোগমুক্তির উপায় খুঁজে পাব?' ভাইরাসটাকে ঠেকিয়ে দেয়া– এটাই আসল কথা।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন এলিয়ট। 'এটা তুমি কবে জানতে পেরেছ?'

'হাহ্?'

'ভাইরাস কোথেকে আসছে, এটা তুমি কখন জানতে পারলে?'

'প্রায় মাসখানেক আগে।'

'আই সি। আমি জেনেছি প্রায় ছ'মাস হলো,' বললেন এলিয়ট, ভাব দেখে মনে হলো না গর্ব করছেন। বাচ্চা ছেলের মতো আঙুলের গিঁট গুণছেন, চেহারায় সামান্য অনুশোচনা।

BanglaBook.org

'আমি জানতে চাই, এ-ব্যাপারে আপনি কী ভাবেন?' জিজ্ঞেস করল কাউরু, চাপ দিচ্ছে।

অলস একটা ভাব দেখাচ্ছেন এলিয়ট, অজুহাত তৈরি করছেন।

'এত থাকতে ক্যানসার, এটা খুব খারাপ—এরকম পরিচিত একটা রোগ। অন্য রকম কিছু হলে আমরা হয়তো প্রথম দিকে একটা ব্যবস্থা নিতে পারতাম। কিন্তু গ্রাউন্ডওঅর্ক করার সময় নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে সাধারণ ক্যানসারের সঙ্গে মিশে থাকতে পারল। যেন একজন অপরাধী, পুলিশ খুঁজছে, বুঝতে পারছে লুকিয়ে থাকার সবচেয়ে ভালো জায়গা বড় শহর। বিশেষ করে ক্যানসার সাধারণ একটা রোগ হওয়াতেই, এই ভাইরাস ওটাকে ক্যামোফ্লাজ হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছে। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করো। শুধু লূপের একজন গবেষক ক্যানসারে মারা যাওয়ায় কে হইচই করবে? কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ একজন যদি অজানা কোনো রোগে মারা যেত, সেজন্যে কোন ভাইরাস দায়ী তা জানার জন্যে উঠেপড়ে লাগতাম বাকি সবাই। কিন্তু রোগটা ক্যানসার হওয়ায়...আরেকজন সহকর্মী মারা যাওয়ায় আমরা শুধু শোক পালন করেছি, কিছু সন্দেহ করিনি। ওটা চুপিচুপি ভেতরে ঢুকে পড়েছে, শিকার করেছে একের পর এক।'

কাউরু সহানুভূতি জানাতে পারে। প্রায় সাত বছর হতে চলল এই ক্যানসার নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে তার প্রাণশক্তি আছে, কাজেই এটা সাধারণ ক্যানসার নয়। তা প্রায় এক বছর হবে এর ভাইরাসকে সাফল্যের সঙ্গে আলাদা করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। আর এই সময়টা পেয়ে বিস্ফোরণের গতিতে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে গ্রাউন্ডওঅর্ক করে যাচ্ছে ভাইরাসটা।

কাউরু আন্দাজ করল, ক্যানসার ভাইরাস সম্ভবত এলিয়টের ঘনিষ্ঠ কাউকে কেড়ে নিয়ে গেছে। তাঁর দৃষ্টি, বৈরি এবং কাতর, অতীতে নিবদ্ধ।

ব্যক্তি হিসেবে এলিয়ট সম্পর্কে আরও কিছু জানার এটা একটা ভালো সুযোগ, তবে তার বদলে নিজেদের আলোচনাতেই ফিরে গেল কাউরু।

'আপনারা জানতে পেরেছেন, লূপ থেকে ঠিক কীভাবে ভাইরাসটা বেরুল?'

'কী? ওহ্, হ্যাঁ। অবশ্যই।'

'আমাকে বলবেন?'

'লূপকে আমরা থামিয়ে দিয়েছি বিশ বছর আগে। লূপের ভেতর সময় থেমে গেছে। ওটার সকল অধিবাসী যে যার জায়গায় জমে গেছে। তুমি জানো প্রজেক্টটা আমরা বন্ধ করে দিলাম কেন?'

'আপনি বলবেন ফান্ড শেষ হয়ে যাওয়ায়।'

কথাটা কৌতুক করার জন্যে বলেনি কাউরু, তবে এক মুহূর্ত চুপ থেকে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন এলিয়ট।

'একদম ঠিক ধরেছ। বাজেটের সব টাকা আমরা খরচ করে ফেলি। বিদ্যা ও

BanglaBook.org

জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে পণ্ডিতদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাচ্ছিলাম আমরা। তাঁরা নিজেদের মেধা, শ্রম আর সময় দিয়েছেন, জানিয়েছেন যার যার গবেষণার ফল; প্রত্যেকের অবদান আমাদের গবেষণায় আমরা কাজে লাগিয়েছি–বিনিময়ে তাঁদেরকে সম্মানী দিতে হয়েছে. মনে রাখতে হবে সংখ্যায় তাঁরা হাজার হাজার। এরকম একটা প্রজেক্ট চিরকাল সচল থাকতে পারে না। তোমার কোনো ধারণা আছে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমির নীচে কতগুলো সুপারকমপিউটার সাজিয়ে রেখেছি আমরা? ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার। এরকম আরও ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার সুপারকমপিউটার রেখেছি টোকিওর নীচে। ওগুলোকে সচল রাখার জন্যে নিজস্ব পাওয়ার প্লান্ট দরকার ছিল আমাদের। ওগুলো অবিশ্বাস্য বিদ্যুৎ খায়। সব মিলিয়ে অনেক খরচা। এটা অনন্তকাল চলতে পারে না আর, তার ওপর, লূপ ক্যানসারাস হয়ে উঠল।'

কাউরু অনুভব করল, কীভাবে ওটা বেরিয়ে এসেছে তা বোঝার জন্যে যা জানার দরকার তা ওর জানা আছে। ওয়েন'স রকে ও নিজেই সাক্ষি ছিল, নিজের চোখ-কান দিয়ে, ওই ঘটনাসমূহের মূল দৃশ্যগুলোর। বিষয়টা এলিয়টকে জানাল ও, শুনে দুবার মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'তুমি তাহলে দেখেছ। কিংবা, বলা উচিত, তুমি সেই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছ। কিন্তু তুমি জানো না কেন ওটা ক্যানসারাস হয়ে উঠল। কোনো রকম ভণিতা না করেই বলছি, কারণটা আমারও অজানা। ওই অদ্ভুত ভিডিওটেপ তৈরি, নতুন ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া–এসব লূপের ভেতর থাকা অধিবাসীদের পক্ষে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তুমি ভাবছ ওরা যদি ব্যাখ্যা করতে না পারে, আমার তো পারার কথা, যেহেতু লূপ যারা সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু তোমার কাছে সৎ থাকতে হবে আমাকে, আমি ওটা ব্যাখ্যা করতে পারিনি। বিশ্বের সব ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমাদের হাতে সব সময় সমস্যা আছে, যেগুলোর সমাধান দরকার। এমন দুনিয়া কোথাও নেই, যার ভেতরে পরস্পবিরোধিতা না আছে। এমন হতে পারে, বাস্তব দুনিয়ার পরস্পরবিরোধিতা লূপেও সংক্রমিত হয়েছে, পাল্টাপাল্টি–এটাকে কমপিউটার ভাইরাসের কাজ বলে মেনে নেয়া যায় না। আমাদের নিরাপত্তা নিখুঁত বলে মনে করা হত, তবে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে লূপ যতক্ষণ সংযুক্ত ছিল, অন্তত ততক্ষণ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত ছিল না। সেটা যদি কারও দুষ্কর্ম হয়ে থাকে, অসাধারণ চাতুর্যের সঙ্গে করা হয়েছে সেটা তবে আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ জাগিয়েছিল লূপের একজন বাসিন্দা: রাইয়োজি টাকাইয়ামা।'

থামলেন এলিয়ট, কাউরুর মুখে কি যেন খুঁজছেন, কিংবা হয়তো ওর সমর্থন আশা করছেন। কাউরু সায় দিল।

'হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র, সন্দেহ নেই।'

BanglaBook.org

'সে ইউনিক।'

'এমএইচসি ভাইরাসের চাবি নিশ্চয় তার কাছেই আছে।'

এবার চোখ সরু করলেন এলিয়ট, যেন কাউরুর মগজের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করছেন, যেন কাউরুর ওপর থেকে এখন আর এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখ সরানো যাবে না।

ধীরে ধীরে, চোখে সন্দেহ নিয়ে, এলিয়ট জানতে চাইলেন, 'মনিটরে তুমি টাকাইনামাকে দেখোনি?'

'আসলে তার দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতেই আমার বেশিরভাগ সময় বেরিয়ে গেছে,' সাবধানে জবাব দিল কাউরু, এলিয়টকে অনুকরণ করে প্রতিটি শব্দে আলাদা ওজন চাপাল; একই সঙ্গে নিজের স্মৃতিতেও চিরনি অভিযান চালাচ্ছে যাতে কোনো ভুল করে না বসে। না, এরকমই মনে আছে ওর: ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জনের সময় টাকাইয়ামার ইন্দ্রিয়গুলো পুরোপুরি ব্যবহার করেছিল ও।

আড়ষ্ট আধো চিৎকার বেরিয়ে এল এলিয়টের গলা থেকে, বার কয়েক চোখ মিটমিট করলেন। 'ওহ্-হো। ব্যাখ্যাটা মিলল।'

এলিয়টের চঞ্চল দৃষ্টি এদিক-সেদিক ছুটছে, দেখে অস্বস্তি বোধ করছে কাউরু। 'কী ব্যাখ্যা মিলল?'

'কী? ওহ্, ও কিছু না। ব্যাপারটা এখন খুব ইন্টারেস্টিং একটা দিকে ঘুরে গেল আর কি। তো যাক। তাহলে টাকাইয়ামার চিৎকার শুনতে পেলে তুমি, ঠিক তার মৃত্যুর আগে, যেন মনে হলো ওটা তোমার নিজের কণ্ঠস্বর?'

'হ্যাঁ।'

টাকাইয়ামার চোখ-কান দিয়ে যা কিছু দেখেছে আর শুনেছে কাউরু, পরিষ্কার স্মরণ করতে পারছে সব। মৃত্যুর একেবারে কিনারায় পৌঁছে বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে একটা যোগসূত্র পেয়ে যায় টাকাইয়ামা, পেয়ে ডাক দেয়। কাউরু শুনতে পেয়েছে টাকাইয়ামার কণ্ঠস্বর ওর শরীরে প্রতিধ্বনি তুলছিল।

'টাকাইয়ামা তোমাকে কী বলল?'

'আমি আপনাদের দুনিয়ায় যেতে চাই।'

'এটার কী মানে, জানো তুমি?'

'আমার ধারণা চিন্তা-ভাবনা করে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে লূপের স্রষ্টা হিসেবে একজনের অস্তিত্ব আছে, তার নিজস্ব কল্পনায় আর বিবেচনায় গঠিত একজন ঈশ্বর, এবং সে চাইছিল ওই ঈশ্বর যেন তাকে ওঁর দুনিয়ায় তুলে নেন—অন্য ভাষায়, বাস্তব দুনিয়ায়, যেখানে আপনি আর আমি আছি। অন্তত আমি এরকম একটা মানেই দাঁড় করিয়েছি।'

এবং অনুরোধটা করায় টাকাইয়ামার প্রতি কাউরুর মনে অঢেল সহানুভূতি জন্মেছিল। দুনিয়াটা কীভাবে চলে তা বোঝার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে নিজে কতবার

BanglaBook.org

তার বাবার মুখোমুখি হয়েছে? কিন্তু জানা গেছে এই দুনিয়ার রহস্য বোঝা একদম সহজ কাজ নয়, কারণ তা অসম্ভব জটিল। যতবার মনে হয়েছে ধাওয়া করে উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছে. ততবার আরেকটু দূরে সরে গেছে সেটা, যেন ইঁদুর-বিড়ালের বিরতিহীন খেলা। কাউরুর মনে হয়েছে সে যেন নিজের ছায়াকে ধাওয়া করছে, এমন একটা কিছু যেটাকে কোনোদিন ধরতে পারবে না। যদি জানা যায় যে বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন, তাহলে সেই স্রষ্টার নিজের দুনিয়ায় যেতে পারলে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার জবাব পাওয়া যাবে। তাতে করে নিশ্চয়ই জানা যাবে তার নিজের দুনিয়াটা কীভাবে চলে।

এলিয়ট শান্তসুরে কথা বলছেন: 'টাকাইয়ামার অনুভূতি ভালোই বুঝতে পারি আমি। তার অনুরোধ মৃত্যুভয় থেকে আসেনি। জ্ঞানের অতৃপ্ত চাহিদা তৎপর হতে বাধ্য করে তাকে। ওই মুহূর্তে বিশ্ব সম্পর্কে তার কৌতূহল বিস্ফোরিত হয়, তা থেকে যেটা বেরিয়ে আসে তার কাছে সেটা ছিল একটা মিরাকল।'

'মিরাকল?'

'হ্যাঁ, তার কাছে। মৃত্যুর ঠিক মুখে পৌঁছে, তার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল মাঝখানের ব্যবধান পার হয়ে এই পৃথিবীতে চলে আসে। এনএসসি-র প্ল্যান যদি আমার হাতে না থাকত, সন্দেহ আছে আইডিয়াটা আমার মাথায় কখনও ঢুকত কিনা। তবে, আমি যেমন বলেছি, সবই আসলে অর্গানিক্যালি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, একেবারে সেই শুরু থেকে। ধারণা করি বিশ কি ত্রিশ বছর দূরের ভবিষ্যত দেখতে পেতাম আমি, যা দেখতাম তার ওপর ভিত্তি করে মনস্থির করি টাকাইয়ামার আশা পূরণ করা হবে।'

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল কাউরু!

টাকাইয়ামার আশা পূরণ করা হবে!

ঠিক এরকমই সন্দেহ করেছিল কাউরু। ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে একটা প্রাণীসত্তাকে বাস্তব দুনিয়ায় নিয়ে আসার মতো যথেষ্ট দুঃসাহস কেউ একজন দেখাবে। ওর মুখে কথা যোগাচ্ছে না।

এলিয়ট অবশ্য শান্তভাবে ব্যাখ্যা করছেন কীভাবে তিনি রাইয়োজি টাকাইয়ামাকে বাস্তব দুনিয়ায় নিয়ে এসেছেন:

তাকে একজন পরিণত বয়স্ক হিসেবে নিয়ে আসা অসম্ভব ছিল; বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকা অবস্থায়, এবং সমস্ত স্মৃতি অটুট থাকা অবস্থায়। এলিয়ট একমাত্র যেটা করতে পারতেন, টাকাইয়ামার একটা কোষ থেকে জেনেটিক ইনফরমেশন সংগ্রহ করা, তারপর সেটাকে ভিত্তি ধরে একটা জেনোম সিনথেসাইজার এবং জেনোম ফ্রাগমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট মেথড ব্যবহার করে ডিএনএ তৈরি করা, যেটা বাস্তব দুনিয়াতেও কাজ করবে। একবার টাকাইয়ামার ডিএনএ সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ করার পর রাসায়নিক পদ্ধতিতে ওটার সংশ্লেষণ পরীক্ষা একান্ত

BanglaBook.org

প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল।

পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল মানুষের একটা নিষিক্ত ডিম, সেটার নিউক্লিয়াস বের করা, এবং তার জায়গায় হাতে তৈরি টাকাইয়ামার নিউক্লিয়াস ঢোকানো। এলিয়টের সর্বশেষ কাজ ছিল ডিমটাকে মায়ের শরীরে প্রবেশ করানো, তারপর টাকাইয়ামার জন্মলাভের জন্যে অপেক্ষা করা। পদ্ধতিটা ক্লোনিং করা থেকে খুব একটা আলাদা কিছু নয়, যেটা গত শতাব্দীতে জাদু দেখিয়েছে। তত কঠিন কিছুও নয়।

সংক্ষেপে, টাকাইয়ামাকে বাস্তব দুনিয়ায় নিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল তাকে একটা শিশু হিসেবে জন্ম দেয়া, ভার্চুয়াল রাইয়োজি টাকাইয়ামার জেনেটিক ইনফরমেশন বহন করছে নতুন একটা মানবসন্তান।

'কমিয়ে বললেও, এটা ছিল মহৎ একটা এক্সপেরিমেন্ট। ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে বাস্তব দুনিয়ায় কিছু একটা নিয়ে আসছি, আনা সম্ভব হতে যাচ্ছে, সবাই আমরা ভয়ানক উত্তেজিত ছিলাম। তবে চরম গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়েছে আমাদের। আশা করি কারণটা তুমি বুঝতে পারছ। মিডিয়া একটু আভাস পেলে মহা শোরগোল বাধিয়ে দিত, লোকজনকে দিয়ে বলাত আমরা ঈশ্বরের ভূমিকা নেমে পড়েছি, জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করছি, ইত্যাদি। শতাব্দীর বাঁকে এসে সফলভাবে প্রথম মানুষ ক্লোনকে ঘিরে কেমন উন্মত্ততা দেখা দিয়েছিল তা সবাই দেখেছে, আমরা চাইনি আমাদের ক্ষেত্রেও সেরকম কিছু ঘটুক। আশা করি তোমার মনে আছে ঠিক কি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল তখন...যাই হোক, লূপের সঙ্গে জড়িত বেশিরভাগ বিজ্ঞানীদেরও অন্ধকারে রাখার সিদ্ধান্ত নিই আমরা।'

'আমার বাবাও কি জানতেন না?'

মাথাটা একবার মাত্র ঝাঁকালেন এলিয়ট। 'ঠিক ধরেছ। তিনি জানতেন না। কারও না জানাটাই সবদিক থেকে সুবিধে বলে মনে হয়েছিল।'

'তারমানে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা হয়েছিল তাঁকে, তাই তো?'

'ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়...তা, হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো।'

মনে হলো শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না এলিয়ট। তবে কাউরু আন্দাজ করতে পারল এরপর কি আসছে। 'তো, যাই হোক, আপনি বলছিলেন যে...'

'হ্যাঁ, তুমি যা ভাবছ তাই। আমরা টাকাইয়ামার জেনেটিক ইনফরমেশন সংগ্রহ করি এমন একটা মুহূর্তে ঠিক যখন মারা যাচ্ছে। ওই পর্যায়ে পৌঁছুবার আগেই রিং ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল সে। দুঃসংবাদ হলো যখন টাকাইয়ামাকে বাস্তব দুনিয়ায় নিয়ে আসি, তার সঙ্গে রিং ভাইরাসকেও নিয়ে আসি আমরা।'

'আরেক ভাষায়, যে রিং ভাইরাস লূপ জগৎকে দখল করে নেয় সেটা ছিল এমএইচসি ভাইরাসের ভিত, যেটা আমাদের জগৎকে দখল করে নিচ্ছে?'

'আমরা তাই মনে করি। সতর্কতার সঙ্গে দুটো ভাইরাসের জেনেটিক সিকোয়েন্স তুলনা করে এত বেশি মিল পাওয়া গেছে যে সেগুলোকে কোইন্সিডেন্স

BanglaBook.org

বলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। টাকাইয়ামাকে বাস্তব দুনিয়ায় পুনর্জন্ম দেয়ার আমাদের প্ল্যানটাকে আঁকড়ে ধরে রিং ভাইরাস, পালাবার একটা সুযোগ ভেবে। আমাদের ধারণা, ভাইরাসের আরএনএ-তে নিশ্চয়ই একটা আন্ত্রিক জীবাণুর আক্রমণ ঘটেছিল, সেজন্যেই বাইরে বেরোবার সুযোগ খুঁজছিল ওটা। আর বেরিয়েই বিদ্যুৎগতিতে ছড়াতে শুরু করল, যেমনটি তার স্বভাব। ফলাফল হলো এই এমএইচসি ভাইরাস।'

সিকোয়েন্সটা ছিল, আসলে, কাউরু যেমনটা আন্দাজ করেছিল। যদিও, তা নিয়ে কি করা হবে, সেটা একটা সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

এলিয়টের দিকে ঝুঁকল কাউরু, বলল, 'এখনই একটা বিষয় পরিষ্কার করুন। এমএইচসি ভাইরাসকে কাবু করার কোনো পদ্ধতি আপনারা বের করতে পেরেছেন, না পারেননি?'

'তুমি নিজেই তো বললে, এমএইচসি ভাইরাসের চাবি নিশ্চয় টাকাইয়ামার কাছেই আছে।'

'তারমানে টাকাইয়ামা বেঁচে আছে! কোথায় সে?'

হাতের ওপর চিবুক রেখে কাউরুর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এলিয়ট। তারপর আঙুলগুলো সিধে করলেন। 'চোখ অনেক সময় ধাঁধায় ফেলে দেয়, তাই না? যেটা আমরা জানি বলে ভাবি সেটা আমাদের বিচক্ষণতাকে প্রভাবিত করতে পারে।'

মাথা নেড়ে কাউচে হেলান দিল কাউরু। গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো প্রশ্ন সব সময় এড়িয়ে যাচ্ছেন এলিয়ট। প্রবীণ ভদ্রলোককে আবার সন্দেহ করতে শুরু করল ও—তাঁর আসলে মতলবটা কী?

কাউরুর বিস্মিত ভাব দেখেও না দেখার ভান করে ইতিমধ্যে রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিয়েছেন এলিয়ট। একদিকের দেয়ালে বড়সড় একটা কমপিউটার মনিটর উন্মুক্ত হলো।

'তুমি সবটাই দেখেছ। তুমি এমনকি হেলমেট ডিসপ্লেও ব্যবহার করেছ। তারপরও জিনিসটা লক্ষ করোনি। আমার ধারণা সেটাই ঘটার কথা। তোমার ভেতর শেকড়ের মতো গেঁথে ছিল আগের ধারণা, সেটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে আমার বিশ্বাস।'

কাউরুর মনে হলো এলিয়ট নিজের সঙ্গে কথা বলছেন; নিজের উঠানে একটা পাখি এসে বসলে মানুষ যেভাবে সেটার সঙ্গে কথা বলে। কাজেই অস্বস্তি চেপে রেখে অপেক্ষা করছে ও, দেখতে চায় এলিয়ট কখন তাঁর পরবর্তী চাল দেন।

কমপিউটারের পরদায় টাকাইয়ামার জীবনের শেষ মুহূর্তের ছবি নিয়ে এসেছেন এলিয়ট। সম্ভবত আগেই সব সাজিয়ে রেখেছিলেন তিনি—মাত্র অল্প দু'একটা কমান্ড দিয়ে দৃশ্যটা এনে ফেললেন।

BanglaBook.org

'তুমি যেভাবে দেখেছিলে, এস, আবার একবার দেখি সেভাবে– টাকাইয়ামার দৃষ্টিতে।'

ওয়েন' রকের ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে বসে যে-সব ঘটনার ভেতর ঢুকে সময় কাটিয়েছিল কাউরু, বলা উচিত জীবনযাপন করেছিল, সেগুলো আবার দেখছে ওরা।

সেই ভিডিওটা দেখার পর এক সপ্তা পার হয়েছে, টাকাইয়ামা এখন মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। শেষ ইচ্ছে পূরণের অভিলাষ নিয়ে, টেপটা ভিসিআর-এ ঢোকাল সে, তারপর চাপ দিল প্লে লেখা বোতামে। সেই রহস্যময়, টুকরো টুকরো ইমেজ টিভির স্ক্রিন জুড়ে নাচানাচি শুরু করল। একটা লিড কেসের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে ঘুঁটি। একটা ফোন কলের মাঝখানে টাকাইয়ামা লক্ষ করল ডাইসের পরিবর্তনপ্রবণ বিন্দুগুলো একটা শব্দ করছে, চিৎকারের মতো।

ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটল। মনিটরের এক কোনে, আয়নায়, একটা প্রতিবিম্ব দেখা গেল। কানে চেপে ধরা টেলিফোনের রিসিভার আর চেহারায় চরম বিস্ময় নিয়ে একজন মানুষ। সে টাকাইয়ামা। ফোনে কথা বলার সময় টাকাইয়ামার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো আয়নায় ফুটে ওঠা প্রতিচ্ছবির ওপর।

ওখানে প্লেব্যাক থামিয়ে দিলেন এলিয়ট, টাকাইয়ামার প্রতিফলন জুম করলেন।

'তুমি টাকাইয়ামার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলে, কিন্তু তোমার নিজের ইন্দ্রিয়গুলো তোমার দৃষ্টিপথ ঢেকে রেখেছিল। তোমার মনের প্রতিক্রিয়া ছিল, যা তুমি দেখছ তা তোমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, কাজেই ওটা তোমাকে স্রেফ দেখতে দেয়নি। তুমি ওই মুখ চিনতে পারছ না?'

আয়নার মুখটা সামান্য ঝাপসা ইমেজটা আরও উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ করলেন এলিয়ট

টাকাইয়ামার প্রতিফলনের সরাসরি সামনে বসে আছে কাউরু। ওর চোয়াল ঝুলে পড়ল। স্নায়ু কাঁপতে শুরু করল, মুখটাকে যেন ওগুলো চিনতে চাইছে না।

বিস্ময়ে প্রায় বিকৃত হয়ে আছে টাকাইয়ামার চেহারা। তার ওপর মৃত্যু একেবারে কাছে চলে আসায় হঠাৎ করে বয়সের ছাপ প্রকট হয়ে উঠেছে তারপরও, তার অবয়বের বাইরের রেখাগুলো চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না, চেনা যাচ্ছে চোয়াল বরাবর পেশির রেখা। কাউরু অবশ্যই ওই মুখ চেনে সারাজীবন ধরে চেনে।

'এমএইচসি ভাইরাসের চাবি নিশ্চয় টাকাইয়ামার কাছেই আছে।' মস্ত একটা আঙুল দিয়ে কাউরুর বুকে খোঁচা মারলেন এলিয়ট। 'কাউরু, তুমিই রাইয়োজি টাকাইয়ামা।'

কাউরু চেষ্টা করল কথাগুলো যাতে ওর মগজে না পৌঁছোয়, কিন্তু ওগুলোর

BanglaBook.org

বিশুদ্ধ নির্যাস চুইয়ে চুইয়ে ঠিকই জায়গামতো পৌঁছে গেল। অনুভব করল ওর চারপাশে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে গোটা দুনিয়া। ওর যে শরীর, যে মাংসকে সব সময় নিজের বলে ভেবে এসেছে, বেঈমানী করেছে ওর সঙ্গে।

'এ হতে পারে না।' সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলল কাউরু, চোখ দুটো চেপে বন্ধ করা।

'তোমার সাহায্য দরকার আমাদের। তুমি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করো।'

কাউরু কিছু বলল না। এলিয়টের কথা ওর কানে ঢুকল, কিন্তু অর্থটা ধরতে পারল না। ও শুধু বুঝতে পারছে দুনিয়াটা ভেঙে পড়ছে।

পাঁচ

ভাঁজ করা হাঁটু দুটোকে আলিঙ্গন করে, একটা বোল্ডারের ওপর বসে রয়েছে কাউরু। শৈলশিরার সমতল কিনারা থেকে শত কোটি বছর ধরে খোদাই করা গভীর উপত্যকা দেখতে পাচ্ছে ও। মরচে রঙা একটা জগতের এদিক-ওদিক কিছু জায়গায় সাদাটে দাগ দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত আকৃতির পাথর দিগন্তের গায়ে নকশা তৈরি করেছে, দেখে মনে হয় প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, মানুষের কাজ। তবে ওর সামনে বিস্তৃত এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে এখনও মানুষের ছোঁয়া লাগেনি।

শৈলশিরা ধরে ওর আগমন পর্ব প্রায় কিছুই মনে নেই—ঝড়-বৃষ্টি, এবং তারপর যা কিছু ঘটেছে সব একটা স্বপ্নের ভেতর বলে মনে হচ্ছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে যখন গুটিসুটি মেরে বসেছিল, এখানে ছিল ও, এই বিশালত্বের মাঝখানে? চারদিকে এমনভাবে চোখ বুলাচ্ছে, এই যেন প্রথম, চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে জমিনের প্রতিটি ভাঁজ আর গর্ত। ওগুলো ওকে, স্বভাবতই, একটা মগজের ভাঁজ আর গর্তের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কাউরুর নিজের মগজে প্রচুর স্মৃতি খোদাই করা আছে, তবে তার ইতিহাস তুলনায় এখনও বেশ ছোট সেটা, মাত্র বিশ বছর বয়সী। ওটার উৎস. যদিও, মোটেও স্বাভাবিক কিছু নয়। ওটা জন্ম নিয়েছে প্রাণিজ পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নয়, ডিজিটাল পুনর্যোজনের মাধ্যমে।

দূরে একটা হলদেটে নদী দেখতে পাচ্ছে কাউরু, প্রায় একটা লূপের আকৃতি নিয়ে বইছে। বড় অদ্ভুত একটা দৃশ্য বাস্তব আর ভার্চুয়াল দুনিয়ার মাঝখানে অর্থপূর্ণ অথচ অদৃশ্য যে মিল আছে তার একটা প্রদর্শনী নয়তো?

ঘাড় ফেরাল কাউরু। তবে কোথাও কেউ নেই।

একটা মাত্র পাকা দালান, শুধু এলিভেরের জায়গা হয়েছে ভেতরে, জমিনের

BanglaBook.org

সঙ্গে পাতালে তৈরি ল্যাবগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে, আর তার পাশে একটা হেলিকপ্টার। ওটার রং ইস্পাত-নীল, হেলিপোর্টে স্থির হয়ে আছে। ঝড়-বৃষ্টির পর ওটা করেই কাউরুর অসহায় শরীরটাকে তুলে আনা হয়েছিল।

দালান আর হেলিপোর্টের মাঝামাঝি জায়গায় একটা গাঢ় গর্ত আছে, চুনাপাথরের বিরাট এক প্রবেশমুখ, ভেতরে বিস্তৃত গভীর একটা গুহা। গুহার মাঝখানে অতল গহ্বরে ছলছল করছে স্বচ্ছ পানি।

এলিয়ট মিথ্যে কথা বলেননি! সিলিং আর মেঝের দিকে আঙুল তাক করে বলেছিলেন, ওপরে আছে পানির মোটা স্তর, আর নীচে আছে বিশাল শূন্যতা। দুটোই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তিন হাজার ফুট পর্যন্ত মাটি খুঁড়েছেন ওঁরা, তারপর পেয়েছেন গোলক আকৃতির এই স্পেস বা শূন্যতা, ডায়ামিটারে ছ'শ ফুট, একটা বুদ্বুদের মতো ভেসে আছে ওখানে। স্বচ্ছ পানির স্তর একটা বর্মের মতো, বাইরের রেডিয়েশনকে ফাঁপা জায়গার ভেতর ঢুকতে দেয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে ভালো একটা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, ওটার গভীর পাতালে নিউট্রিনো স্ক্যানিং ক্যাপচার সিস্টেম নির্মাণের মাধ্যমে।

কাউরু এখনও যন্ত্রটা দেখেনি, যে যন্ত্র ওর নিয়তি নির্ধারণ করবে, জানে না সেটা ইলেকট্রিক চেয়ার, না...কী?

পাতালের ল্যাবগুলোয় প্রায় এক সপ্তা হলো বাস করছে কাউরু। এখন, এই প্রথমবার, বাইরে থেকে জায়গাটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে। সারফেসে ওঠার ওর ইচ্ছে অবশেষে অনুমোদন করা হয়েছে। যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে এলিয়ট স্বীকার করেছেন যে কাউরু কোথাও পালিয়ে যাবে না বা আত্মগোপন করবে না।

আবহাওয়া শান্ত। এক সপ্তা পর গায়ে রোদ লাগাচ্ছে কাউরু। যতক্ষণ রোদে আছে, শুধু একটা টি-শার্টেও গরম থাকবে শরীর। বুকের ওপর বাঁধা হাত দুটো আরও টান টান করল, কনুইয়ের ওপরটা চুলকাচ্ছে, সেই সঙ্গে নিজের চিন্তা-ভাবনা গোছানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। ও এমনকি এও ঠিক করতে পারছে না যে ঠিক কি ওকে ঠিক করতে হবে। এই পর্যায় পর্যন্ত নিজের জীবন সম্পর্কে কী ভাববে সে? ওকে নির্দেশনা দিতে পারে, ওর সামনে এমন কোনো দৃষ্টান্তও নেই।

গভীর সংকটেই পড়েছে কাউরু।

এলিয়টকে সন্দেহ করাটা সহজ। সেটা সহজতম সমাধানও বটে: তিনি যা কিছু বলবেন সব অস্বীকার করো! যত কথাই বলা হোক, কে বিশ্বাস করবে একটা ভার্চুয়াল রিয়্যালেটি থেকে সংগ্রহ করা জেনেটিক ইনফরমেশন তৈরি করেছে তাকে? এটা প্রায় তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এলিয়ট হয়তো স্রেফ

BanglaBook.org

একটা গল্প বানিয়ে শোনাচ্ছেন ওকে, কারণ এনএসসিএস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চান তিনি। কাউরুর উচিত এলিয়টকে নিষেধ করা: নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতো এই পাহাড় ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার থাকতে হবে ওর, এলিয়টকে মনের সাধ মিটিয়ে অভিশাপ দেয়ার পর, যেরকম অভিশাপ এর আগে দুনিয়ার কেউ কাউকে দেয়নি। আর তারপর...তারপর কী? কাউরুর জানা নেই। জানা কথা আনন্দদায়ক আর কিছু ওর জন্যে অবশিষ্ট নেই। যাদেরকে ভালোবাসে তাদের সবাইকে হারাতে হবে। ওর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধুই অনুতাপ।

বার বার শুরুর পর্যায়ে ফিরে যাচ্ছে কাউরু। মানোজায়গাটিক যমজরা একই কোষ শেয়ার করে, এবং দেখতে প্রায় একই রকম হয়। কাউরু আর টাকাইয়ামা যদি একই জিন শেয়ার করে, ওদের মুখ দেখতে একই রকম হওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তারপর রয়েছে কাউরুর সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, যখন প্রথমবার সে সরাসরি টাকাইয়ামার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, ওই একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যখন সে রেকর্ড করা নিজের কণ্ঠস্বর শুনল। অর্থাৎ মুখ আর গলার আওয়াজ মিলল। তবে এগুলোকে যথেষ্ট প্রমাণ বলা চলে না। কমপিউটারকে দিয়ে এসব অনায়াসে বানানো যায়

কথাগুলো এলিয়টকে বলল কাউরু। উত্তরে, যেন কাউরুর সন্দেহ আগেই আন্দাজ করতে পেরেছেন, ওর দিকে একটা স্যাটেলাইট ফোন বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

'তোমার বাবা। আমি মনে করি তাঁর সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত।'

রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল কাউরু, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। অবশেষে, বাবার যা বলার আছে তা শোনার পর, এলিয়টের গল্প বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতে লাগল ওর।

টাকাইয়ামার ক্লোনকে তুলে নিয়ে আসার সবচেয়ে সুবিধেজনক উপায় হলো, সিদ্ধান্ত হয়েছিল, লূপ প্রজেক্টে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে একজনকে বাছাই করা, তারপর তাঁকে দিয়ে ক্লোনটাকে নিজের ছেলে হিসেবে তুলে আনা।

ওই সময়, হাইডিউকি আর ম্যাচিকো ফুতামির বিয়ের বয়স হয়েছিল চার বছর। ওদের কোনো সন্তান হয়নি। আসলে, একজন গাইনিকলজিস্ট সম্প্রতি নিশ্চিত করেছেন ম্যাচিকো কখনোই সন্তান ধারণে সক্ষম হবেন না।

কিন্তু তারপরও তাঁরা একটা সন্তান চাইছিলেন। এলিয়ট আর তাঁর সহকর্মীদের কানে খবরটা পৌঁছে যায়, কয়েকজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পালক সন্তান গ্রহণের সম্ভাবনা নিয়ে হাইডিউকির কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। হাইডিউকি এবং ম্যাচিকো, দুজনেই ইতিবাচক সাড়া দেন–সদ্যোজাত একটা

BanglaBook.org

সন্তানকে নিজেদের বাড়িতে গ্রহণ করতে এবং তাকে নিজেদের সন্তান হিসেবে লালনপালন করতে রাজি হন তাঁরা।

এরপর সব খুব দ্রুত ঘটেছে। কৌশলে তৈরি জটিল একটা পথ ধরে হাইডিউকি আর ম্যাচিকোর বাড়িতে সদ্যোজাত একটা পুত্রসন্তান নিয়ে হাজির হন এলিয়ট, নাম কাউরু। শিশুর জন্ম, কিংবা বংশপরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি তাঁদেরকে; ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে, এই যুক্তি দেখিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কাউরু লূপের ভেতর থেকে এসেছে শুনলে ওকে তাঁরা পালক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হতেন কিনা বলা মুশকিল।

যাই হোক, কাউরুকে তাঁরা নিজ সন্তান হিসেবে মানুষ করেছেন, ভুলেও বুঝতে দেননি ও তাঁদের আপন সন্তান নয়।

ওরা যখন কথা বলছে, স্যাটেলাইট ফোনে, কল্পনার চোখে বাবাকে হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে দেখছে কাউরু, দুর্বল হাতে ধরে আছেন ফোনের রিসিভার।

'কাউরু?'

বাবার গলা শুনতে পাওয়া নিখাদ আনন্দময় অভিজ্ঞতা, যদিও যেরকম মনে আছে তারচেয়ে দুর্বল লাগল কাউরুর কানে।

সম্প্রতি কে কি করছে পরস্পরকে রিপোর্ট করল ওরা। ছেলে ভালো আছে শুনে হাইডিউকিকে সুখী মনে হলো। 'কিছুদিন থেকে আমিও যেন একটু ভালো বোধ করছি,' বললেন তিনি, তবে কাউরুর জানার কোনো উপায় নেই কথাটা সত্যি কিনা, কিংবা কতটুকু সত্যি। গলার আওয়াজ সাক্ষী দিচ্ছে তিনি সত্যি কথা বলছেন না। কাউরু অনুভব করল, ওর বাবার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

তারপর শান্তভাবে, নরম সুরে, বাবাকে নিজের জন্ম ও পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল কাউরু। কাউরু তাঁদের পালক সন্তান, এটা সে জেনে ফেলেছে বুঝতে পেরে প্রথমে খুব বিস্মিত হলেন হাইডিউকি, তারপর দ্রুতই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন আগে হোক বা পরে এই সত্য ও একদিন জানবেই। বিশ বছর আগে ঠিক কি ঘটেছিল সবিস্তারে তা ছেলেকে ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

বাবার ব্যাখ্যা শোনার সময় চোখ বুজে আছে কাউরু, প্রার্থনার মতো কিছু একটা বলছে নিজের হৃদয়কে। হাইডিউকিকে প্রস্তাবটা কে দিয়েছিল–কাউরুকে সে পেল কোত্থেকে?

কাউরুর প্রার্থনা বৃথা গেল। এলিয়ট যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে ওর বাবার ব্যাখ্যা, প্রতিটি খুঁটিনাটিসহ, পুরোপুরি মিলে গেল।

'তুমি ইতস্তত বোধ করোনি, বাবা, একটা ছেলেকে পেলে-পুষে বড় করছ, অথচ তার জিন তোমার নিজের নয়?' শান্তসুরে জিজ্ঞেস করল কাউরু। এমনকি

BanglaBook.org

ওর মা যদি বন্ধ্যাও হয়ে থাকেন, এমন একটা ছেলের জন্ম দেয়া তেমন কোনো কঠিন বিষয় নয় যে ছেলে ওঁদের দুজনের জিনই বহন করবে সে

'তুমি আমাদের জিন বহন করছ কি করছ না, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের বন্ধন তৈরি হয় একসঙ্গে থাকার ফলে, পরস্পরের সঙ্গে তারা কেমন আচরণ করে তার ওপর ভিত্তি করে। গত বিশ বছরে আমাদের সম্পর্কের কথা ভাবো তুমি। তুমি আমার সন্তান, কাউরু।'

এই কথাগুলো কাউরুর দেহকোষে নিজে থেকেই খোদাই হয়ে গেল।

গুডবাই বলে যোগাযোগ কেটে দিল কাউরু, উপলব্ধি করল জীবনে আর কখনো সে তার বাবার সঙ্গে কথা বলবে না।

কমপিউটারের পরদায় টাকাইয়ামার জীবনটা বার বার দেখেছে কাউরু। লোকটার ছেলেবেলার পর্বগুলো দেখার সময় যখন লক্ষ করল বিশেষ করে বিজ্ঞান, অঙ্ক আর ফিজিক্সে বিরল মেধার পরিচয় দিচ্ছে সে, তখন দুজনকে একই ব্যক্তি হিসেবে অনুভব না করে কাউরু কোনো উপায় দেখেনি। এমনকি একটা বইয়ে বা চিন্তায় ডুবে থাকার সময় তার আচরণও হুবহু কাউরুর সঙ্গে মিলে গেল।

অনস্ক্রিনে টাকাইয়ামাকে দেখা অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা। এখানে এই ব্যক্তি কাউরুর মতো একই জেনেটিক মেকআপ নিয়ে উপস্থিত, অন্য এক পরিবেশে বড় হয়েছে–আলাদা একটা বিশ্বে। সত্যি তাই, তারচেয়ে কম কিছু নয় একজন মানুষ, যার ব্যক্তিত্ব কাউরুর চেয়ে আলাদা, তার সচেতনতাও আলাদা, কিন্তু চেহারা-সুরত হুবহু এক। অভিন্ন যমজ।

সিধে হয়ে শৈলশিরার শেষ প্রান্তের দিকে হাঁটছে কাউরু। নীচের দিকে তাকিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের খাড়া গা দেখতে পেল, তলায় সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়েছে ঝরনার খরস্রোতা প্রবাহ। পানির ওপরটা সবুজ, আলোর কারসাজি হতে পারে, কিংবা ধুলোবালি মিশে ওই হাল হয়েছে। স্রোতটা কোথাও বেশ চওড়া, নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে, এখনও উপত্যকার পাথুরে গা খুঁড়ছে, বিন্দু বিন্দু করে

কাউরু বুঝতে পারছে, যা সত্য তা মেনে নিতে হবে ওকে। এই দুনিয়ায় সে উপস্থিত, কারণ কেউ একজন রাইয়োজি টাকাইয়ামার জেনেটিক ইনফরমেশন-এর ওপর ভিত্তি করে গঠন করেছে তাকে। এটা মেলে, কাজেই তাকে সেটা স্বীকার করতে হবে। চাইলে সবকিছু অস্বীকার করতে পারে সে, কিন্তু নিজের নিয়তির কাছ থেকে পালানো সম্ভব নয়।

কাউরুর নিয়তি লুপে ফিরে যাওয়া।

বাতাসের গতি বেড়েছে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা থেকে এক পা পিছিয়ে

BanglaBook.org

এল ও। পাহাড়ের চূড়া থেকে খসে গিরিখাদের মেঝেতে পড়া কোনো কাজের কথা নয়। তার মানে হবে মূল্যবান তথ্য হারানো– দুটো পৃথিবীর সমাপ্তি।

এলিয়টের প্ল্যানটা শয়তানিতে ভরা। আসলেই বিশ বছর ভবিষ্যত দেখতে পেয়েছিলেন তিনি, যেমনটি স্বীকার করেছেন।

ঠিক কি কারণে টাকাইয়ামার বাস্তব দুনিয়ায় আসার আকাঙ্ক্ষা পূরণের তাগিদ অনুভব করেছিলেন এলিয়ট, বিশ বছর আগে? ব্যাপারটাকে সম্ভবত ক্লোনিং নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে দেখেছিলেন তিনি, তবে তারচেয়ে বড় কারণ নিউট্রিনো স্ক্যানিং ক্যাপচার সিস্টেম সম্পর্কে ততদিনে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেছেন তিনি

তাঁর মাথায় তখন নতুন একটা আইডিয়া: একজন মানুষের সম্পূর্ণ মলিকিউলার স্টাকচার ডিজিটালাইজেশন, তখনও আবিষ্কৃত হয়নি এমন সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে। তিনি আসলে আগেই একটা ট্রায়াল সাবজেক্ট বেছে নিয়েছিলেন।

নিউট্রিনো স্ক্যানিং করতে স্বেচ্ছাসেবী হবে কেউ, এমনটি আশা করা যায় না, অথচ স্বেচ্ছাসেবী ছাড়া মেশিনটা কতটুকু কি করতে পারে তা যাচাই করা সম্ভব নয়। সে-সব দিন বাসি হয়েছে যখন টেস্ট সাবজেক্টকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে ধরে আনা হত। একজন তরুণ, স্বাস্থ্যবান, ইচ্ছুক ভলেনটিয়ার ছাড়া জটিল মেশিনটা স্রেফ পড়ে থাকবে।

এলিয়ট নিজেই খুব ভালো একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'আমরা যদি লূপ থেকে কাউকে বাস্তব দুনিয়ায় তুলে এনে বেশ কিছুদিন এখানে রাখি, তাহলে তার ওপর এনএসসিএস ব্যবহার করার আইনসম্মত একটা কারণ পাই: তাকে ফেরত পাঠানোর জন্যে। যদি সে বাড়ি ফিরতে চায়, আমরা তাকে সেখানে ফেরত পাঠানোর একটা পজিশনে থাকব।

'লূপ থেকে কাউকে বাস্তব দুনিয়ায় নিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল ক্লোনিং, কিন্তু বাস্তব দুনিয়া থেকে কাউকে লূপে পাঠানোর দরকার হলে তখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম দাঁড়াবে। এনএসসিএস ব্যবহার করে আমরা তোমাকে লূপের ভেতর পুনর্গঠিত করতে পারব এই মুহূর্তে ঠিক তুমি যেমনটি আছ–তোমার সচেতনতা, তোমার সকল চিন্তা-ভাবনা, তোমার স্মৃতি...'

যদি সে বাড়ি ফিরতে চায়।

ওটাই হলো শর্ত, আবার সমস্যাও। কী কারণে বাড়ি ফিরতে চাইবে ও? ও ওর বাবাকে দেখতে পাবে না, মাকে দেখতে পাবে না, রাইকোকে দেখতে পাবে না।

দেখতে পাবে না নিজের সন্তানকেও...কাউরু ইতিমধ্যে রাইকোর গর্ভের ভেতর ক্রোমজোম রোপণ করেছে–আসার পথে ওর সন্তান রয়েছে, মান্ধাতা

BanglaBook.org

আমলের জৈব পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার ফসল, এবং এই পরিস্থিতিতে ও যদি লূপে ফিরে যায় তাহলে কখনোই আর সেই সন্তানের মুখ দেখতে পাবে না।

শুধু যদি এগুলোই বিবেচ্য বিষয় হত, এলিয়টের বৈজ্ঞানিক খেলায় কক্ষনো অংশগ্রহণ করতে রাজি হত না কাউরু। প্রশ্নই উঠত না। ওর জিন হয়তো ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে এসেছে, কিন্তু বহাল তবিয়তে ও বেঁচে আছে এই দুনিয়াতে। বাড়ি? এটাই এখন ওর বাড়ি। আগে ও কি ছিল তাতে কিছু আসে যায় না, এখানে তার জন্ম হওয়ার পর থেকে নিজের জীবন ভালোই যাপন করছে ও, বেছে নিয়েছে নিজের পছন্দমতো পথ। এই জায়গা ওর ভালো লাগে।

কিন্তু ভাগ্য ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। না জেতার একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছে কাউরু।

টাকাইয়ামা পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলার সময় রিং ভাইরাস পালিয়ে যায়, তারপর এক পর্যায়ে মেট্যাসটাটিক হিউম্যান ক্যানসার ভাইরাসের সঙ্গে মিশে যায়। এটা একটা বাস্তব সত্য। রিং ভাইরাস টাকাইয়ামার জিনে গাঁথা ছিল, এবং জেনোম সিনথেসাইজার অপারেশন চলার কোনো এক সময় কিছু একটা গোলযোগ দেখা দেয়: ইনটেসটিনাল ব্যাকটেরিয়ামে আটকে যায় ছোট্ট একটা টুকরো।

তার মানে রিং ভাইরাস টাকাইয়ামার জিনে রয়ে গেছে, অসংক্রমিত অবস্থায়, তার একটা অংশ হিসেবে।

এলিয়টের মুখে এ-কথা শুনেই কাউরুর মনে প্রশ্ন জাগল, *এই ভাইরাস যদি আমার জিনে গাঁথা থাকে, আমি তাহলে এমএইচসি ভাইরাসে আক্রান্ত হইনি কেন?*

ওর যে শুধু ক্যানসার হয়নি, তা নয়, যতবার টেস্ট করেছে ভাইরাস আছে কিনা ততবার রেজাল্ট এসেছে নেগেটিভ।

এলিয়ট একটা ব্যাখ্যা দিলেন। 'আরএনএ-ডিএনএ ট্রান্সক্রিপসন প্রসেসের মধ্যে কোথাও কিছু একটা রূপান্তরের ঘটনা ঘটেছে–একটা স্টপ কোড প্রবেশ করিয়ে। টেস্টে সেটা ধরা পড়েনি। তুমি দেখো, সংক্রমিত কোষের P53 জিনে এমএইচসি ভাইরাস একটা রূপান্তর ঘটায়। ওই ভাইরাসের নিজেরই একটা টেলামার সিকোয়েন্স রয়েছে সংক্রমিত কোষের ডিএনএ-তে TTAGGG সিকোয়েন্স প্রবেশ করায় ওটা। তাতে করে কোষ অমরত্ব পেয়ে যায়, তবে সেই সঙ্গে হয়ে ওঠে ক্যানসারাসও।

'যেই মাত্র বুঝতে পারলাম এমএইচসি ভাইরাস টাকাইয়ামার কাছ থেকে এসেছে, তাড়াতাড়ি তোমার কোষের নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ শুরু করে দিই আমরা। আশা করি তুমি কিছু মনে করছ না। তোমার হয়তো স্মরণ আছে, কিছুদিন আগে একটা রক্ত পরীক্ষা করতে হয়েছে তোমাকে–কারণটা পরিষ্কার করা হয়নি। আমরা দেখে বিস্মিত হলাম যে তোমার সেলের টেলেমার

BanglaBook.org

সিকোয়েন্স TTAGGG নয়।

'তোমার ক্ষেত্রে মনে হলো, যদিও এমএইচসি ভাইরাস একটা টেলেমারেজ তৈরি করে এবং TTAGGG সিকোয়েন্স ডিএনএ-এর শেষপ্রান্তে সেঁটে থাকে, সেটা স্থির নয়, এবং খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। তোমার কোষের আয়ু বাড়ল না, তবে তোমার কোষ ক্যানসারাসও হলো না। তুমি হয়তো মানুষের নতুন একটা জাত, সত্যিকার অর্থে এমএইচসি ভাইরাসকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম।'

এলিয়টের ব্যাখ্যা বেশ অনেকটাই বোধগম্য হলো কাউরুর। ওর ভেতর যে প্রতিরোধশক্তি জন্মেছে, সেটা সম্ভবত এসেছে লূপ জিন আর বাস্তব দুনিয়ার জিনের মধ্যে ক্ষীণ পার্থক্যের কারণে। সমস্ত দিক বিবেচনায় রেখে বলা যায়, একমাত্র এটাই প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

এলিয়টের কথাগুলো ওর মাথায় যখন আঘাত করছে, কাউরু ভাবল ওর অতীত জীবনের চলার পথ গিরিখাদের তলায় বিস্তৃত হয়ে আছে, অনুসরণ করছে আলোর একটা ঝলককে। আলোর ওই ঝলক ভবিষ্যতে যে পথ পাড়ি দেবে তা যেন পূর্বনির্দেশিত হয়ে আছে।

কাউরু ভাবছে, ও এখানে আসতে চাইবে, এই সাজেশন প্রথম কখন ওর মনে গেঁথে দেয়া হয়েছিল। ওর দশ বছর বয়সে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যানমালি ম্যাপ কমপিউটার স্ক্রিনে পৌঁছে যায়, ও যে ডেটাবেইস ব্যবহার করছিল তার কোথাও ওই তথ্য না থাকা সত্ত্বেও। জানা কথা এলিয়টই ওটা পাঠিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই তাঁর পরিকল্পনা মতোই কাউরু জানতে পারে লঞ্জেভেটি জোনস সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য। মরুভূমির এই জায়গা সম্পর্কে কাউরুকে অস্বস্তির মধ্যে রাখার প্রয়োজন ছিল, তবে সরাসরি বা খোলাখুলি এলিয়ট তা করতে পারতেন না।

কাউরুর কৌতূহলকে জিইয়ে রাখার জন্যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তথ্য যোগান দিয়ে গেছেন তিনি। কাউরুকে ভাবতে দিয়েছেন এসব ওর নিজের আবিষ্কার, একের পর এক কোইন্সিডেন্স, একই সঙ্গে অত্যন্ত সাবধানে আভাস দিয়ে গেছেন মরুভূমির এই বিন্দুটিতে সবার জন্যে রোগমুক্তির রহস্যময় সম্ভাবনা আছে

কাউরু এখন নিশ্চিত, আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের কিংবদন্তি নিয়ে ওর মার মনে আগ্রহ জন্মানোর ব্যাপারেও হাত ছিল এলিয়টের আর সেই আর্টিকেলটাও মার হাতে তাঁর ইচ্ছেতেই পৌঁছেছিল, যাতে বলা হয়েছে অলৌকিকভাবে এক লোকের ক্যানসার ভালো হয়ে গেছে। এ-ধরনের গল্প গত ছ'মাসে সংখ্যায় বেড়েছে, সন্দেহ নেই কাউরু আর ওর মা যেগুলো পেয়েছেন তারচেয়ে অনেক বেশি পাঠিয়েছেন এলিয়ট।

তবে তাও যথেষ্ট: কাউরু এখন এখানে।

BanglaBook.org

কাউরু এখানে এসেছে নিজের গরজে, স্বেচ্ছায়, একটা সৎকর্মে বেরিয়ে পড়ার উদ্দীপনা নিয়ে, মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের ব্রত নিয়ে। ঠিক তাই চেয়েছিলেনও এলিয়ট, এটাই তাঁর চরম লক্ষ্য ছিল। তিনি যদি কাউরুকে ধরে, জোর করে এখানে নিয়ে আসতেন তাহলে প্রক্রিয়াটা কাজ করত না। স্ক্যানিং-এর মুহূর্তে হুবহু মানসিক অবস্থা পুনরুৎপাদন করবে এনএসসিএস ওকে যদি জোর করে এখানে ধরে আনা হত, ভয় আর বৈরিতায় ভরাট হয়ে থাকত ওর মন, এবং এসব অনুভূতি ওর সঙ্গে যেত। ওর স্বেচ্ছায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, মনে স্পষ্ট হয়ে থাকবে লক্ষ্য, এবং থাকবে নিয়তিকে মেনে নেয়ার প্রবণতা।

'জোর খাটানো আমার ধরন নয়,' এলিয়ট বলেছেন ওকে। কথাটার সত্যিকার অর্থ কাউরু বোঝে। অংশগ্রহণকারী অনিচ্ছুক হলে প্রজেক্টটা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মন থেকে চাওয়া এবং ব্রত পালনের মানসিকতা: এ দুটো নিয়ে হাজির হয়েছে কাউরু, এলিয়ট ঠিক যেমনটি চেয়েছেন। আর ওর সামনে এলিয়ট যে মুলোটা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, ব্রত পালনের প্রত্যয় অটুট রাখার জন্যে যথেষ্টই ছিল সেটা।

'এমএইচসি ভাইরাসকে জয় করার চাবি তোমার ভেতরে রয়ে গেছে তোমার জেনোম আমরা ত্রৈমাত্রিক বিশ্লেষণ করতে না পারলে, তোমার মাইট্যাকনড্রিয়া, তোমার মেটাবলিক সাইকেল, তোমার সিক্রেয়েশন ফ্যাক্টর এটার রহস্য উন্মোচন করতে পারবে না। শুধুমাত্র তোমার ডিএনএ সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। তোমার সম্পূর্ণ শরীর ডিজিটালাইজ করার প্রয়োজন হবে আমাদের। আমরা ভাবছি একটা বিশেষ জিন প্রবেশ করানোর পদ্ধতি শক্তিশালী চিকিৎসা হতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করানোর সম্পূর্ণ প্রভাব বোঝার জন্যে বিশদ সিম্যুলেশন চালানোর দরকার হবে, সেজন্যে তোমার সম্পর্কে ডেটা পেতে হবে আমাদের। তুমি বোঝো, কি মানে এটার? তোমার কাছ থেকে যা জানব আমরা, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ ঘটবে। প্রথমেই যারা লাভবান হবেন তাঁদের মধ্যে থাকবেন তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার প্রেমিকা। নিজের জীবন বাজি রাখার বিনিময়ে এই পুরস্কার তোমার প্রাপ্য

প্রতিশ্রুতি দেয়ার সময় এলিয়টের চেহারায় একটা বাগ্মীতা ফুটল।

এখানে যে লঞ্জেভেটি জোন পাবে বলে কল্পনা করেছিল কাউরু, প্রমাণ হয়ে গেছে সেটা স্রেফ একটা মরীচিকা ছিল। তার একমাত্র রেশ বলতে রয়ে গেছে এই প্রাচীন ও ভঙ্গুর বিজ্ঞানী, তিক্ততায় ভরা মন নিয়ে ভাবল কাউরু। তবে লঞ্জেভেটি জোনে কাউরু যেটা পাবে বলে আশা করেছিল–এমএইচসি ভালো করার একটা কার্যকর চিকিৎসা, ওর প্রিয়জনদের প্রাণ বাঁচানোর একটা উপায়, পৃথিবীর গোটা প্রাণীজগৎকে এই ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত

BanglaBook.org

রাখা–এটা ওর জন্যে অনুমোদন করা হয়েছে, একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটা উপায়ে! বিনিময়ে ওর নিজের শরীরটাকে...

মনে করা হচ্ছে ওর শরীরে এমন কিছু একটা আছে, যেটা ওই ভাইরাসের প্রভাব পুরোপুরি প্রতিরোধ করতে পারে, এবং তৎক্ষণাৎ ও নির্ভুলভাবে সেই মেকানিজম উন্মোচিত করার সর্বোত্তম পন্থা হলো ওর নিউট্রিনো স্ক্যান করা। যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করবেন তা সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা হবে। ক্যানসার ভাইরাসের আতঙ্ক অদৃশ্য হয়ে যাবেঃ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ ভাইরাসটার সঙ্গে সহাবস্থান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

এর পেছনের যুক্তিটা বোঝে কাউরু। প্রচলিত পদ্ধতিতে এই জ্ঞানের পিছু নেয়ার সময় নেই। আরোগ্যলাভের একটা উপায় বের করতে পারার আগেই শেষ হয়ে যাবে সময়–অন্তত ওর বাবার জন্যে। ওর মা সম্ভবত পাগল হয়ে যাবেন, আর রাইকো হয়তো নিজেকে আর পেটের সন্তানকে খুন করবে।

কাউরু হয়তো ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে এসেছে, কিন্তু সে অনুভব করে ওর এই জীবনের গুরুত্ব আছে, এবং বেঁচে থাকারও আছে বিরাট মূল্য। এই বিশ বছর বেঁচে আছে সে–রাইকোর সঙ্গে যে খিদেটা মিটিয়েছে সেটাই তার প্রমাণ। ওই নারীর সান্নিধ্য না পেলে নিজেকে এত জ্যান্ত অনুভব করত না সে!

আমার অস্তিত্ব আছে, ঠিক এখানে, ঠিক এখন।

আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, শৈলশিরার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকল কাউরু, দিগন্তে সাজানো অদ্ভুত আকৃতির আরও একটা পাথরের মতো। সে তার সমস্ত সাহস এক করে একটা চিৎকার দিল, ওর পক্ষে যত জোরে সম্ভব।

চিৎকারটা গিরিখাদে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল, ছুটে গেল সমতল প্রান্তর ধরে দিগন্তের দিকে, হারিয়ে গেল দূরে। কাউরু কল্পনা করল ঠিক ওভাবে হারিয়ে যাবে ও নিজেও, পেছনে রেখে যাবে শুধু কিছু প্রতিধ্বনি।

এলিয়টের প্রতি ওর অনুভূতি, বলাই বাহুল্য, বেশ জটিল। সরাসরি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করার উর্ধ্বে তারা। যত যাই হোক, এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে একটা শারীরিক অস্তিত্ব পাওয়ায় এলিয়টকে ধন্যবাদ দিতে হয় ওর। গত বিশ বছর ধরে যত আনন্দ আর বেদনা অনুভব করেছে, তার সমস্ত কৃতিত্ব এলিয়টের মগজ বা মেধাকে দিতে হবে। অন্তত শুধু এ কারণে তাঁর প্রতি ঋণী ও। কেউ যদি এখন ওকে জিজ্ঞেস করে এই জীবন চায় কিনা, অনুরণন তোলা একটা হ্যাঁ উচ্চারণ করবে ও। তবে এও ঠিক, ও যদি এই শারীরিক অস্তিত্ব না পেত, পৃথিবীর বুকে ক্যানসার ভাইরাস কক্ষনো ছেড়াত না।

কাউরু জানে সেজন্যে ও কোনোভাবে দায়ী নয়। তবে যেহেতু তা অস্বীকার করা যায় না, তাই একটা বোঝার মতো চেপে রয়েছে ওর মনে।

যাই হোক, এটা হতাশায় ভোগার সময় নয়, সময় নয় বিবেকের দংশন

BanglaBook.org

অনুভব করার। এখন সময় নিজেকে শক্ত করার, এবং মূল্য পরিশোধ করার। এখন সময় ভবিষ্যতে তাকানোর। সব সময় ভবিষ্যতকেই দেখতে হবে।

ঘুরল কাউরু, দৃঢ় পায়ে ফিরে যাচ্ছে।

ছয়

সব কাজ শেষ করতে আরও দশদিন লেগে গেল। সময়টা কাউরু ব্যয় করল লূপে টাকাইয়ামার জীবন কেমন ছিল তার রেকর্ড ঘেঁটে, সমস্ত কিছু নিজের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে, একেবারে সেই মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। সমস্তটাই নিজের করে নিয়েছে ও, মা-বাবা ও বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, চিন্তার ধরন, কথা বলার কেতা পর্যন্ত

যতদিনে কাউরু একজন মেকানিক্যাল অনুবাদক ছাড়াই লূপে প্রচলিত ভাষা বুঝতে শিখল, ততদিনে লোকটার জীবনও প্রায় পুরোটাই স্মৃতিতে গেঁথে নিয়েছে। দুজনের জিন এক, বোধহয় সে কারণেই কাউরুর মনে হলো ওর ওই লোকে রূপান্তর হওয়া বরং এভাবেই স্বাভাবিক। দেখা গেল, যতই জানতে পারছে টাকাইয়ামাকে আলাদা একজন মানুষ হিসেবে ততই কম বিবেচনা করছে সে। নির্দিষ্ট কিছু মুহূর্তে টাকাইয়ামার জীবন ওর জীবনের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে।

তারপর সেই বিশেষ দিনে, সকালবেলা, কাউরুকে নিয়ে এলিভেটরে চড়লেন এলিয়ট। সারফেস থেকে তিন হাজার ফুট নীচে নামার সময় কাউরুর সমস্ত ইতস্তত ভাব দূর হয়ে গেল। দূরবর্তী সেই তীরে পৌঁছুতে হবে ওকে, কিন্তু আশ্চর্য, তারপরও ওর মনে কোনো ভয় নেই এলাকার বিশেষ আবহাওয়া ওর মন আর মেজাজে ভাবগাম্ভীর্য এনে দিয়েছে, করে তুলেছে শক্তিমান।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। এনএসসিএস-এর কন্ট্রোল সেকশনের অংশবিশেষ দেখতে পেল কাউরু। পুরু নিরাপত্তা পাঁচিলে ঘেরা, সবগুলো কমপিউটারের আলো মিটমিট করছে। তবে এখনও ওরা এনএসসিএস-এর ভেতর ঢোকেনি। ওখানে কাউরু একা ঢুকবে।

কাউরুর সঙ্গে সমান তালে এগোচ্ছেন এলিয়ট। মোটর লাগানো হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে রাজি হননি তিনি। কাউরুকে বলেছেন পেশি সবল রাখার জন্যে নিজেকে ঠেলতে হয় এমন বাহন দরকার তাঁর। মান্ধাতা আমলের হুইলচেয়ার বেমানান লাগছে এখানে, চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে অত্যাধুনিক টেকনলজি।

সামান্য হাঁপাচ্ছেন এলিয়ট, বললেন, 'শুরু করার আগে তোমাকে আমি

BanglaBook.org

একটা প্রশ্ন করতে চাই, যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। তুমি এরকম কিছু মনে করো না তো যে আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এমএইচসি ভাইরাস ছেড়েছি?'

চিন্তাটা একসময় কাউরুর মনে জেগেছিল, তবে পরে ওর সমস্ত সন্দেহ কেটে গেছে।

'তা আপনি কেন করতে যাবেন?'

এলিয়টের পেছনে গিয়ে চেয়ারটা ঠেলার চেষ্টা করল কাউরু, কিন্তু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওকে বাধা দিলেন প্রবীণ ভদ্রলোক। 'আমার কাজ আমাকেই করতে দাও,' বললেন তিনি, নরম সুরে, হুইলের ওপর নিজের মুঠো আবার শক্ত করলেন। 'আমি কেন কাজটা করতে যাব, জিজ্ঞেস করছ? সেটা পরিষ্কার না? লূপের ফান্ড সংগ্রহ যাতে নিশ্চিত হয়।'

কথাটা ঠিক, এলিয়ট যদি এরকম একটা যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন যে এমএইচসি ভাইরাসকে পরাস্ত করার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লূপ প্রজেক্ট আবার চালু করা, তাহলে বিশাল একটা ফান্ড পাওয়ার পথ খুলে যাবে তাঁর সামনে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই ভাইরাসকে ঠেকানো সর্বপ্রথম কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, কেউ যদি কিছু একটা আবিষ্কার করতে পারে, চারদিক থেকে লাখ লাখ বস্তায় ভর্তি হয়ে টাকা আসতে থাকবে। বিনিয়োগের ফলে যে বিপুল লাভ পাওয়া যাবে তা হিসেব করা সম্ভব নয়, সমাজে কি অবদান রাখবে সে ব্যাপারে না হয় কিছু না-ই বলা হলো। আর ওই ফান্ড হাতে পেলে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন এলিয়ট–আবার চালু হবে লূপ, যে স্বপ্ন গত বিশ বছর ধরে দেখছেন তিনি।

'আপনি ওরকম কিছু করবেন না।'

'কেন আমি ওরকম কিছু করব না?'

'কারণ আগে থেকে আপনার জানার উপায় নেই ভাইরাসটা ঠিক কি আচরণ করবে। এটা, এবং আমি একটা কঠিন সময় পার করেছি ওটার প্রতি আপনার ঘৃণা ভান বলে মনে করে।'

ঢোক গিলে গলার ভেতর অদ্ভুত একটা শব্দ করলেন এলিয়ট। তিনি নিজেও সংক্রামক ক্যানসারে আক্রান্ত কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মানুষকে হারিয়েছেন: পরিষ্কার বোঝা যায় এটার প্রতি তাঁর শত্রুতা কোত্থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

'তুমি বুঝতে পারায় আমি খুশি। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়াটা দুর্ঘটনা ছিল, সহজ এবং নির্ভেজাল। ওটা এরকম চতুর, এরকম ভয়ঙ্কর হবে জানলে আমি আরও অনেক, অ-নে-ক সাবধান হতাম...' হতাশার সুরে সত্যতার অনুরণন আছে।

'জানি। তা যদি আমি বিশ্বাস না করতাম, এখানে নামতাম না।'

BanglaBook.org

হুইলচেয়ার থামিয়ে কাউরুর দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর বিস্ফারিত চোখ ভিজে উঠছে

'তার মানে তোমার কোনো...আক্রোশ নেই?'

'কী জন্যে?'

'তোমাকে এই দুনিয়ায় নিয়ে আসার দায়িত্বটা আমি নিজের কাঁধে তুলে নেয়ায়। তারপর এ-কথা বলায়, "সময় শেষ, এবার যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও।" '

'কিন্তু আপনি না হলে একজন মানুষ হিসেবে এখানে আমার থাকাই হত না। গত বিশটা বছর মোটেও খারাপ কাটেনি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি আমাকে প্রচুর স্মৃতি দিয়েছেন। আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো রাগ নেই।'

গোটা ব্যাপারটাকে একজন দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছে কাউরু। ও বুঝতে পারছে বর্তমান দুনিয়াটাকে যদি পুরোপুরি সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে যে দুনিয়া আসছে সেটার প্রতি ভয় ছাড়া আর কিছু থাকবে না ওর কাছে। দুঃখ-কষ্ট ওকে ক্লান্ত করে তুলেছে। বাবা, মা, এবং প্রেমিকাকে এমএইচসি ভাইরাসে সংক্রমিত হতে দেখেছে। সাক্ষি হয়েছে রিয়োজির স্বেচ্ছামৃত্যুর। কিন্তু তারপরও নির্দ্বিধায় বলতে পারবে ও, এই জীবনটা ভালো ছিল। হলওয়ে ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় এই বোধটাই ওকে দৃঢ় ও শান্ত রাখতে পারছে।

'থামো একটু, আমার সঙ্গে দুটো কথা বলো।' বরাবরের মতোই এলিয়টের ঠোঁটের কোনে লালা ঝরছে।

'ঠিক আছে।'

দীর্ঘ হলওয়ের মাঝখানে, যেটা ওদেরকে নিউট্রিনো স্ক্যানারে পৌঁছে দেবে, থামল ওরা। দেয়ালের গায়ে হেলান দিল কাউরু, এলিয়েট হুইলচেয়ারের পেছনটায় খুলি ঠেকিয়ে মাথাটাকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছেন। পরস্পরের শিথিল হওয়ার ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল দুজন।

'আমি জানি কথাটা একবার তোমাকে বলা হয়েছে, সেটা হলো, এনএসসিএস-র জন্যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম আগেই সব করা না থাকলে এখানে তোমার জন্য দেয়ার ব্যবস্থা আমরা করতে পারতাম না, সব কিছুই পরস্পরের সঙ্গে অর্গানিক্যালি সংযুক্ত। শুধু যদি মাত্র একটা এলিমেন্ট না থাকত, গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম চেহারা নিয়ে হাজির হত।'

'তারমানে এটা স্রেফ একটা কোইন্সিডেন্সের লূপ?'

'সন্দেহ নেই কোইন্সিডেন্সের কারণেই লূপ আবার চালু করি আমরা—আবার চালু করতে বাধ্য হই। কিন্তু লূপ আর বাস্তব দুনিয়া কোনো এক পর্যায়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

BanglaBook.org

এটা কাউরু নিজেও লক্ষ করেছে। ব্যাপারটা অনেকটা যেন এরকম–ভার্চুয়াল দুনিয়া, ক্যানসারে জর্জরিত, সময়ে স্থির হয়ে গেছে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাস্তব দুনিয়ায় চলে আসার জন্যে।

আবার ব্যাখ্যা শুরু করে নতুন একটা ছবি দিলেন এলিয়ট। 'এমন একটা পর্যায় আসে, যখন কোনো শিশু–বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব একটা এগিয়ে না থাকলেও–লক্ষ করে যে একটা অ্যাটমের কাঠামোর সঙ্গে সৌরজগতের মিল আছে। শিশুটি দেখতে পায় অ্যাটম আর তার অংশবিশেষ কণাগুলো কীভাবে নিজেদের বিশ্ব তৈরি করেছে, তাই সে ভাবে ওই খুদে 'গ্রহ'গুলোয় প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, যেমনটি আমাদের গ্রহে আছে। এটাই জীবনের বৃত্ত। সেজন্যেই আমি এটার নাম দিই লূপ।'

'মনে পড়ছে, প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় আমি আমার বাবাকে এ-ধরনের একটা কথা বলেছিলাম।' কাউরুর দৃষ্টিতে, এটা শুধু মাইক্রোস্কোপিক রাজ্যে ওভাবে কাজ করবে না। হয়তো সৌরজগৎই একটা অ্যাটম, আর ছায়াপথ অ্যাটমের সমষ্টি, একটা মলিকিউল চারপাশকে ঘিরে থাকা বিশ্ব একটা সেল, এবং সমস্ত অস্তিত্ব একটা মস্ত প্রাণীসত্তা। একটা অস্তিত্ব, যেটা নিজের ভেতর ধারণ করে আরেকটা অস্তিত্ব, সেটা নিজের ভেতর আরও ছোট অস্তিত্ব ধারণ করে –সাজানো এক সেট বাক্সের মতো। প্রাচীন কিছু ধর্ম এই দৃষ্টিতে দেখত, জীবনকেও তারা এভাবে বৃত্তাকারে ঘুরতে দেখত–অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত জুড়ে।

'বৃত্তটা ভেঙে গেলে কী ঘটবে বলে মনে করো তুমি? মাইক্রোস্কোপিক আর ম্যাক্রোস্কোপিক পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত–যদি বৃত্তের অংশবিশেষ থেমে যায়, সেটা বাকিটুকুর ওপর প্রভাব ফেলবে।'

'বৃত্ত যদি ভেঙে যায়–ওটাকে তাহলে নতুন করে জোড়া লাগাতে হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক। তবে সূচনায় ফিরে গিয়ে নতুনভাবে শুরু করার মতো সহজে নয়। লূপের ওপর যে-সব বিপর্যয় নেমে এসেছিল সেগুলো আমাদের পার হতে হয়েছে, তারপর নতুন করে জোড়া লাগিয়েছি।'

'তাহলে লূপের ঐতিহাসিক কক্ষপথ ভ্রমণের কী হবে? ওটার ক্যানসারের?'

'যেকোনো প্রজাতির ক্রমবিকাশের ধারায় শেষ পর্যন্ত যা ঘটে, এখানেও তাই ঘটবে, সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। লূপের মেমোরি ব্যাঙ্কে রেকর্ড থেকে যাবে, তবে ঘটনাসমূহ বাস্তব দুনিয়ার ইতিহাস থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দেয়া হবে, ঠিক আমরা যেভাবে ক্যানসার সেল কেটে বাদ দিই। লূপের ইতিহাস ঠেলে সরিয়ে দেয়া হবে পাশের একটা গলিতে। ওটা আবার শুরু হবে নতুন একটা পাতা থেকে।'

আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোবার সময় দৃশ্য তৈরি করছে একটা নদী। নীচের

BanglaBook.org

দিকে গড়াবার সময় জমিনের আকৃতি অনুসরণ করছে পানি, তবে মাঝে মধ্যে নিজেকে ফাঁদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে, তখন ওটা ফুলে একটা জলাশয় তৈরি করছে। কিন্তু তারপরও সব সময় পালাবার একটা পথের খোঁজে থাকে পানি, জমিনের দুর্বল জায়গা খোঁচাখুঁচি করে যতক্ষণ না নতুন একটা পথ তৈরিতে সাফল্য আসে। এটা বলা কঠিন কিছু নয় সাগরে পৌঁছুনোর পথে কোথায় বাধা পায় একটা নদী: তীক্ষ্ণ বাঁক আর দ্বীপগুলো সেই গল্পের আভাস দেয়।

সেই অর্থে লূপ একটা নদী। এই মুহূর্তে সেটা থেমে আছে, তার পথ রুদ্ধ। কিন্তু ওভাবে রেখে দিলে, উপচে পড়ার একটা উপায় বের করে নেবে ওটা, এবং বাস্তব দুনিয়ায় একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভুলে গেলে চলবে না বাস্তব দুনিয়া ওটার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে।

ক্যানসার ভাইরাসের সঙ্গে লড়ার জন্যে বাস্তব দুনিয়ার নিজস্ব যেমন একটা কৌশল দরকার, সেই একই রকম প্রয়োজন লূপের গতিপথ পরিবর্তন করা, ওটার ক্যানসার ইতিহাস। যতদিন না তা করা হচ্ছে ততদিনে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসবে না।

লূপের থেমে থাকা অবস্থার পরিবর্তন সাধনই কাউরুর কাজ, আবার যাতে প্রবাহিত হতে পারে তারজন্যে নতুন একটা উপায় খুঁজে বের করা।

আবার মুখ খুললেন এলিয়ট।

'বিশ্বে মাঝে মধ্যে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ দরকার হয়। কাজেই এক কুমারীর গর্ভ থেকে জন্ম নিলেন ঈশ্বর। তাঁর পুনর্জন্মও হলো। এবং ...এখানে সমস্ত আয়োজন তৈরি করা হয়েছে।'

ওকে কি বলা হচ্ছে বুঝতে পারল কাউরু: ওকে একজন ঈশ্বর হতে হবে। ব্যাপারটা ওর কাছে সত্যি বা বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওকে এই পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

আবার হলওয়ে ধরে হাঁটা ধরল কাউরু, ভাবছে–*ওয়েন'স রকে যে ইন্ডিয়ানের জীবন আমাকে দেখানো হয়েছিল: কী মানে ছিল সেটার?*

জানা কথা ওর যাতে ওই অভিজ্ঞতা হয় তার আয়োজন এলিয়টই করেছিলেন। কেন, তা এখনও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কাউরুর নিজের অনুবাদ হলো, ওটা ছিল মৃত্যুর ড্রেস রিহার্সেল। তবে সম্ভাব্য অন্য একটা অর্থ এইমাত্র ওর মাথায় ঢুকেছে।

ওই ইন্ডিয়ান তার স্ত্রী আর সন্তানকে নিজের চোখে মারা যেতে দেখেছে। ওই নিষ্ঠুরতা, ক্ষতি, এবং সে-ব্যাপারে কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা নিজের মৃত্যুচিন্তার চেয়েও অসহনীয় ছিল। অন্ধকারের কালো পরদা তাকে ঢেকে ফেলার আগে পর্যন্ত, তার চিন্তা-ভাবনা ছিল করুণ, খেপাটে, ভীত-সন্ত্রস্ত –ওদেরকে বাঁচাতে না পারার জন্যে। এই সব নেগেটিভ ইমেজ কাউরুর

BanglaBook.org

হেলমেট ডিসপ্লের চারদিকের অন্ধকারে একটা ঘূর্ণি তোলে, ওটা খুলে ফেলার পর নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কক্ষনো ওই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে রাজি হবে না সে–ভার্চুয়াল দুনিয়াতে হোক বা বাস্তব পৃথিবীতে

ওই ইন্ডিয়ানের ইতিহাস এমন একজন মানুষের ইতিহাস নয় যে তার স্ত্রী আর কন্যার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। গল্পটা তারচেয়েও খারাপ, এত খারাপ যে তুলনা মেলা ভার–এ এমন এক লোকের কাহিনি, তাদের মৃত্যু তাকে জোর করে দেখতে বাধ্য করা হয়েছে।

আমাকে ওটা দেখানোর কী দরকার ছিল–ওই অভিজ্ঞতা আমার কী কাজে লাগবে?

পরবর্তী ঘটনাগুলো স্মরণ করলে, এটা স্বীকার করতে হবে যে ওই অভিজ্ঞতা ওর ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল, সেটা এলিয়টের প্ল্যান অনুসারেই। ওই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আর কখনও যেতে না চাওয়ার অটল ইচ্ছেটা আপনজনদের বাঁচানোর জন্যে নিজেকে বিসর্জন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছে ওকে। তবে এখন কাউরুর মনে শিকড় গেড়েছে অন্য একটা ধারণা, ওকে ফাঁদে ফেলে ব্যবহার করা হচ্ছে, এলিয়ট নিজের প্ল্যান মতো ওকে দিয়ে যা করাতে চেয়েছিলেন তা-ই করিয়ে নিচ্ছেন।

কিছু পরস্পরবিরোধী অনুভূতি নিয়ে করিডর ধরে হাঁটছে কাউরু। হুইলচেয়ারে ওর পিছু নিয়ে আসছেন এলিয়ট।

'কাউকে একটা ফোন করতে ইচ্ছে করছে না তোমার?'

দাঁড়িয়ে পড়ল কাউরু। 'ফোন?'

'হ্যাঁ। এমন কেউ নেই যার সঙ্গে তুমি কথা বলতে চাও?'

বাবার সঙ্গে কাউরু কথা বলেছে খুব বেশিক্ষণ হয়নি। মার গলা শুনতে পেলে ভালো লাগবে, কিন্তু তাঁকে কি বলবে তা ওর জানা নেই। যে কাজটা করতে যাচ্ছে, কীভাবে তা ব্যাখ্যা করবে মাকে? জানা কথা, কিছুই বুঝবেন না ম্যাচিকো।

রাইকো। সে ছাড়া কথা বলার মতো আর কেউ নেই ওর।

কাউরুকে হলওয়ে থেকে একটা কামরায় নিয়ে গেলেন এলিয়ট, তারপর ওর হাতে ফোনের রিসিভার ধরিয়ে দিলেন।

ডায়াল করছে কাউরু, সঙ্গে প্রার্থনা, রাইকো যাতে ওখানে থাকে। ইঙ্গিতে ওকে একটা মনিটর দেখালেন এলিয়ট, যেন জানতে চাইছেন, ওর কি ভিডিও দরকার? প্রস্তাবটা কাউরু প্রত্যাখ্যান করল। ভিডিও-ফোন কলের কোনো প্রয়োজন নেই। ওর অনুভূতি বলছে শুধু তার কণ্ঠস্বর, অপ্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য না থাকলে, স্মৃতিতে ধারণ করতে সুবিধে হবে ওর।

যোগাযোগ হলো। 'হ্যালো?'

BanglaBook.org

রাইকোর কোমল কণ্ঠস্বর অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলল, কাউরুর চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে। আবেগের বিরতিহীন স্রোত হতবিহ্বল করে তুলল ওকে। স্মৃতিগুলো গ্রাস করছে, মৌখিক এবং চাক্ষুষ একটা বিস্ফোরণ, ট্রিগার হিসেবে কাজ করেছে রাইকোর গলার আওয়াজ। নিজের ওপর ওর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই

'হ্যালো? হ্যালো?'

কাউরু উপলব্ধি করল রাইকোকে ফোন করা ওর উচিত হয়নি।

সাত

কালো একটা দরজার সামনে শেষ হয়েছে করিডর। এখানেই এলিয়টকে গুডবাই বলে বিদায় জানাল কাউরু।

করমর্দনের জন্যে কাউরুর দিকে প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়ালেন এলিয়ট। চাপটা ফিরিয়ে দিল কাউরু, তবে খুব বেশি জোরে নয়। রাইকোর সঙ্গে শেষ আলাপটা এখনও দখল করে রেখেছে ওর মগজ –হৃদয়টা ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে গেছে–দৃষ্টি অন্যত্র।

'আমি মনে হচ্ছে খুব বেশিদিন বেঁচে আছি।'

এক ঝটকায় বাস্তবে ফিরে এল কাউরু। এলিয়টের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করল, প্রবীণ ভদ্রলোক সত্যিসত্যি যতটা উচিত তারচেয়ে বেশিদিন বেঁচে আছেন। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি ভালোমতো অনুধাবন করেন ঠিক কতদিন তাঁর বাঁচা উচিত।

শেষে আমিও তোমার পিছু নেব, তিনি যেন এরকম কিছু বলতে চাইলেন কাউরুকে, যদিও আসলে তারা দুজন দুটো আলাদা জায়গায় যাচ্ছেন। কাউরু যেখানে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে, এলিয়ট সেখানে কখনোই যাবেন না।

'যে-সব প্রতিজ্ঞা করেছেন, একটাও ভুলবেন না,' বলল কাউরু। এলিয়টের কাছ থেকে আরেকটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে ও। কাউরুর শরীর থেকে পাওয়া ডেটা সবার আগে ওর মা-বাবা আর রাইকোর প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে, এটা ছাড়াই।

'ভুলব না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

এলিয়টের উত্তর কান খাড়া করে শুনল কাউরু, তারপর ঘুরে দরজা খুলল। এই পর্যায়ের পর একমাত্র ও-ই সামনে এগোতে পারবে। ভেতরে ঢুকল ও, আপনা থেকেই ওর পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

BanglaBook.org

অদ্ভুত একটা গন্ধ, সম্ভবত আয়ন। এখন লাউডস্পিকার থেকে নির্দেশ আসছে ওর কাছে। অ্যাড্রেস সিস্টেমের স্পিকার থেকে বেরিয়ে আসা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরই একমাত্র আওয়াজ যেটা বাইরে থেকে আসছে। ওটা ছাড়া বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কাউরু।

নির্দেশমতো পরনের গাউন খুলে ফেলল, তারপর একে একে স্যান্ডেল আর আন্ডারঅয়ার পাশের কামরায় নগ্ন হয়ে ঢুকল। এলিয়ট ওকে জানিয়েছেন, কয়েকটা পরিষ্কারক কামরার ভেতর দিয়ে যেতে হবে ওকে।

কি ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা আছে কাউরুর। যে প্রকাণ্ড গোলকটাকে নিউট্রিনো স্ক্যানিং ক্যাপচার সিস্টেম বলা হচ্ছে সেটার মাঝখানে ঝুলে থাকবে ও, ওখানে চারদিক থেকে ওর ওপর নিউট্রিনো নিক্ষেপ বা বর্ষণ করা হবে। তবে তার আগে একটা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে ওকে।

পাশের কামরায় একটা স্ট্রেচার দেখল। নির্দেশ এল, ওটার ওপর শুয়ে পড়ো। চিৎ হয়ে শুলো ও, স্ট্রেচার নিজে থেকেই সরু এবং অন্ধকার প্যাসেজ ধরে এগোল। ওটা ওকে বাতাসের একটা প্রবাহের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী প্রবাহটা বিশুদ্ধ পানির। দুটোয় মিলে ওর শরীরের বাইরের আবরণ থেকে সমস্ত জীবাণু এবং দূষিত পদার্থ ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।

লাইনের প্রতিটি স্টেশন পার হওয়ার সময় ডিজিটাল মিটার দেখতে পাচ্ছে কাউরু, লাল আলোর ঝলক, প্রতিটি পর্বে ১০০-র দিকে পৌঁছুচ্ছে সংখ্যাগুলো। ৯৯.৯৯...৯৯.৯৯৯...৯৯.৯৯৯৯...গজ দেখাচ্ছে কামরা, এবং সেই সঙ্গে কামরায় যে অবস্থান করছে, দূষণ থেকে ক'ডিগ্রি মুক্ত।

এরপর স্ট্রেচার ওকে ঢুকিয়ে দিল লম্বাটে, চৌকো কন্টেইনারের ভেতর। বিশুদ্ধ পানি, দৈহিক তাপমাত্রার চেয়ে সামান্য একটু বেশি গরম, ওকে প্রায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। কন্টেইনার দেখতে বাথটাব নয়, বরং একটা কফিনের মতো, আকারে সামান্য একটু বড়।

নিজের জায়গায় স্থির হয়ে আছে কাউরু, পানিতে ভাসছে। এরপর ওকে নিউট্রিনো স্ক্যানিং ক্যাপচার সিস্টেমে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

পানিটা ওকে শান্ত হতে সাহায্য করল। ধীরে ধীরে এমন অবস্থায় পৌঁছুল, বলতে পারবে না কখন ওর শরীর পিছিয়ে গিয়ে পানি শুরু হয়েছে, ঠিক যখন আমিত্ব বা আত্মসচেতনতা গলে গিয়ে মিহি বুদ্বুদে পরিণত হচ্ছে আর মিশে যাচ্ছে পানিতে।

রাইকোর শেষ কথাটা আবার ফিরে এল ওর মনে, হতে পারে বাধা দেয়ার জন্যে অহং বোধের শেষ চেষ্টা ওটা।

আজ সকালে আমি বাচ্চার নড়াচড়া টের পেয়েছি।

BanglaBook.org

বাচ্চার বেড়ে ওঠার খবর দেয়ার সময় এত সুখী মনে হচ্ছিল তাকে। এই চিন্তাটা–রাইকোর অ্যামনিয়টিক ফ্লুইডে ভ্রূণটা ভাসছে– কাউরুকে নিজের অবস্থা বোঝার সুযোগ করে দিল, একজন দর্শক যেভাবে বুঝবে। ভাবতে গেলে, ওই বাচ্চার মতো একই অবস্থায় রয়েছে ও, সেই জন্ম নেয়ার ইচ্ছেটা সহ।

এই জায়গা নিজেই একটা বিশ্ব, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শাসিত। মাধ্যাকর্ষণ অদৃশ্য হয়েছে, শরীরের মনে হচ্ছে কোনো ওজন নেই। জানে একটা গোলকের ভেতর রয়েছে, ডায়ামিটারে ছ'শ ফুট। ওর চোখ দিয়ে সেটার ভেতরের সারফেস দেখতে পাবার কথা। কিন্তু অন্ধকার এখানে অনন্ত বলে মনে হচ্ছে।

ছেলেবেলায় প্রায়ই কাউরু ওদের বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে রাতের আকাশ দেখত। প্রতিবার চাঁদ-তারা দেখার সময় বিশ্বের গভীরতা বোঝার আকাঙ্ক্ষাটা আরও শক্তিশালী হত ওর।

দুটো পরিস্থিতির মধ্যে কত পার্থক্য। সে-সব দিনে অত উঁচু জায়গা থেকে সাগর দেখতে পেত, আর এই মুহূর্তে একটা মরুভূমির তিন হাজার ফুট গভীর একটা গর্তে রয়েছে। সে-সব দিনে সাগরের গন্ধ থাকত বাতাসে, এখন আয়নের কৃত্রিম গন্ধে ভরাট হয়ে আছে বাতাস।

কাউরুর মনে হলো ওর মাথার ওপর ফাঁকা জায়গার কোথাও এক পলকের জন্যে নীল আলো ঝিক করে উঠল। নিউট্রিনো বর্ষণ কি শুরু হয়ে গেছে? আলোর ঝিলিকটা ওকে মিটমিট করা নক্ষত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

এখন থেকে যেকোনো মুহূর্তে গোলকের প্রতিটি অংশের প্রতিটি বিন্দু ওর ওপর নিউট্রিনো বর্ষণ শুরু করবে। প্রতিটি নিউট্রিনো ওর শরীর ভেদ করবে, এবং সোজা গোলকের উল্টোদিকে পৌঁছুবে, যে দেয়াল থেকে রওনা হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত দেয়ালে। ধীরে ধীরে জড়ো হতে থাকবে ওর সম্পর্কিত মলিকিউলার ইনফরমেশন, যতক্ষণ না এলিয়ট ওর শরীরের ক্ষুদ্রতম কাঠামোর একটা থ্রি-ডাইমেনশনাল ডিজিটাল ইমেজ পেতে শুরু করেন। যত বেশি নিউট্রিনো গ্রহণ করবে কাউরু, তত বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে ওই ইমেজ।

ওকে বলা হয়েছে প্রথম দফায় ওগুলো ওর শরীর ভেদ করে যাবে, ও যদি কিছু অনুভব করেও, সেটা তেমন কিছু না। ওই মাত্রার রশ্মি ওদেরকে কাজে লাগার মতো যথেষ্ট তথ্য যোগান দেবে না। ওর শরীরে আরও অনেক বেশি নিউট্রিনো প্রবেশ করানো দরকার, কারণ ওঁরা আসলে ওর শরীরের কোষগুলোকে ভাঙতে চান। তখন, কিংবা তারপর কি হবে?

সেটা না ভাবার চেষ্টা করছে কাউরু।

এখন আরও নীল আলো দেখা যাচ্ছে, ঝিলিক দিচ্ছে আগের চেয়ে দ্রুত, অন্ধকারে দাপটের সঙ্গে মিটমিট করছে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ওগুলো। খসে পড়া তারার মতো বিস্তৃতি ধরে ছুটে চলেছে, চকচক করছে, পেছনে রেখে যাচ্ছে

BanglaBook.org

সাদা পুচ্ছ।

রাতের আকাশে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকল কাউরু, নিজেকে ওর শিশু মনে হচ্ছে আবার...

ভাবল মহাকাশচারীদের অনুভূতি এরকমই হয় কিনা। বলা হয়, যে ব্যক্তি মহাশূন্য থেকে পৃথিবীকে দেখার সুযোগ পেয়েছে সে আসলে স্বর্গীয় এলাকার একটু কাছাকাছি পৌঁছেছে। তা যদি সত্যি হয়, কাউরুর বেলায় তা একটু অন্যরকমই বলতে হবে। এখানে ওর নিজেরই ঈশ্বর হওয়া লক্ষ্য।

কিছু একটা আঘাত করছে ওর কানে, বারবার, একই ছন্দে–আশ্চর্যই, কারণ এখানকার একটা শব্দও ওর কাছে পৌঁছুনোর কথা নয়। কেউ বা কিছু খুব জোরে ওর কানে কথা বলছে। সেটা আর যাই হোক, মানুষের গলা হতে পারে না। তবে কি ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে আসা কোনো ডিজিটাল সংকেত?

হঠাৎ করে ওর মাথায় একটা ইমেজ ঢোকানো হলো। ঠিক যেন শ্যাগালের একটা পেইন্টিং ওর মাথার ভেতর জোর করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা চোখ দিয়ে দেখছে না–ব্যাপারটা যেন একটা ভিডিও ডেক থেকে বেরোনো কর্ড সরাসরি ওর মগজের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। রঙচঙে, ইমপ্রেশানেসটিক ইমেজ আলোর ঝলকের মতো ওর মনে আসা-যাওয়া করছে, যেমন দ্রুত আসছে, তেমনি ঝট করে হারিয়েও যাচ্ছে।

সাদাটে-নীল আলোগুলো এখন এলোমেলো সূচিকর্মের সঙ্গে জোড়া লেগে রয়েছে, মাঝ দূরত্বে পরস্পরকে ভেদ করে গেছে অসংখ্য সংযোগ। আলোর রেখাগুলো এখন অন্ধকারকে ভরাট করে তুলেছে। ওগুলোর সংঘর্ষের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও, অথচ কোনো শব্দ শুনতে পাবার কথা নয় ওর...ডিজিটাল সাউন্ড চারধারে ঘুরপাক খাচ্ছে, স্পর্শ করছে কানের লতি।

মাধ্যাকর্ষণবিহীন বিশ্বে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে ওর শরীরকে। কাউরু অনুভব করছে পানিভর্তি একটা ট্যাংকের তলা থেকে ওপরে উঠছে, উঠছে আলোর একটা ঘূর্ণির দিকে। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন, প্রতি মুহূর্তে আরও আলোকিত হচ্ছে।

কাউরু এখন চূড়ান্ত পর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ওর অভিযান এবার শেষ হতে চলেছে, যেটা শুরু হয়েছিল মরুভূমির একটা বিন্দুতে পৌঁছুনোর তাগিদ থেকে, যেটা মৃত্যু আর পুনর্জন্মের তীর্থযাত্রায় পরিণত হয়েছে।

ওর মাথার ভেতর কি সব ছবি ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, সেগুলো কর্কশ সব কণা দিয়ে তৈরি। মোজাইকসদৃশ্য ছবি, কিনারাগুলো অস্পষ্ট। যতই চেষ্টা করুক ছবিগুলো আগের মতো স্বাভাবিক, মসৃণ হচ্ছে না। ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট তথ্য নেই।

নিউট্রিনো বর্ষণ আরও তীব্র হলো। ওর মলিকিউলার কাঠামো ডিজিটাল

BanglaBook.org

আকৃতি নিতে শুরু করেছে। ওটার রেজালূশন বাড়ল, ওর মস্তিষ্কে থাকা ইমেজ থেকে মোজাইক ফিল্টার সরিয়ে নেয়া হলো। এখন ওগুলো ওর মনের চোখের সামনে পুনরুৎপাদিত হচ্ছে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ইমেজ হিসেবে।

দৃষ্টিশক্তি এখন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। ওর মনে হলো একটা করিডরের দূরপ্রান্তে আলো দেখতে পাচ্ছে, এখানে-এবং- এখন ও রয়েছে শেষবিচারের আগে মৃত মানুষের আত্মারা যেখানে জড়ো হয়।

ওর অভিযান শেষ হয়েছে। ওর শরীর বাস্তব দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং পুনর্জন্ম ঘটেছে ভার্চুয়াল দুনিয়া লূপে।

সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। যে ট্যাংকে কাউরু ভাসছিল তাতে এখন আর কোনো মানুষের কাঠামো বা আকৃতি নেই। তার পরিবর্তে ওতে আছে ওর ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষের তরল করা অবশিষ্ট। পানিতে মিশে যখন ওর অহং বোধ বিলুপ্ত হচ্ছিল, ওই একই সময় ওর শরীরও ভেঙে ক্ষুদ্রতম ভাগে বিভক্ত হচ্ছিল, মিশে যাচ্ছিল বিশোধিত পানিতে। পানি এখন আর বিশুদ্ধ নেই। লালচে বা রক্তাক্ত না দেখানোয় সাদাটে-নীলচে আলোকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তবে আগের চেয়ে ওটা বেশ খানিকটা ঘন হয়ে গেছে।

ওর শরীর এখন বিলুপ্ত। তবে কাউরুর সচেতনতা এখনও অটুট। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে নিউট্রিনোগুলো ওর মস্তিষ্কের অবস্থা ধরে রেখেছে; ওর সাইন্যাপসিস আর নিউরন, মিড-রিয়্যাকশন-এ কেমিক্যাল রিয়্যাকশন, সবই আবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই ব্লুপ্রিন্ট থেকে সরাসরি ওকে পুনর্গঠিত করা হবে না। বরং এনএসসিএস-এর সংগ্রহ করা তথ্য অনুসারে ওর পুনর্জন্ম হবে। বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, এবং লূপ সময় এক সপ্তার মতো পার হলে, সাবজেক্ট যখন এনএসসিএস-এর ভেতর ঢুকেছিল তখনকার শারীরিক আকার-আকৃতি পাবে শিশুটি। সে তার আদি সচেতনতাও ফিরে পাবে।

পরিষ্কার ধারণা আছে কাউরুর এখন ঠিক কোথায় রয়েছে সে। একটা গর্ভের ভেতর। এটা সত্যিকার একটা গর্ভ, কাল্পনিক বা প্রতীকী কিছু নয়। এক কুমারীর গর্ভে রয়েছে, ডুবে আছে তার অ্যামনিয়টিক ফ্লুইডে।

কাউরু ওর মার হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে, ভেসে আসছে যেন অনেক দূর থেকে। আটকানো গোলকের ভেতর, অন্ধকারে প্রতিধ্বনি তুলছে শব্দটা, ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

কাউরুর জানা নেই কার গর্ভে রয়েছে ও, তবে জানে ওর জন্ম নেয়ার সময় হয়েছে।

BanglaBook.org

শরীরটা লম্বা করল, দুনিয়ায় বেরোবার আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর।

আলোটা খুব বেশি উজ্জ্বল: ওর চোখ ব্যথা করছে। তবে এখন সেটা আর নীলচে মিটমিটে নয়। এটা সাদা, স্থির আলো, কৃত্রিম। মনে হচ্ছে মাথার ওপর ফ্লুরেসেন্ট আলোর আয়োজন আছে, হাসপাতালে যেমনটি দেখা যায়।

ওই আলোয় অ্যামবিলিকল কর্ডটা দেখতে পাচ্ছে কাউরু, এই একটা মাত্র সুতোয় মার সঙ্গে সংযুক্ত সে। হাত বাড়িয়ে ওটাকে ছেঁড়ার চেষ্টা করল, কেঁদে উঠল জোরে। এই কান্না যেকোনো স্বাভাবিক শিশুর মতোই।

'ওয়া! ওয়া!'

নতুন একটা অভিযানের শুরু ওটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবির্ভাব

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এক

দিনটা এত পরিষ্কার যে বিশ্বাস করা কঠিন এটা বর্ষাকাল। রাস্তা থেকে সৈকতকে আলাদা করে রেখেছে ফুটপাত, সেটা ধরে হাঁটার সময় চোখ তুলে রেখেছে দিগন্তে: উপসাগরের অপর দিকটা ঝাপসা হয়ে আছে। সৈকত থেকে একটা চওড়া পাঁচিল খানিকদূর এগিয়েছে, সেটার ওপর দাঁড়িয়ে কজন অ্যাঙ্গলার অলস ভঙ্গিতে ছিপ ফেলছে সাগরে। সময়টা এখনও গ্রীষ্মের মাত্র শুরু, কাজেই সমুদ্রস্নানে আসেনি কেউ, তবে দুটো পরিবার বালির ওপর কাপড় বিছিয়ে পিকনিক করছে।

এই শান্তিময় পরিবেশ ওকে ভুলে থাকতে দিচ্ছে এটা শুধু ভার্চুয়াল বাস্তবতা। লূপে পুনর্জন্ম হওয়ার পর ছ'মাস পার হয়ে গেছে। এই দুনিয়াটাকে আপন করে নিয়েছে সে–শারীরিক এবং মানসিক, দুভাবেই।

গত অক্টোবরে রাইয়োজি টাকাইয়ামা মারা গেছে, একবার। তার মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে, তারই এক ডাক্তার বন্ধু মিটসু আনডু ময়না তদন্ত করেছে। তারপরও, চলতি বছরের জানুয়ারিতে টাকাইয়ামা তার তিনমাসের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে–আনডু, তার প্যাথলজিস্ট সহকর্মী মাইয়াশিটা এবং অন্য কয়েকজনের সম্মিলিত সহযোগিতায়।

সাদাকু ইয়ামামুরা নামে এক কুমারীর গর্ভ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে, নিজের হাতে নাড়ী ছিঁড়েছে, এবং সাতদিনের মধ্যে বেড়ে এমন একটা শরীর পেয়েছে, নিউট্রিনো স্ক্যানারে ঢোকার সময় ঠিক কাউরু যেমনটি ছিল।

আনডু এবং মাইয়াশিটা মোটেও সচেতন নয় উন্নত একটা শক্তির দ্বারা তৈরি হয়েছে লূপ, কাজেই এটা আশা করা যায় না যে টাকাইয়ামার পুনরুত্থানের পেছনে সত্যিসত্যি কি মেকানিজম কাজ করেছে তা তারা বুঝবে। যে তিনমাস টাকাইয়ামা মৃত ছিল, সেটা কাউরুর যাপিত জীবনের বিশবছর। এবং এখন, যে সচেতনতা একসময় কাউরুর ছিল, সেটা টাকাইয়ামার শরীরে জায়গা করে নিয়েছে–লূপে জীবনযাপন করার জন্যে।

লূপে ওর বেঁচে থাকাটা বিড়ম্বনাই বটে–মরা একজন মানুষ সমাজে হাঁটাচলা করতে পারে না–তবে ও আছে গবেষণা করার আদর্শ একটা পরিবেশে। বছরের অর্ধেকটা সময় টাকাইয়ামা মাইয়াশিটার কাছ থেকে ধার হিসেবে পাওয়া একটা ল্যাবরেটরিতে কাটিয়েছে, গবেষণা করেছে ভাইরাস নিয়ে। এর অর্থ হলো, ওর নিজের কোষের ভেতর লুকিয়ে থাকা সূত্রগুলোকে এক এক করে বাইরে বের করা। গবেষণার মূল অংশটা শেষ করে রিং ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিখুঁত করতে ছ'মাস লেগে গেছে।

অনেক দিন পর আজ বাইরে বেরিয়েছে সে। শরীরে মৃদুমন্দ বাতাস খেলা করায় ওর হৃদয়টা যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কাউরু হিসেবে তার দিনগুলোয় ওদের অ্যাপার্টমেন্টের ঝুল-বারান্দায় রাতের বাতাস উপভোগ করেছে সে–দেখা যাচ্ছে ওর রুচি বদলায়নি।

পিকনিকে আসা লোকজনের পেছনে ছোট্ট একটা শিশুকে দেখতে পেল, দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

আছে ঠিক যেখানটায় একের পর এক ঢেউ এসে বালিতে মিলিয়ে যাচ্ছে। ইতস্তত ভঙ্গিতে পানির দিকে হাঁটছে ছেলেটা, খানিক পর পা ভেজার ভয়ে দ্রুত পিছু হটছে তারপর উবু হয়ে বালির স্তূপ তৈরি করতে বসল।

ওর শরীর কোমর থেকে ওপরটা খালি, কোমরের নীচে বিকিনির মতো দেখতে সুইমসুট পরে আছে, তবে মাথায় কোনো সুইম ক্যাপ নেই। নড়াচড়ার মধ্যে চোখে পড়ার মতো সতর্কতা।

প্রথম যেদিন রাইকোকে দেখেছিল, সে-কথা মনে পড়ে গেল। উলের ডোরাকাটা পোশাক পরা রাইকোর ছেলে রিয়োজিকেও এরকম অদ্ভুত লেগেছিল তার। শেষবার রাইকোর ত্বকের স্পর্শ, শেষবার ওরা যে আলাপ করেছে–এসব ছবি আর শব্দ ওর স্মৃতিতে একদম তাজা হয়ে আছে।

কী করছে এখন সে?

প্ল্যাস্টিক ব্যাগে ক্যানভর্তি হালকা পানীয় নিয়ে সরু ফুটপাত ধরে হাঁটছে, বালি কিংবা রাস্তায় পড়ে যাওয়ার ভয়ে পা ফেলছে সাবধানে। মরুভূমিতে যে প্রশস্ত শৈলশিরা ধরে হেঁটেছে, তার সঙ্গে এই ফুটপাতের তুলনা চলে না, এগুলো মাত্র দু'ফুট চওড়া।

ঢেউ এড়াতে ফুটপাতের দিকে ছুটে এল ছেলেটা, প্রায় একশ গজ দূরে ফুটপাতে বসা এক লোকের দিকে এগোচ্ছে। লোকটা ওই বাচ্চা ছেলেটার বাবা, যার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে সে।

লোকটার শুধু নিজের ছেলের দিকেই চোখ, অন্য কারও উপস্থিতির জন্যে একদমই প্রস্তুত নয়। চমকে দিতে না চাওয়ায় তার নাম ধরে ডাকল রাইয়োজি টাকাইয়ামা।

'হেই, আনডু!'

নিজের নাম শুনতে পেয়ে চারদিকে তাকাল লোকটা। তারপর দেখল ওর দিকে হেঁটে আসছে টাকাইয়ামা। তারা চেহারা হয়ে উঠল একজন হদ্দ বোকার।

'কি হে, অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই।'

গত ছ'মাসে আনডুর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি টাকাইয়ামা। টাকাইয়ামার পুনর্জন্মে সাহায্য করার পর ভার্সিটিতে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে আনডু। একেবারে গায়েব হয়ে গিয়েছিল।

আনডুর পাশে বসল টাকাইয়ামা, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। কিন্তু আনডুর দৃষ্টি খোলাখুলি এড়িয়ে যাচ্ছে তার চোখ দুটোকে। নিজের ছেলের দিকে আবার তাকাল, এখনও ওর দিকে ছুটে আসছে সে।

ব্যাগ থেকে একটা ক্যান বের করে দ্রুত পাল্ট করল টাকাইয়ামা। তারপর আরেকটা ক্যান বের করে আনডুর দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'চলবে?'

নিঃশব্দে ক্যানটা নিয়ে রিং টানল আনডু, এখনও টাকাইয়ামার দিকে তাকাচ্ছে না।

'তুমি জানলে কীভাবে আমি এখানে?' শান্তসুরে জিজ্ঞেস করল আনডু।

টাকাইয়ামা বলল, 'মাইয়াশিটা বলল।' জানে আজ আনডুর ছেলের মৃত্যুবার্ষিকী, মাইয়াশিটা আন্দাজ করেছিল এখানেই পাওয়া যাবে আনডুকে, সেটাই টাকাইয়ামাকে

BanglaBook.org

জানিয়েছে।

তবে এই মৃত্যুবার্ষিকী সত্যি ভারি অদ্ভুত। আজ থেকে দু'বছর আগে সাগরের ঠিক এখানটায় ডুবে মারা যায় আনডুর ছেলে, অথচ সেই ছেলেটা এখন এখানে রয়েছে। নিজের পরিস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে নিঃশব্দে একটু না হেসে পারল না টাকাইয়ামা।

'কী চাও তুমি?' জানতে চাইল আনডু, উত্তেজনায় টান টান গলা। টাকাইয়ামাকে দেখে মোটেও খুশি মনে হচ্ছে না তাকে।

এখানে আসতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে টাকাইয়ামাকে। প্রথমে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ল্যাব থেকে বেরোতে হয়েছে, তারপর ট্রেন ও বাস ধরেছে। ওর আশা ছিল এরচেয়ে ভালো অভ্যর্থনা পাবে। সম্ভবত কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।

তার পুনর্জন্ম সম্পর্কে এলিয়ট তাকে সবই জানিয়েছেন। যেকোনো দুনিয়াতেই মরা একজন মানুষ প্রাণ ফিরে পেলে সেটাকে মেনে নেয়া অত্যন্ত কঠিন। সেজন্যে একটা মঞ্চ সাজানোর দরকার পড়ে।

সেটা এলিয়ট সাজিয়েছেন। আনডুকে তিনি এমন একজন হিসেবে বেছে নেন যাকে কাজে লাগানো যাবে, তাকে তিনি সংকেত পাঠিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সে যাতে টাকাইয়ামার পুনর্জন্ম যতটা সম্ভব গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। টোপটাও ছিল অত্যন্ত লোভনীয়– টাকাইয়ামাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করার বিনিময়ে আনডু ফিরে পাবে তার মৃত সন্তানের প্রাণ।

আনডুর ছেলের বেলায়, সে লূপের একজন বাসিন্দা হওয়ায়, নিউট্রিনো স্ক্যানিংয়ের দরকার হয়নি। ওটা ছিল ইনট্রা-লূপ ট্র্যান্সফার, সহজ একটা কাজ–ছেলেটার জেনেটিক ইনফরমেশন পুনর্গঠিত করা।

ছ'মাস আগে লূপকে নতুন করে সাজানো হয়েছে, যে মুহূর্ত থেকে ক্যানসার ওটাকে গিলে ফেলতে শুরু করে, তারপর আবার চালু করা হয়েছে। টাকাইয়ামার ফেরার সময়টা চরম সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করা হয়, বিপর্যয়ের যে বীজ বপন করা হয়েছে সেগুলো যাতে জয় করতে পারে সে যদি কিছু না করত, লূপ তার সেই নিজস্ব পথেই চলত, হয়ে উঠত ক্যানসারাস। ওটার জন্যে নতুন একটা ইতিহাস গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল তার, জমে ওঠা পানির জন্যে একটা চ্যানেল তৈরি করার দরকার ছিল। ও যদি সফল হয়, এর আগে যে দুনিয়ায় বেঁচে এসেছে, সেখানেও প্রাণের বিভিন্নতা এবং প্রাণীর বংশগতি রক্ষা পাবে।

'শোনো, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, সত্যি কৃতজ্ঞ। তুমি ঠিক আমার প্রত্যাশা মতোই কাজ করেছ।'

টাকাইয়ামা সত্যি আনডুর প্রতি কৃতজ্ঞ। লূপে আসার ঠিক আগে, টাকাইয়ামার জীবন নিজের স্মৃতিতে গেঁথে নিয়েছে সে। আনডুর সঙ্গে স্কুলজীবনে যে বন্ধুত্ব ছিল, সে-কথা জানা আছে তার, জানা আছে ওর মেধার কি ধার। এ-ধরনের একজন বন্ধুর সাহায্য না পেলে সন্দেহ ছিল কুমারী মাতার সন্তান জন্মদানের মতো যুক্তিসঙ্গত উপায়ে এখানে প্রবেশ করতে পারত কিনা।

কিন্তু আনডু বোধহয় ভাবছে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিংবা আরও খারাপ

BanglaBook.org

কিছু–সে হয়তো সন্দেহ করছে সাদাকু ইয়ামামুরার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে টাকাইয়ামা, ফিরে এসেছে দুনিয়াটাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আনড্রু যদি এরকম কিছু ভেবে থাকে, নিজের পক্ষ নিয়ে টাকাইয়ামার কিছু বলার নেই। একটা কাজ কখনোই করতে পারবে না সে, নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করা। যে নিঃসঙ্গ জীবন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে তার কথা ভেবে মাঝে-মধ্যে বিষণ্ণতায় ভোগে সে। একটি মাত্র যে আকাঙ্ক্ষা ওকে চালাচ্ছে, সেটা তার বুকের মাঝখানে লুকানো আছে।

পানির কিনারায় ফিরে গিয়ে বাবার উদ্দেশে হাত নাড়ল ছেলেটা। হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল আনড্রু। আসার পথে বালিতে লাথি মারছে সে।

'বাবা, আমার তেষ্টা পেয়েছে!'

টাকাইয়ামার দেয়া ক্যানটা ছেলের হাতে ধরিয়ে দিল আনড্রু। ঢক ঢক করে খাচ্ছে ছেলে। তার ফরসা গলার দিকে তাকিয়ে আছে টাকাইয়ামা। জ্যান্ত, সচল রক্ত এবং মাংস, সামান্য একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। একই গর্ভ থেকে এসেছে–প্রায় একজন ভাই-ই বলা চলে।

'আরেকটা চলবে?' জিজ্ঞেস করল টাকাইয়ামা, ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল।

'নাহ্,' বলল ছেলেটা, তারপর বাবার দিকে তাকাল, আধখালি ক্যানটা প্রায় নিজের মাথার কাছে তুলল। 'বাকিটুকুও খেতে পারি?'

'হ্যাঁ, খাবেই তো।'

পানির কিনারায় ফিরে গেল ছেলেটা, ক্যান দুলিয়ে ভেতরের পানীয় ঘোরাচ্ছে। টাকাইয়ামা ধারণা করল, খালি করার পর ওটা নিয়ে খেলবে ছেলেটা, হয়তো ভেতরে বালি ভরবে।

গলা চড়িয়ে ডাকল বাবা, 'টাকানারি!'

থেমে ঘুরল ছেলেটা। 'কী, বাবা?'

'এখনই পানিতে নেমো না, ঠিক আছে?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল টাকানারি, ওদের দিকে পেছন ফিরল আবার। সাগরকে এখনও ভয় পাচ্ছে সে–ডুবে যাওয়ার কথা মনে আছে তার। সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, সেটা পাড়ি দিতে শুরু করার আগে এই ভয় জয় করতে হবে তার।

'লক্ষ্মী ছেলে,' বলল টাকাইয়ামা। নিজের সন্তানের কথা মনে পড়ে গেছে তার, এখনও বড় হচ্ছে, সন্দেহ নেই, রাইকোর ভেতরে।

মন্তব্যটা এড়িয়ে গিয়ে আনড্রু বলল, 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও আমাকে। দুনিয়ার অবস্থা কী হতে যাচ্ছে এখন?' টাকাইয়ামার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল, যেন বলতে চাইছে, *তোমার তো জানার কথা।*

এবং জানে সে। কিংবা, অন্তত, আনড্রুর চেয়ে ভালো আইডিয়া করতে পারে। তবে কক্ষনো বলবে না তাকে।

'তুমি কী ভাবো?'

ক্যানসার পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলছে, ভবিষ্যত লুপের এরকম ছবি আঁকল

BanglaBook.org

আনডু। দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে রিং ভাইরাস। ভিডিওটেপটা নিজেকে বদলে মিডিয়ার বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করবে, এবং ছড়িয়ে পড়বে দুনিয়ার সবখানে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু ছাড়ার সময় যে-সব নারী ওটার সংস্পর্শে আসবে তারা সবাই সাদাকু ইয়ামামুরার মতো একই জেনেটিক মেকআপবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করবে, বাকি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। একই ব্যাপার ঘটবে পুরুষদের বেলায়ও: নতুন মিডিয়া অল্প যে কজনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে তারাই শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে, বাকি প্রত্যেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর ফলাফল বলে দেয়ার জন্যে আপনার ডাক্তার হওয়ার প্রয়োজন নেই। সমস্ত প্রাণ একই জেনেটিক নকশা পাবে: সাদাকু।

'আর নিজেকে তুমি সেভাবেই তৈরি করছ?'

আনডুর দৃষ্টিতে উপচানো বৈরিতা। বোঝাই যাচ্ছে টাকাইয়ামাকে ভুল বুঝছে সে।

মুখের ভাব না বদলে পকেটে হাত ভরে একটা অ্যামপুল বের করল টাকাইয়ামা, আনডুর মুঠোয় গুঁজে দিল। 'আমি চাই এটা তুমি রাখো।'

'কী এটা?'

'ভ্যাকসিন।'

'ভ্যাকসিন?' খুদে কাঁচের ফাইলটা চোখের সামনে তুলে নেড়েচেড়ে দেখছে আনডু।

ছ'মাস গবেষণা করার পর টাকাইয়ামা রিং ভাইরাসের জন্যে ভ্যাকসিন তৈরি করতে সফল হয়েছে, নিজের কোষ থেকে পাওয়া আভাসের ওপর ভিত্তি করে। ওটাকে শুধু নিখুঁত করতে হয়েছে তার। পশুর ওপর ব্যবহার করে ওটার কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

'ওটা নাও, ভাইরাসটাকে আর ভয় পেতে হবে না। তোমার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হয়েছে।'

'এত দূরে তুমি শুধু এটা আমাকে দেয়ার জন্যে এসেছ?'

'আরে, একজন মানুষ মাঝে-মধ্যে সৈকতে বেড়াতে আসতে পারবে না?' আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল টাকাইয়ামার মুখে। আনডুর চেহারা খানিকটা নরম হলো।

ফাইলটা বুক পকেটে রাখার সময় আবার সেই একই প্রশ্ন করল আনডু, তবে আগের চেয়ে শান্তসুরে, 'কী ঘটতে যাচ্ছে আমাকে বলবে না?'

'আমার জানা নেই,' সরাসরি বলল টাকাইয়ামা।

'এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না। তুমি আর সাদাকু, তোমারা দুজন মিলে দুনিয়ার নতুন একটা নকশা তৈরি করতে যাচ্ছ, সত্যি কিনা?'

কথাটা শুনে হেসে ফেলল টাকাইয়ামা। এখানে তার আর থাকার কোনো মানে হয় না। বিড়বিড় করতে করতে সিধে হলো সে। 'এবার আমাকে ফিরতে হয়।'

'তুমি চলে যাচ্ছ?' মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে থাকল আনডু।

'আমার ফেরার সময় হয়েছে। তোমরা কি করবে বলে ভাবছ?'

'কী আর করব! মিডিয়ার নাগালের বাইরে কোথাও একটা খালি দ্বীপ খুঁজে নেব, ওখানে মানুষ করব ছেলেটাকে।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, এটা তোমার চরিত্রের সঙ্গে মেলে। তবে, আমি...আমাকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত যা কিছু দেখার সব দেখতে হবে। একবার ওটা যতদূর সম্ভব ততদূর যেতে পেরেছিল, কে জানে, এবার হয়তো মানবজাতির বোধবুদ্ধিতে ধরা দেয় না এমন প্রজ্ঞা আমাদের ওপর তার ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করবে। সেটা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।' টাকাইয়ামা ইচ্ছে করেই একটু ঝাপসা রাখছে, কিছু একটা না বলে বলতে চাইছে। *ঘাবড়াবার দরকার নেই। তুমি যেমন ভাবছ, দুনিয়াটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। ওভাবে শেষ হয়েছিল, একবার, কিন্তু এবার তা হবে না। তা যাতে না হয় সেটা দেখার জন্যেই ফিরে এসেছি আমি।*

ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করল সে।

'বাই, রাইয়োজি। আমার পক্ষ থেকে মাইয়াশিটাকে হাই বলো।'

আনডুর গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল টাকাইয়ামা।

'যাবার আগে, একটা কথা মনে রাখতে বলি তোমাকে। যে বিপর্যয়ই দেখা দিক, তাতে কিছু আসে যায় না, বুকে সাহস নিয়ে সেটার মোকাবিলা করব আমরা, এবং আমাদেরই জয় হবে। শুধু এ-ধরনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েই দুনিয়াটাকে বদলে দিতে পারব আমরা, বুঝলে। কাজেই...হ্যাঁ, সব ঠিকঠাকই থাকবে।'

হাত নেড়ে আবার হাঁটা ধরল টাকাইয়ামা। ও নিশ্চিত, আনডু বোঝেনি। তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। একদিন ঠিকই বুঝতে পারবে।

বাপ আর ছেলের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে সে, ঘাড় ফিরিয়ে ওদেরকে দেখছেও মাঝে-মধ্যে।

'বাবা, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ, ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি।' ছেলেকে আবার জানাচ্ছে বাবা, পানির ভয় কাটিয়ে উঠলে কি ঘটবে। 'তোমাকে আমি মার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাব।'

ছেলে পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার পর স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গেছে স্ত্রী।

'ভাবছি মা কেমন অবাক হবে।'

এরকম টুকরো আলাপ শুনতে শুনতে টাকাইয়ামা ভাবল, মধুর পুনর্মিলনের মাধ্যমে আবার সুখী হতে যাচ্ছে আনডু পরিবার।

তার একটু ঈর্ষা হলো। এই সুখটা সে কখনো পাবে না।

BanglaBook.org

দুই

মাথার ভেতর দ্রাঘিমারেখাটা যাচাই করে নিল সে, যদিও ঠিকঠাক স্মরণ করতে তার কোনো অসুবিধে হলো না। সময়টাও। অন্য কেউ নয়, এলিয়টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কাজেই কোনোভাবেই ভুলে যেতে পারে না সে।

সাগরতীরের যে শহরে আনডুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে

রওনা হলো টাকাইয়ামা, পৌঁছুল যথাসময়ের খানিক বরং আগেই। এটা পাহাড়ী এলাকা, সাগরের ওপর দিয়ে সরু আঙুলের মতো একটা জমিন বেশ কিছুদূর এগিয়েছে, যেটাকে ভূনাসিকা বলে। পাহাড়ী ঢালে পাইন বন, একেবারে সেই পানির কিনারা পর্যন্ত।

ঘাসের ওপর বসে অপেক্ষা করছে টাকাইয়ামা।

জুন ২৭, ১৯৯১, দুপুর ২:০০, লূপ সময়। ঠিক এই কথা বলেছেন তাকে এলিয়ট। তারমানে আরও আধঘণ্টা বাকি।

লূপ নতুন করে চালু করার পর টাকাইয়ামার জন্যে ছ'মাস পার হয়েছে, তবে এলিয়টের দুনিয়ায় সময় বেশ কিছুটা শ্লথগতিতে চলে। লূপের সময় আরও দ্রুতগতিতে চলত যদি আগের মতো একই সংখ্যক সুপারকমপিউটার চালু রাখা যেত, কিন্তু তা চালু রাখা যায়নি। ফলে, কমপিউটারের এক বছরে লূপ এগোয় পাঁচ কি ছয় বছর। টাকাইয়ামার ছ'মাস, এলিয়টের একমাসের কাছাকাছি।

স্ক্যানার শুরু হওয়ার কিছু আগে সে তার বাবা এবং রাইকোর সঙ্গে কথা বলেছিল। তার পর থেকে তাদের হিসেবে এক মাস পার হয়েছে। কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, তার আগেই ওই দুনিয়া থেকে এই দুনিয়ায় চলে আসতে হয়েছে তাকে। ওঁরা সম্ভবত ধরে নিয়েছেন মরুভূমির কোথাও হারিয়ে গেছে কাউরু, কিন্তু আসলে তো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

যা হারাবার তা তো হারিয়েইছে, তবে অন্তত এখনও কিছু জিনিস ওঁদেরকে বলতে চায় সে। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত আর কাজ সম্পর্কে পুরোটা ব্যাখ্যা দেয়া কীভাবে সম্ভব নিজ মুখে, সশরীরে যদি দিতে না পারে?

ওখান থেকে কমপিউটার মনিটরে টাকাইয়ামাকে ডাকা সহজ ছিল, স্থান ও সময় নির্বাচন করেই তা সম্ভব। কাজেই এলিয়টকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে তার মা-বাবা আর রাইকোকে তিনি দেখাবেন সে সুস্থ ও স্বাভাবিক আছে।

হাতঘড়ি দেখল টাকাইয়ামা। সময় প্রায় হয়ে গেছে।

ঠিক তখন, যেন সঠিক মুহূর্ত উপস্থিত দাবি করে, ওর সামনে ফাঁক হয়ে গেল মেঘ, সমুদ্রের পিঠে ঝলমলিয়ে উঠল রোদ। এ যেন আকাশে একটা জানালা খুলে গেছে, দুই জগতের মধ্যে একটা সংযোগ। ওটার ভেতর দিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না টাকাইয়ামা—না কোনো মুখ, না কোনো অভিব্যক্তি—তবে ওঁরা তাকে দেখতে পাবেন।

কাঁটায় কাঁটায় দুটো বাজে। ওঁদের চোখ এখন তাকে দেখতে পাচ্ছে। টাকাইয়ামা নিজের মাথাটা একটু উঁচু করল, ওই সব লোকজনের উদ্দেশে সামান্য হাসল যাঁদের তার দিকে তাকিয়ে থাকার কথা।

প্রত্যেকের নাম বা সম্পর্ক ধরে ডাকল সে, কথা বলল ওঁদের উদ্দেশে, সবাইকে জানাল ঠিক কি নিয়ে কাজ করছে সে।

ওঁদেরকে তার অনেক কথা জিজ্ঞেস করার আছে, তবে জানে তা সে জিজ্ঞেস করতে পারে না। এমএইচসি ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে তার শরীর থেকে যে ডিজিটাল ইনফরমেশন ওঁরা পেয়েছে, সেগুলো কি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে?

BanglaBook.org

টাকাইয়ামা ভাবতে চায় সম্ভব হয়েছে: সে ভাবতে চায় তার বাবার জীবন রক্ষা পেয়েছে। ফোনে যখন রাইকোর সঙ্গে কথা বলেছিল সে, তখনকার চেয়ে আরও কম সময়ে ওর সন্তান জন্ম নেবে। নিজের দুনিয়ায় রাইকো কি এখন বেঁচে থাকার জন্যে যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে? টাকাইয়ামা ভাবছে, তাকে এই অবস্থায় দেখে বেঁচে থাকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাইকো।

রিং ভাইরাস, আর ওটাকে এই দুনিয়ায় যে বয়ে নিয়ে এসেছে সেই রূপান্তরিত-ভিডিও মিডিয়া, এগুলোর সঙ্গে তুমুল লড়াই করবে সে। এসব মিডিয়া প্রোগ্রামের সংস্পর্শে এলে কেউ যদি এক সপ্তা পর মারা যায়, তাহলে একটা ডিপ্রোগ্রামিং সিস্টেম তৈরি করাও খুব কঠিন কিছু হবে না। নিজের ওপর তার পূর্ণ আস্থা আছে। যত বাধাই আসুক, সব উতরে যাওয়ার দৃঢ় মনোবল নিয়েই ওই দুনিয়া থেকে এই দুনিয়ায় এসেছে সে। এই বিষয়টা যখন সামনে চলে আসে, ঈশ্বরতুল্য হয়ে ওঠে টাকাইয়ামা। এই দুনিয়া কীভাবে কাজ করে তার জানা আছে। ভাইরাস আর রূপান্তরিত মিডিয়াকে ভয় কি তার?

নিজের এসব চিন্তা যখন আকাশকে জানাচ্ছিল, মনে মনে সে কল্পনা করছিল লূপের ইতিহাস স্বাভাবিক গতি পেতে শুরু করায় অপর পৃথিবীও নিজের বিপদ কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছে।

মরুভূমিতে রোগাক্রান্ত গাছের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার, ক্যানসারের আক্রমণে বীভৎস চেহারা পেয়েছে। ওয়েন'স রকে দেখা মরা ইঁদুরের কথাও ভোলেনি, ফোলা পেট নিয়ে চিৎ হয়ে আছে।

পাহাড়ী ঢালে নিঃসঙ্গ লালচে-বেগনি ফুলটার কথা মনে পড়ল, ওই একটা মাত্র গাছ ক্যানসারকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল। টাকাইয়ামা ওই গাছটার ওপর মনের শক্তি ঢেলে দিল, মনের ক্যানভাসে যত খুশি বড় করে আঁকছে।

সমগ্র হৃদয় দিয়ে বিশেষ একটা মুহূর্ত কামনা করছে টাকাইয়ামা, যখন ওই গাছগুলো নিজেদের গা থেকে সমস্ত ক্যানসার ঝেড়ে ফেলে দেবে, আবার ফিরে পাবে তাজা সবুজ সৌন্দর্য আর সুষমা। কল্পনা করল বিরূপ আবহাওয়ায় টিকে থাকা ওই ভারি প্রশাখাগুলো দৃষ্টিনন্দন রঙবেরঙের ফুলে ছেয়ে গেছে। লূপ যদি তার প্রাণবৈচিত্র্য ফিরে পায়, ওই দৃশ্যগুলো হবে বাস্তবতা।

বাতাস এসে মেঘের ফাঁকটাকে আরও একটু বড় করল। পর্যবেক্ষকদের চোখ মিটমিট করতে করতে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল টাকাইয়ামা। 'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল সে।

তার ওই আশা পূরণ হওয়ারই কথা।

[শেষ]

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org